রহমতে দো আলম

মুহাম্মদ আবদুস সামাদ

www.nagorikpathagar.org

রহমতে দো আলম (সা)

মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.nagorikpathagar.org

রহমতে দো আলম (সা)
মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ

ইফাবা প্রকাশনা ঃ ১৯১৪
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.৬৩
ISBN : 984—06—0452—0

প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ ১৪০৪
মুহাররম ১৪১৮
জুন ১৯৯৭

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুল ওয়াদুদ
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ
নাসরীন মুস্তাফা

মুদ্রণ ও বাঁধাই
শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

মূল্য ঃ ৫৩.০০ টাকা মাত্র

RAHAMATE DO ALAM [The Life of Hazrat Muhammad (Sm)] : written by Muhammad Abdus Samad in Bengali and Published by Mohammad Abdul Wadud, Director, publication Islamic Foundation Bangladesh, Baitul Mukarram, Dhaka-1000. June 1997

Price : Tk 53.00 US Dollar : 2.50

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশকের কথা

পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মানুষকে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন স্বাধীনতা ও কর্মক্ষমতা দিয়ে। মানুষ যাতে ভালভাবে দুনিয়ায় জীবন যাপন করতে পারে, সুশৃংখল সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে এবং সুন্দর-সুখী দুনিয়ার জীবন শেষে কল্যাণময় অনন্ত আখিরাতের জীবনলাভে ধন্য হতে পারে, সেজন্যই করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য পাঠিয়েছেন অসংখ্য নবী-রাসূল। পৃথিবীর প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী হযরত আদম (আ) থেকে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত লক্ষাধিক নবী-রাসূল এসেছিলেন মানুষকে কল্যাণ ও মুক্তির পথ দেখাতে।

সাইয়্যেদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হলেন ইসলামের পূর্ণতা বিধানকারী খাতামুন্নাবীয়ীন বা আখেরী নবী। আজকের পৃথিবীতে পূর্ণাংগ আদর্শ মানব হিসেবে তিনিই একমাত্র অনুকরণযোগ্য মহামানব। কেয়ামত পর্যন্ত আদর্শ মহামানব বলতে একমাত্র হযরত মুহাম্মদ (সা)-কেই বুঝায়। কাজেই তাঁর জীবনী ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে মানুষ যতই জানবে, ততই গড়ে উঠবে সুন্দর সমাজ ও পুণ্যময় পৃথিবী। অন্যান্য ভাষার ন্যায় বাংলাভাষায়ও বিশ্বনবীর জীবন-চরিত আলোচিত হয়েছে বহু লেখকের কলমে।

মাওলানা আবদুস সামাদ বিরচিত 'রহমতে দো আলম' আখেরী নবীর জীবন ও কর্মের একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা গ্রন্থ। লেখক নবীজীর জীবনীর বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন ছোট ছোট উপশিরোনামের মাধ্যমে। এ হচ্ছে গ্রন্থখানার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এতে করে পাঠক সমাজ একনজরে নবী-জীবনের মহাসমুদ্র অবলোকনের সুযোগ পাবে বলে আশা করা যায়।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে নবী-জীবনের উপর লিখিত আর ক'টি গ্রন্থের মত এটিও পাঠক মহলে সমাদৃত হবে এবং তারা নবী-জীবনের অনুকরণে সহজেই নিজ নিজ জীবন ধন্য করতে সক্ষম হবে—এই আশায় বইটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশ করা হল।

www.nagorikpathagar.org

ভূমিকা

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মানবজাতিকে সত্য পথের সঠিক সন্ধান দেওয়ার জন্য যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। আদি মানব হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা) পর্যন্ত অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। এই সকল নবী-রাসূলের সঠিক সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন।

হুযূর পাক (সা)-এর পূর্বে যত নবী প্রেরণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কাউকে একটা দেশের জন্য, কাউকে একটা সম্প্রদায়ের জন্য হিদায়েতের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী, আল্লাহ্র হুকুমে আল্লাহ্র দিকে আহবানকারী এবং উজ্জ্বল আলোরূপে প্রেরণ করেছিলেন। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, হে নবী, আমি আপনাকে সমগ্র সৃষ্টির জন্য রহমতস্বরূপ (সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের নিমিত্ত) প্রেরণ করেছি। তিনি ছিলেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। তাঁর পূর্ণ অনুসরণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে বিশ্বমানবের পার্থিব জীবনের শান্তি এবং পারলৌকিক জীবনের মুক্তি। এ কারণেই আমাদের জানতে হবে সেই মহামানবের পবিত্র ও কর্মময় জীবন। সেই আদর্শে গঠন করতে হবে আমাদের ব্যক্তি, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন। সেই উদ্দেশ্যে বহু চেষ্টা ও শ্রমসহকারে এই পুস্তকখানা লিখিত হল। সুধী পাঠক-পাঠিকা বিন্দুমাত্র উপকৃত হলেও মনে করব আমার শ্রম সার্থক হয়েছে।

বিনীত

গ্রন্থকার

www.nagorikpathagar.org

সূচীপত্র

হামদ না'ত	১
কানূনের প্রয়োজনীয়তা	১
নবী ও রাসূলের আবশ্যকতা	২
নবী-রাসূলগণের ক্রমিকধারা	২
প্রসিদ্ধ আসমানী কিতাবসমূহ	৩
আরব দেশ	৩
আরবের প্রত্যক্ষ পরিবেশ	৩
আরবের পরোক্ষ পরিবেশ	৩
আরব দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা	৪
ইসলামের পূর্বে আরবের অবস্থা	৪
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্মের পূর্বে আরবদের দীনী অবস্থা	৪
আরবদের রাজনৈতিক অবস্থা	৪
আরবদের চারিত্রিক অবস্থা	৫
আরবের আদিম অধিবাসী	৫
রাজা তিব্বার পরিচয়	৭
রাজা তিব্বার পত্র	৮
আবরাহার কা'বাগৃহ ধ্বংস করার ঘটনা	৯
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্মের পূর্বাবস্থা	১৩
স্বর্গীয় পুষ্পের স্বর্গ ছেড়ে ধূলির ধরায় অবতরণ	১৩
সত্যের সূর্য উদয় অসত্যের অন্ধকার বিদায়	১৪
পৃথিবীতে মানবজাতির আগমনের ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জি	১৪
মাতার পক্ষ হতে বংশধারা	১৫
পিতার পক্ষ হতে বংশ তালিকা	১৫
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র দুধ-মাতা	১৬
রহমত প্রকাশ	১৭
মুবারক জবানের প্রথম বাক্য	১৭
ছাগল চরাবার জন্য হালিমার ছেলেদের সঙ্গে গমন	১৮
প্রথম বার সিনাচাক (বক্ষবিদীর্ণ)	১৮

www.nagorikpathagar.org

হুযূর পাক (সা)-কে সঙ্গে নিয়ে গণকের নিকট গমন	১৮
মক্কায় মাতার নিকট সোপর্দ	১৯
মাতার সঙ্গে মদিনা গমন	১৯
দাদার নিকট সোপর্দ ও প্রতিপালন	২০
আবদুল মুত্তালিবের ইন্তিকাল	২০
রাসূলে পাক (সা)-এর বাল্যকাল	২১
শামদেশে সফর ঃ বহিরা রাহিবের মুলাকাত	২১
আল আমীন উপাধিপ্রাপ্তি	২২
ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে সফর	২৩
হযরত খাদীজা (রা)-র ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে শামদেশে গমন	২৩
খৃস্টান রাহিবের সাক্ষাত	২৩
হযরত খাদীজা (রা)-র সাথে শুভ পরিণয়	২৪
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র সন্তান-সন্ততি	২৫
যুদ্ধবিগ্রহ ও হিলফুল ফজুল-এ অংশগ্রহণ	২৫
পবিত্র কাবাগৃহ নির্মাণ	২৬
কাবা সংস্কার ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিরোধ মীমাংসা	৩০
নবুওত লাভের পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র চরিত্র	৩২
হুযূর (সা) উম্মি ছিলেন	৩৩
আল্লাহ্র মাহবুব নির্জনতা-প্রিয় ছিলেন	৩৩
নবুওত লাভের সময় আসন্ন	৩৩
ওরাকা ইবন নওফেলের নিকট গমন	৩৪
সত্যের দাওয়াত শুরু	৩৫
গোপন দাওয়াত	৩৫
সর্বপ্রথম যাঁরা সত্য গ্রহণ করেছিলেন	৩৫
হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের সুফল	৩৬
প্রাথমিক পর্যায়ে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়	৩৬
গোপন শিক্ষাকেন্দ্র	৩৬
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র আগমনের পূর্বে দুনিয়ার অবস্থা	৩৭
প্রকাশ্য দাওয়াত শুরু	৩৭
কুরাইশদের বিরোধিতা ও শত্রুতা	৩৮
আবূ তালিবের সাহায্য	৩৮
আবূ তালিবের নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ	৩৯

www.nagorikpathagar.org

আবূ তালিবের নিকট দ্বিতীয়বার প্রতিনিধি প্রেরণ	৩৯
আবূ তালিবের পেরেশানী ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র দৃঢ় প্রতিজ্ঞা	৪০
আবূ তালিবের সাহায্য বন্ধের শেষ চেষ্টা	৪০
শক্তি প্রয়োগে সত্যের দাওয়াত বন্ধ করার প্রচেষ্টা	৪১
আল্লাহ্র রাসূল (সা)-কে হত্যা করার চেষ্টা	৪১
যাদুকররূপে পরিচিত করার অপচেষ্টা	৪২
লোভ দেখিয়ে ইসলাম প্রচার বন্ধের চেষ্টা	৪২
বশীভূত করার জন্য সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা	৪৩
কাফিরদের জটিল প্রশ্নের মাধ্যমে আল্লাহ্র রাসূল (সা)-কে পরীক্ষা	৪৩
চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করণ	৪৪
কাফিরদের রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র সঙ্গ বর্জন	৪৪
সাহাবায়ে কিরামদের উপর কঠোর নির্যাতন	৪৫
নির্যাতিত মুসলমান	৪৫
আল্লাহ্র পথে প্রথম শহীদ	৪৬
নির্যাতিত মুসলমানদের আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর সান্ত্বনা দান	৪৮
নবুওতের পঞ্চম বছর হাবশায় প্রথম হিজরত	৪৮
কুরাইশদের বাদশা নাজ্জাশীর নিকট গমন	৪৯
বাদশা নাজ্জাশীর দরবারে হযরত জাফর (রা)-এর ভাষণ	৪৯
মুহাজিরদের মক্কায় প্রত্যাবর্তন	৫০
হাবশায় দ্বিতীয়বার হিজরত	৫০
হযরত হামজা (রা)-র ইসলাম গ্রহণ	৫১
হযরত উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ	৫২
আবূ তালিবের ঘাঁটিতে নজরবন্দী নবুওতের সপ্তম বছর	৫৬
হযরত তোফায়েল বিন আমির দৌসির ইসলাম গ্রহণ	৫৮
এক ব্যবসায়ীর ঘটনা	৫৯
আবূ তালিব এবং খাদীজা (রা)-র ইন্তিকাল ঃ নবুওতের দশম বর্ষ	৬০
উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা (রা)-র তিরোধান	৬৩
কুরাইশদের অত্যাচার	৬৩
তায়েফে সফর ঃ তায়েফবাসীর নির্যাতন	৬৪
মুশরিক কওমের জন্য হিদায়েতের দোয়া	৬৫
শবে মি'রাজ ঃ উদ্দেশ্য ও শিক্ষা	৬৫
আল্লাহ্র কুদরত প্রদর্শন	৬৮

www.nagorikpathagar.org

চৌদ্দ দফা মূলনীতি	৬৯
হিজরত-পূর্ব কাজ ও মদীনায় ইসলাম প্রচার	৭৫
আনসারদের ইসলাম গ্রহণ শুরু ঃ নবুওতের দশম বছর	৭৫
আকাবার প্রথম বায়আত ঃ নবুওতের একাদশ বছর	৭৫
আকাবার দ্বিতীয় বায়আত ঃ নবুওতের দ্বাদশ বছর	৭৬
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র মদীনায় হিজরত	৭৮
উম্মে মা'বাদের তাঁবুতে অবস্থান	৮৩
মদীনাবাসীর সংবর্ধনা	৮৪
হযরত আলী (রা)-র হিজরত	৮৫
হিজরতের পর প্রথম কাজ	৮৬
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র মদীনায় প্রবেশ	৮৭
মদীনার পূর্ব নাম	৮৮
আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন	৮৮
মসজিদে নববী নির্মাণ	৮৯
উম্মুল মু'মিনীনদের বাসগৃহ নির্মাণ	৯০
ইয়াহূদীদের সঙ্গে চুক্তি	৯০
জিহাদ ও কিতালের হুকুম	৯১
গায্ওয়াহ্ ও সারিয়াহ্	৯২
ইসলামের প্রথম যুদ্ধ বদরে কুবরা	৯২
যুদ্ধের পটভূমি ও বিস্তারিত ঘটনা	৯৩
হযরত ফাতিমা জোহরা খাতুনে জান্নাত (রা)	৯৮
হযরত ফাতিরা (রা)-র বিবাহ	১০০
জঙ্গে উহুদ বা উহুদ যুদ্ধ	১০৭
জঙ্গে হামরাউল আসাদ ঃ উহুদের পরবর্তী ঘটনা	১১৬
দ্বিতীয় বদর অভিযান	১১৭
বনী মুস্তালিকের যুদ্ধ	১২০
জঙ্গে আহ্যাব বা পরিখার যুদ্ধ	১২৪
বনী কুরাইজার যুদ্ধ	১২৯
হুদায়বিয়ার সন্ধি	১৩২
সন্ধির শর্তসমূহ	১৩৫
ইসলামী দাওয়াত সম্বলিত পত্রাবলী	১৩৬
রোম সম্রাটের পত্র	১৩৭

www.nagorikpathagar.org

আবূ সুফিয়ানের সঙ্গে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কথোপকথন	১৩৭
পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজের নামে পত্র	১৩৯
খায়বরের যুদ্ধ	১৪০
রাহ্মাতুল্লিল আলামীনের দয়া	১৪৫
কাযা উমরা আদায়	১৪৫
মূতার যুদ্ধ	১৪৬
মক্কা বিজয় ঃ অষ্টম হিজরী	১৪৮
মক্কায় প্রবেশ	১৫১
হুনায়েনের যুদ্ধ	১৫৪
মদীনায় প্রত্যাবর্তন	১৫৭
তবুকের যুদ্ধ	১৫৭
আরব গোত্রসমূহের মধ্যে ইসলামের প্রসার	১৬০
বিদায় হজ্জ	১৬৪
বিদায় হজ্জের ভাষণ	১৬৭
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র ইন্তিকাল	১৭৩
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র আখিরী ভাষণ	১৭৪
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র মুবারক জবানের শেষ কথা	১৭৬
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র লাশ দাফন	১৭৬
এক নজরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র মদীনার জীবন	১৮০
মদীনায় প্রবেশ	১৮১
হিজরতের প্রথম বছর	১৮১
দ্বিতীয় হিজরীর ঘটনাসমূহ	১৮১
তৃতীয় হিজরী	১৮৩
চতুর্থ হিজরীর ঘটনাসমূহ	১৮৪
পঞ্চম হিজরী	১৮৫
ষষ্ঠ হিজরী	১৮৬
সপ্তম হিজরী	১৮৬
অষ্টম হিজরী	১৮৭
নবম হিজরী	১৮৭
দশম হিজরী	১৮৮
একাদশ হিজরী	১৮৮
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র পরিত্যক্ত সম্পদ	১৮৯

www.nagorikpathagar.org

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র বাহন ও যুদ্ধাস্ত্র	১৯০
রাসূলে আকরাম (সা)-এর নেক বিবিগণের গৃহ	১৯০
হযরত খাদীজা (রা)-র মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য	১৯৩
উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা (রা)	১৯৩
উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা)	১৯৬
উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা)	১৯৯
উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নাব বিনতে খুজায়মা (রা)	২০১
উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা)	২০২
উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নাব বিনতে জাহাশ (রা)	২০৪
উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুওয়ায়রিয়া (রা)	২০৭
উম্মুল মু'মিনীন উম্মে হাবিবাহ বিনতে আবূ সুফিয়ান (রা)	২০৯
উম্মুল মু'মিনীন হযরত সুফিয়া বিনতে হাই (রা)	২১১
উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মুনা বিনতে হারিস (রা)	২১২
উম্মুল মু'মিনীন হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রা)	২১৪
উম্মুল মু'মিনীন হযরত রিহানা বিনতে শামাউন (রা)	২১৪
রাসূলে পাকের হুলিয়া	২১৯
পোশাক-পরিচ্ছদ	২২০
রাসূলে পাক (সা)-এর আহার	২২১
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা	২২১
সাওয়ারী শওক	২২২
সময়ের মূল্যবোধ	২২২
দরবারে নববী	২২৩
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র শারাফাত	২২৪
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র ভাষণ	২২৪
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র চরিত্র	২২৪
বদান্যতা বা দানশীলতা	২২৫
মেহমানদারী	২২৬
নিজের হাতে কাজ করা	২২৬
ন্যায় বিচার	২২৬
রাসূল (সা) সাহসী ছিলেন	২২৭
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র উপদেশ	২২৭
গ্রন্থপঞ্জি	২৩২

www.nagorikpathagar.org

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

হামদ ও না'ত

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, তিনিই একমাত্র প্রশংসার যোগ্য। তিনি সারে জাহানের রব। তিনি দাতা ও পরম দয়ালু। সমগ্র জীবের উপর তাঁর অনন্ত করুণা। হাজারো দরূদ ও সালাম তাঁর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উপর; তিনি পবিত্র ওহির আমানতদার। সমগ্র মানবজাতির কাছে প্রেরিত হয়েছেন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে। শুভ পরিণতি মুত্তাকীদের জন্য; আর সীমাতিক্রমকারীদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের অনন্ত শাস্তি।

কানূনের প্রয়োজনীয়তা

মানুষ সামাজিক জীব। জন্মগতভাবেই তারা সমাজবদ্ধ জীবন যাপনে অভ্যস্ত। সমাজের জন্য প্রয়োজন কানুনের। প্রত্যেক দেশ, প্রত্যেক জাতি এবং প্রতি ঘরের জন্য প্রয়োজন কানুনের। কানূন না থাকলে মানব-জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা থাকে না। কানূনবিহীন মানব জীবন অশান্তি ও বিশৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ হয়। কানূন না থাকলে মানব জীবন ঐসকল জন্তু-জানোয়ারের মত হতে বাধ্য হয় যাদের জীবনে কোন শান্তি, নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা নেই। কানূন দুই প্রকার। কানূনে ওজয়ী ও কানূনে ইলাহী। অর্থাৎ মানব রচিত আইন ও আল্লাহ্‌র আইন।

মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ ও ভুল-ত্রুটিতে পরিপূর্ণ আর স্বার্থের আবরণে আচ্ছাদিত। এ কারণে মানব রচিত আইন ভুল-ত্রুটি ও স্বার্থপরতা মুক্ত হতে পারে না। এরূপ আইন বা কানূনের দ্বারা মানবজীবনে শান্তি ও নিরাপত্তার আশাও করা যেতে পারে না। মানব জীবনের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য এমন এক কানূনের প্রয়োজন যা হবে ভুল-ত্রুটি ও স্বার্থপরতা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। এরূপ কানূন কানুনে ইলাহী ব্যতীত হতে পারে না।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ্‌র জ্ঞান অসীম, আর ভুল-ত্রুটি ও স্বার্থপরতা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাঁর মধ্যে স্বার্থের লেশমাত্র নেই। কারণ সব কিছুরই তিনি স্রষ্টা, সবকিছু তাঁরই সৃষ্টি। তিনি বেনিয়ায। সকলের তিনি রায্‌যাক বা রিযিকদাতা। সকলের উপর তার অনন্ত করুণা। মানব-দানব, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, তরু-গুল্ম, লতা-পাতা সবকিছুই তাঁর করুণা সমভাবে উপভোগ করে থাকে। এ কারণেই মানব জীবনের সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন আল্লাহ্‌র আইনের।

নবী ও রাসূলের আবশ্যকতা

পার্থিব রাষ্ট্রসমূহের রাষ্ট্রপতিগণ তাদের নিজ নিজ অধিকৃত দেশগুলিতে গভর্নর (ভাইসরয়) নিযুক্ত করে তাদের অধিকার অক্ষুণ্ন রাখার এবং শান্তি শৃঙখলা রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র বিশ্বের একচ্ছত্র মালিক, প্রভু ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী-রাসূলগণও আল্লাহ্‌র গভর্নর। তবে একদিক দিয়ে তাদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। পার্থিব রাষ্ট্রসমূহের গভর্নর শুধু দেশ শাসনের নিমিত্ত নিযুক্ত হয়ে থাকে। বিশ্ব জাহানের মালিক শাহান-শাহ্ তাঁর গভর্নরগণকে শুধু এতটুকু দায়িত্ব দিয়েই ক্ষান্ত হন নি। বরং তিনি মানব জাতিকে সত্যিকার তাহ্‌জীব, নিখুঁত চরিত্র গঠন ও সমস্ত প্রকার পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত করে সত্য পথের সঠিক সন্ধান দেওয়ার গুরু দায়িত্ব অর্পণ করে যুগে যুগে নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করেছিলেন।

যখন দুনিয়ার মানুষ আল্লাহ্‌র নাফরমানি প্রকাশ্যভাবে করতে থাকত, আল্লাহ্‌কে ভুলে যেত, আল্লাহ্‌র ভয় হতে নির্ভয় হয়ে যেত সেই মুহূর্তে রাব্বুল আলামীন মানব জাতিকে পাপ ও অশান্তি মুক্ত করে পুণ্য ও শান্তির পথের সন্ধান দেওয়ার জন্য নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করতেন। নবীগণের সঙ্গে প্রেরণ করতেন আসমানী কিতাব যাতে থাকত আল্লাহ্‌র বিধান।

নবী ও রাসূলগণের ক্রমিকধারা

হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সারা দুনিয়া ও সকল জাতির নিকট রাসূল প্রেরণের ধারা অব্যাহত থাকে। সর্বপ্রথম নবী হযরত আদম (আ) সমগ্র মানব জাতির আদি পিতা এবং সর্বপ্রথম মানুষ। সর্বশেষ নবী আমাদের নবী আল্লাহ্‌র মাহবুব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

www.nagorikpathagar.org

প্রসিদ্ধ আসমানী কিতাবসমূহ

যবুর ঃ হযরত দাউদ (আ)-এর উপর নাযিল হয়।

তাওরাত ঃ হযরত মূসা (আ)-এর উপর নাযিল হয়।

এবং ইঞ্জীল অবতীর্ণ হয় হযরত ঈসা (আ)-এর উপর।

আল-কুরআন সর্বশেষ কিতাব সর্বশেষ নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর নাযিল করা হয়েছে।

দুনিয়ার কোন দেশে নতুন শাসনকর্তা নিযুক্ত হবার পর নতুন শাসনতন্ত্র তৈরী করে পুরাতন শাসনতন্ত্র বাতিল করে দেওয়া হয়। তদ্রূপ আসমান ও যমীনের শাহানশাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর আখিরী রাসূলের উপরে আখিরী কিতাব কুরআনুল করীম অবতীর্ণ করেন এবং নতুন শরীয়ত জারি করে পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের সমস্ত হুকুম মানসূখ অর্থাৎ বাতিল করে দিয়েছেন। কিন্তু পূববর্তী কিতাবসমূহের উপরে বিশ্বাস রাখা ঈমানের অঙ্গ, পূর্বের সমস্ত নবীগণকেও আল্লাহর প্রেরিত বলে বিশ্বাস রাখা ও সম্মান করা ফরয ও ঈমানের অঙ্গ।

আরব দেশ

আরব দেশের উত্তরে সিরিয়ার বিশাল মরুভূমি, দক্ষিণে আরব সাগর তথা ভারত মহাসাগর। পূর্বে পারস্য উপসাগর, আরবে একে খলিজুল কারেশ বা খলিজুল আম্মানও বলা হয়। পশ্চিমে লোহিত সাগর—আরবে একে আল বহিরাতুল কুনযুম বলে। আয়তন ১২ লক্ষ বর্গমাইল, জনসংখ্যা এক কোটিরও বেশি।

আরবের প্রত্যক্ষ পরিবেশ

উত্তরে—মরুভূমির উভয় প্রান্তে সিনাই উপত্যকা, ও প্যালেস্টাইন, সিরিয়া ও ইরাক। দক্ষিণে—কবিম মণ্ডব প্রণালীর অপর তীরে আবিসিনিয়া, ইথিওপিয়া ও সোমালিয়া। ভারত মহাসাগরে অবস্থিত শোকার্তা জাঞ্জিবার, মাদাগাস্কার ও অন্যান্য দ্বীপ। পশ্চিমে মিসর। পূর্বে পারস্য সাগর, মাকরান ও পাকিস্তানের অংশবিশেষ।

আরবের পরোক্ষ পরিবেশ

মিসরের পশ্চিমে আফ্রিকার বারবার এলাকা। ভূমধ্যসাগরের অপর তীরে গ্রীস ও বলকান (ইউনান) আইডনিয়া, মকদুনিয়া মেসিডোন, কিবরাস, মহাপ্রাস, এই সমস্তের সমন্বয়ে বর্তমান গ্রীস দেশ।

www.nagorikpathagar.org

এতদ্ভিন্ন এশিয়া মাইনর (তুরস্ক), ইটালিয়া (রুম), তুরকিস্তান, আজারবাইজান, উজবেকিস্তান, সিনকিয়া, হিন্দুস্তান (ভারত)।

চীন ইত্যাদি দেশের সাথে আরবদের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রাচীনকাল হতেই চলে এসেছে।

আরবদেশের প্রাকৃতিক অবস্থা

এই দেশের বৃহৎ অংশ বালি এবং পাথর। সেখানে বৃষ্টিপাত হয় খুব কম। পাহাড়-পর্বত ও বালুকাময় মরুভূমি অঞ্চল। মরুভূমির দেশে বৃক্ষাদি, তরু-গুল্ম, লতা-পাতা জন্মিতে পারে না। কোন কোন এলাকায় পাহাড় হতে ঝরনাধারা প্রবাহিত হয়। একারণে সেই সকল এলাকায় মরূদ্যান দেখতে পাওয়া যায়। উক্ত এলাকাসমূহে মানুষের আবাদী গড়ে উঠে।

ইসলামের পূর্বে আরবের অবস্থা

মরুভূমির দেশের লোক একস্থানে বাড়িঘর নির্মাণ করে স্থায়িভাবে সুখে শান্তিতে বসবাস করার সুযোগ পায় না। কারণ একমাত্র পশু পালন দ্বারাই তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে হত। তাদের পশুপালের খাবারের সন্ধানে এক মরূদ্যান হতে অন্য মরূদ্যানে বিচরণ করতে হত। একারণে তাদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই থাকত। কিছু কিছু লোক ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারাও জীবিকা নির্বাহ করত। য়ামন এবং সিরিয়ার সাথে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য পূর্ব হতেই চলত। কিন্তু তাদের চরিত্রহীনতার কারণে ব্যবসায়ও তারা আশানুরূপ উন্নতি করতে পারত না।

রাসূলুল্লাহ (সা)-র জন্মের পূর্বে আরবদের দীনী অবস্থা

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আগমনের পূর্বে তাদের মধ্যে দীন-ধর্মের কোন বালাই ছিল না। যদিও তারা মুখে মুখে দাবি করত যে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষ ইবরাহীম (আ)-এর ধর্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত আছি। আসলে ইবরাহীম (আ)-এর ধর্মের সঙ্গে তাদের কোন সংশ্রব ছিল না। কা'বাগৃহে তিনশ ষাটটি মূর্তি স্থাপন করে তাদের পূজা করত।

আরবদের রাজনৈতিক অবস্থা

আরবদেশের লোক ভিন্ন ভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ছিল। এবং প্রত্যেক গোত্রের একজন করে গোত্রপতি থাকত। সে তার নিজ গোত্র পরিচালনা

www.nagorikpathagar.org

করত। হুযূর আকরাম (সা)-এর দাদা আবদুল মুত্তালিব মক্কার নেতা এবং কা'বা গৃহের পুরোহিত ছিলেন। সেই সময়ে মক্কার উত্তরে সিরিয়ার শস্য শ্যামল স্থানগুলি রোম সম্রাটের শাসনাধীনে ছিল। দক্ষিণে ইয়ামনের উন্নত ও উর্বর এলাকাগুলি পারসিকরা অধিকার করে রেখেছিল। আরবদের নিজেদের বলতে অনুন্নত ও অনুর্বর বালুকা এবং পার্বত্য এলাকা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।

আরবদের চারিত্রিক অবস্থা

আরবদের চরিত্র অত্যন্ত খারাপ ছিল। তাদের মধ্যে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি লেগেই থাকত। লুঠতরাজ তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। কোন লোকের অর্থ-সম্পদ ও জান-মালের কোন নিরাপত্তা ছিল না। বিত্তশালী লোকেরা সর্বদাই ভীত সন্ত্রস্ত থাকত। তারা যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকতে ভালবাসত। সামান্য সামান্য কারণে যুদ্ধে লিপ্ত হত আর বছরের পর বছর ধরে তা চলতে থাকত। বিভিন্ন প্রকারের আমোদ-ফূর্তি খেলাধুলাও তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। মদ্যপান করাকে তারা পুণ্য কর্ম এবং গৌরবের কাজ বলে মনে করত। কখনও কখনও মদ্যপানের প্রতিযোগিতা চলত। কোন কোন গোত্রে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাকে জীবন্ত কবর দেওয়ার প্রথাও প্রচলিত ছিল। এতসব দোষ থাকা সত্ত্বেও কিছুকিছু সদগুণও তাদের মধ্যে ছিল। তারা ছিল স্বাধীনতাপ্রিয়, ওয়াদার খেলাফ তারা করত না, মেহমানদারীকে তারা অতিশয় পুণ্য কাজ বলে মনে করত।

আরবের আদিম অধিবাসী

ঐতিহাসিক উলামাগণ আরবের আদিম অধিবাসীদের তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। হযরত নূহ (আ)-এর পুত্র শামের বংশধরগণকে তিনভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।—আরবে বায়েদা, আরবে সারেবা, আরবে মুসতা'রেবা।

আরবে বায়েদাহ ঃ এরা আরবের পুরাতন অধিবাসী ছিল, তাদের নাম-নিশানা দুনিয়ায় নেই। এদের মধ্যে আদ, সামুদ, যুরহাম, যা'সাম শামিল ছিল। এদের মধ্যে অধিকাংশ আল্লাহ্র নাফরমানি করে আল্লাহ্র আযাবের শিকার হয়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

www.nagorikpathagar.org

আরবে আরেবা ঃ এরা ইয়ামনের অজার নামক স্থানের অধিবাসী ছিল। তাদের বনু কাহ্তানও বলা হতো। বনু যারহাম ও বনু ইযারব এদের শাখা ছিল। বনু ইযারবে আবদে শাম্স্ নামক এক ব্যক্তি সাবা নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ইয়ামনের প্রসিদ্ধ শহর মাআরিবের পত্তন করে দুই পাহাড়ের মধ্যস্থানে এক প্রকাণ্ড বাঁধ নির্মাণ করে। এই বাঁধের সহায়তায় পাহাড় হতে নির্গত ঝরনার পানি একস্থানে জমা করে সেচের সাহায্যে বিস্তীর্ণ এলাকায় ফসলের ক্ষেতে এবং ফলের বাগিচায় দেওয়া হত। দীর্ঘদিন পরে এই বাঁধ পুরাতন হওয়ার কারণে জীর্ণ হয়ে পড়ে এবং হঠাৎ এক সময় এই বাঁধ ভেঙ্গে পড়ে সারা দেশে প্লাবন হয়ে যায়। এই প্লাবনের কথা আল্লাহ্ কুরআনে বর্ণনা করেছেন। উমর বিন আমর নামক এক ব্যক্তির স্ত্রী জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিনী ছিল। সে জ্যোতিষ শাস্ত্র আলোচনা করে জানতে পেরেছিল যে, সামনে ভয়াবহ বিপদ উপস্থিত। এই বিপদে দেশের সকল মানুষকে নিপতিত হতে হবে। কেউ এই আকস্মিক বিপদ হতে বাঁচতে পারবে না। এই সুদৃঢ় ও প্রকাণ্ড বাঁধ হঠাৎ ভেঙ্গে পড়বে তাতে সারা দেশ পানিতে ভেসে যাবে এবং তাতে দেশের সকলকেই প্রাণ হারাতে হবে।

উমর এই সংবাদ শুনে বিচলিত হয়ে পড়লেন এবং দেশ ত্যাগ করতে ইচ্ছা করলেন। অতপর তিনি তার দশটি সন্তান ও সাবার বংশধরদের নিয়ে নগর ছেড়ে বের হয়ে পড়লেন। এইভাবে তিনি এই প্লাবন হতে তার নিজের ও তার সন্তানদের এবং সাবার বংশধরদের জীবন রক্ষা করলেন। কিন্তু ইয়ামনে যারা থেকে গিয়েছিল তারা প্রায় সকলেই পানিতে ডুবে প্রাণ হারাল।

উমর নগর ত্যাগ করে প্রাণ রক্ষা করার পরে তার সন্তানেরা ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন স্থানে বাসস্থান নির্মাণ করতে থাকে। ক্রমে তাদের বংশ বৃদ্ধি হলে তারা মদীনায় এসে বাস করতে লাগল। মদীনায় পূর্ব হতেই ইয়াহূদী জাতি বাস করত, তারা ইয়াহূদীদের সঙ্গে সন্ধি করল যে, আমরা কেউ কারও সঙ্গে দুশমনী করব না, কেউ কারো ক্ষতি করব না। সকলে মিলেমিশে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করে বসবাস করব। আউস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরাও ইয়ামনের অধিবাসী ছিল। ইয়ামনের বিখ্যাত প্লাবনের সময় তারাও ইয়ামন ছেড়ে বের হয়ে পড়ে। এবং সিরিয়ায় গিয়ে বসবাস করতে থাকে। পরে তারা সিরিয়া ত্যাগ করে মদীনায় এসে উমরের বংশধরদের সহিত মিলিত হয়। এতে ইয়াহূদীরা ক্রুদ্ধ হয়ে সন্ধি শর্ত ভঙ্গ করে উমরের বংশধর এবং আউস ও খাযরাজ গোত্রের লোকদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। সেই সময় সিরিয়ায় আবূ হোবিল্লা নামক একজন খাযরাজ বংশীয় প্রবল পরাক্রমশালী রাজা রাজত্ব করতেন। আউস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা নির্যাতিত হয়ে রাজা আবূ হোবিল্লার সাহায্য প্রার্থী হয়। রাজা তাদের

www.nagorikpathagar.org

সাহায্য করবার জন্য বিরাট এক সৈন্যবাহিনীসহ মদীনায় উপস্থিত হয়। এবং ইয়াহূদীদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের পরাজিত করে তাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে আউস ও খাযরাজ গোত্রের লোকদের মধ্যে বন্টন করে দেয়। তখন হতে আউস ও খাযরাজগণ মদীনার উত্তর এলাকায় নির্বিঘ্নে বাস করতে থাকে।

রাজা তিব্বার পরিচয়

ইয়ামনের রাজধানী সানআর পশ্চিম দিকে হিমইয়ার প্রদেশ অবস্থিত ছিল। এই স্থানের অধিবাসিগণ ছিল পৌত্তলিক। তাদের মধ্যে তিব্বা নামক একজন পরাক্রমশালী রাজা রাজত্ব করতেন। তার প্রকৃত নাম ছিল আবূ কুরাব আসাদ হিমইয়ারী।

কথিত আছে তিনি হিমইয়ার ও সমরকন্দ নামক দু'টি নগরের পত্তন করেন। তিনি এক সময়ে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন এবং মদীনা জয় করে তার পুত্রকে তথাকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কিন্তু মদীনার অধিবাসিগণ তাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখার নিমিত্ত তিব্বার পুত্রকে হত্যা করে। এ ব্যাপারে রাজা তিব্বা ক্রোধান্বিত হয়ে পুত্র হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে বদ্ধপরিকর হন। মদীনার বনু কুরাইজা গোত্রের দু'জন ইয়াহূদী সাধু পুরুষ যারা তাওরাতের বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন, তাঁরা রাজা তিব্বাকে বুঝিয়ে বললেন তিনি যেন তার সংকল্প ত্যাগ করেন। কেননা তাওরাত কিতাবে বলা হয়েছে আখেরী যামানার নবী তাঁর স্বগোত্রীয় লোকদের দ্বারা নির্যাতিত হয়ে সদলবলে এই মদীনা এসে আশ্রয় গ্রহণ করবেন। সুতরাং মদিনাবাসীর উপরে অত্যাচার করলে আল্লাহ্‌র আযাবে পতিত হতে হবে। রাজা তিব্বা তাদের উপদেশ মেনে নিলেন এবং ইয়াহূদী ধর্ম গ্রহণ করলেন।

রাজা তিব্বা মদীনার চারশ ইয়াহূদী পণ্ডিতের প্রধান শ্যামুয়েল ও তার সঙ্গী চারশ পণ্ডিতের প্রত্যেকের জন্য একটি করে প্রাসাদ নির্মাণ করে দেন। এবং নিজেও তাদের সঙ্গে মদীনায় বাস করতে থাকেন। তিনি এক নিবেদন পত্র প্রস্তুত করে তাতে তদীয় ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হবার বিষয় লিপিবদ্ধ করেন। সেই লিপিকাতে এরূপ লিখেছিলেন যে, আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি আহমদ (হযরত মুহাম্মদ সা) যখন আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত হবেন, যদি আমি সেই শুভ মুহূর্ত পর্যন্ত জীবিত থাকি তবে আমি হব তার মন্ত্রী আর তিনি হবেন বাদশাহ।

এই লিপিকা প্রস্তুত করে তাতে স্বীয় নাম মোহর যুক্ত করতঃ উক্ত পণ্ডিতগণের প্রধান শ্যামুয়েলের হস্তে অর্পণ করলেন। এবং ওসীয়ত করলেন,

www.nagorikpathagar.org

আপনি যদি সেই মহাপুরুষের শুভ দর্শন লাভ করতে পারেন তবে আমার এই নিবেদন পত্র তাঁর চরণ কদমে প্রদান করবেন। আপনার জীবনে যদি সেই শুভ মাহেন্দ্রযোগ ঘটে না ওঠে, তবে পুত্র পৌত্রাদিক্রমে আমার এই নিবেদন পত্র পৌছাবেন। তিব্বা আখিরী নবীর বাসের জন্য এক বিরাট সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করালেন এবং তার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব শ্যামুয়েলের উপর অর্পণ করেন। মদীনার আনসার সাহাবী হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) উক্ত শ্যামুয়েলের একবিংশ অধঃস্তন পুরুষ।

তিব্বার পত্রখানি হস্তান্তর হতে হতে শেষ পর্যন্ত তাঁর হাতে এসে পৌছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) হিজরত করে মদীনায় আগমন করলেন এবং ঘটনাচক্রে আল্লাহ্র ইচ্ছায় তিনি উক্ত আবূ আইয়ূব আনসারীর বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করলেন, তখন হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) তিব্বার উক্ত পত্রখানি রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুবারক হস্তে প্রদান করলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) পত্রখানি পেয়ে তিন বার বলেছিলেন, মারহাবা বি আখিস্সলিহি। নেক ভাই তিব্বা তোমাকে ধন্যবাদ। রাজা তিব্বা যে চর্ম লিপিখানি স্বর্ণ গালায়ে সীলমোহর করতঃ শেষ নবীর হাতে অর্পণ করতে পণ্ডিত প্রধান শ্যামুয়েলের হস্তে প্রদান করেছিলেন নিম্নে তার হুবহু নকল উদ্ধৃত করা হল।

রাজা তিব্বার পত্র

"ওয়া রাবি ইবনে ইসহাক ওয়া গয়রিহি ইন্নাহু কানা ফিল কিতাবি আল্লাজি কাতাবাহু তুব্বায়া, আম্মা বা'দু ফা ইন্নি আমানতু বিমা ওয়া বি কিতাবিকা আল্লাজি ইয়ানযিলু আলাইকা ওয়া আনা আলা দীনিকা ওয়া আমান্তু বি কুল্লি মা-জায়া মিন্ শারায়িয়াল ইসলামি ফা ইন্না আদরকতুকা ফিহা ওয়াসি'মাতি ওয়া ইল্লাম আদর কুকা ফাশফা'নি ওয়ালা তানমানি ইয়াওমাল কিয়ামাতি ফাইন্নি মিন উম্মাতিকাল আউয়ামিন ওয়া বাইয়া'তিকা কিমা মাযয়িকা সুম্মা খতামাল কিতাবা কুতিবা আলা আনু আন্নাহু ইমা মুহাম্মা দুবলি আবদুল্লাহি নাবি'আল্লাহি ওয়া রসূলাহু খতামুন্নাবিয়িনা ওয়া রাসূলু রাব্বিল আলামিনা সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।"

তরজমা ঃ আমি আপনার শুভাগমনের পূর্বেই আপনার উপর ও আপনার উপর অবতারিত কিতাবের উপর ঈমান এনেছি। যদি আপনার সাক্ষাত পাই, তবে খুবই উত্তম অন্যথায় আপনি আমার জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবেন এবং কিয়ামতের দিন আমাকে ভুলবেন না। আমি আপনার পূর্ববর্তী উম্মাতগণের অন্তর্ভুক্ত আপনার আগমনের পূর্বেই আমি আপনার উপর ঈমান আনয়ন করেছি।

www.nagorikpathagar.org

আরবে মুসতা'রেবা ঃ এরা হিজায ও নজদের অধিবাসী ও হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর ছিল। এদের মধ্য হতে অনেক গোত্রের উৎপত্তি হয়, তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল বনি রবিয়া এবং বনি মুদার। বনি মুদারের এক শাখা কুরাইশ নামে বিখ্যাত ছিল। সে বংশে আখিরী যামানার নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) জন্মগ্রহণ করেন। এই বংশকে বনু আদনানও বলা হতো। আরবের সমস্ত গোত্রের মধ্যে এই কুরাইশ গোত্রই ছিল প্রসিদ্ধ। কা'বা গৃহ ছিল সমগ্র আরববাসীর দীনের কেন্দ্র। এই ঘরের খেদমত এবং আরববাসীদের ধর্মীয় পৌরহিত্যের কাজও এই কুরাইশ বংশই করত।

আবরাহার কা'বাগৃহ ধ্বংস করার ঘটনা

আমরা পূর্বেই জানতে পেরেছি যে, হিজায আরবের এমন একটি প্রদেশ, যেখানে কতকগুলো বড় বড় শহর অবস্থিত। যেমন আরবের সামুদ্রিক বন্দর জিদ্দা, তায়েফ, মক্কা ও মদীনা ইত্যাদি। তন্মধ্যে মক্কা ও মদীনা সবচেয়ে বিখ্যাত ও সম্মানিত শহর। আল্লাহ্‌র ঘর খানায়ে কা'বা এই মক্কাতেই অবস্থিত। এই কা'বা গৃহকে সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌র হুকুমে হযরত আদম (আ) নির্মাণ করেন। দীর্ঘ দিন অতীত হবার পরে এই গৃহ একরূপ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। পরে আবার আল্লাহ্‌র হুকুমে ইবরাহীম (আ) ও তদীয় পুত্র ইসমাঈল (আ) পুনরায় এই ঘরের সংস্কার করেন। কা'বা গৃহের দেওয়াল পাথরের তৈরী। ১৫ গজ দৈর্ঘ ও ১২ গজ প্রস্থ, ৯ গজ উঁচু। কা'বা গৃহের চতুর্দিকের বিস্তীর্ণ এলাকাকে হেরেম শরীফ বলা হয় অর্থাৎ অতি সম্মানিত ও পবিত্র। লোহিত সাগরের পূর্বদিকে সৌদি আরব ও ইয়ামন এবং পশ্চিম দিকে আফ্রিকা মহাদেশ অবস্থিত। সৌদি আরবের দক্ষিণ অংশে ইয়ামন এবং ইয়ামনের বরাবর লোহিত সাগরের অপর পাড়ে আফ্রিকার ঐ বিখ্যাত দেশটি অবস্থিত যেখানে বাদশাহ নাজ্জাশীর শাসনকালে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সাহাবীগণ মক্কাবাসীদের অত্যাচারের কারণে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেকালে ঐ দেশটির নাম ছিল হাবশা। বর্তমানে ইরিত্রিয়া ও ইথিওপিয়া নামে দেশটি পরিচিত।

৫২৫ খৃস্টাব্দে হাবশার খৃস্টান শাসকরা ইয়ামন দখল করে নেয়। ১০/১২ বছর পরে আবরাহা ইয়ামনের গভর্নর হয়। ধীরে ধীরে আবরাহা ইয়ামনে স্বাধীন হয়ে যায়। আবরাহা সমগ্র আরবে খৃস্ট ধর্ম প্রচারের সাথে সাথে আরবদের হাত হতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য দখল করার চেষ্টা চালায়। আরবের পূর্বদিকে ভারত, চীন ও ইন্দোনেশিয়ার সাথে এবং পশ্চিমে আফ্রিকা ও ইউরোপের সাথে যে ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল তা আরবের মাধ্যমে চলত।

www.nagorikpathagar.org

আরবদের ধর্মীয় অবস্থা যতই বিকৃত থাকুক চার হাজার বছর পূর্ব থেকেই হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সময় হতে মক্কার কা'বা গৃহ সমগ্র আরববাসীর নিকট সম্মানের স্থানরূপে গণ্য ছিল। কা'বা ঘরের যিয়ারতের জন্য রজব, যিলকদ, জিলহজ্জ ও মহরম মাসে সমগ্র আরবে যুদ্ধ-বিগ্রহ, মারামারি, কাটাকাটি বন্ধ থাকত। ঐ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তখন বিনা বাধায় চলত। আর কা'বাগৃহের হিফাজতকারী হিসাবে কুরাইশ বংশের লোকেরা সারা বছর বিনা বাধায় ব্যবসা করত। গোত্রে গোত্রে যত মারামারি ও লুটতরাজই চলুক কা'বা গৃহের সম্মানের কারণে কুরাইশদের সবাই সম্মান করত বলে তাদের ব্যবসায় কোন অসুবিধা হত না।

আবরাহা এই গোটা ব্যবসা আরবদের হাত থেকে কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে বুঝতে পারল যে, মক্কার কা'বাগৃহের সঙ্গে এর এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যে, এর মত সম্মান পাবার মত কোন ধর্মীয় কেন্দ্র ইয়ামনে কায়েম করতে না পারলে খৃস্টধর্ম ও ঐ ব্যবসা দখল—কোন আশাই পূর্ণ হতে পারে না। এ কারণে ইয়ামনের রাজধানী সানআতে এক বিরাট গীর্জা নির্মাণ করে কা'বার পরিবর্তে ঐ গীর্জার যিয়ারত করার জন্য সমগ্র আরবে ঘোষণা করে দিল।

আরবের লোকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে ঐ গির্জায় আগুন লাগিয়ে দিল এবং অবমাননা করার উদ্দেশ্যে রাত্রি বেলায় ঐ গীর্জায় পায়খানা করে রাখল। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে আবরাহা ষড়যন্ত্র করে নিজের লোকদের দ্বারাই এ সমস্ত করিয়েছিল, যাতে কা'বা আক্রমণের একটা অজুহাত হয়ে যায়। আবরাহা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিল যে, মক্কার কা'বা ঘর কায়েম থাকা পর্যন্ত তার গীর্জা মানুষকে মোটেই আকৃষ্ট করতে পারবে না। তাই সে কা'বা ঘর ধ্বংস করার জন্য সুযোগ অনুসন্ধান করছিল। ৫৭০ খৃস্টাব্দে ১৪টি হাতীসহ ৬০ হাজার হাবসী সৈন্যের বিরাট বাহিনী নিয়ে আবরাহা মক্কার দিকে যাত্রা করল। পথে কোন কোন আরব গোত্র বাধা প্রদানের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে যায়। মক্কার নিকটে এসে তার সেনাবাহিনীকে সেখানেই অবস্থান করার নির্দেশ দিয়ে আবরাহা মক্কার সর্দারদের কাছে দূত প্রেরণ করে। দূত মক্কায় গিয়ে বলল, বাদশাহ্ মক্কাবাসীদের আক্রমণের জন্য আসে নাই। কা'বা গৃহ ভেঙ্গে দেওয়া ব্যতীত তার অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। এ বিষয়ে বাদশাহ্ সরদারদের সঙ্গে আলাপ করতে চায়।

রাসূলুল্লাহ (সা)-র দাদা আবদুল মুত্তালিবই সবচেয়ে বড় সরদার ছিলেন। তিনি দূতের সঙ্গে আবরাহার কাছে আসলেন। তাঁর চেহারা ও ব্যক্তিত্ব এমন আকর্ষণীয় ছিল যে, তাঁকে দেখেই আবরাহা নিজের আসন থেকে উঠে সম্মানের সঙ্গে তাঁকে নিয়ে আলোচনায় বসল। আবদুল মুত্তালিব বললেন, আপনার কোন

www.nagorikpathagar.org

কিছু প্রয়োজন থাকলে আমাদের বললেই হতো, আপনার এত কষ্ট করে আসবার কি দরকার ছিল ? আবরাহা বলল, আমি শুনেছি কা'বার ঘর নাকি শান্তির ঘর। আমি সেই শান্তিকেই খতম করার জন্য এসেছি। আবদুল মুত্তালিব বললেন যে, এই ঘরের যিনি মালিক তিনি তাঁর ঘরকে রক্ষা করবেন। আবরাহা বলল, আমি এ ঘর না ভেঙ্গে ফিরে যাব না। আবদুল মুত্তালিব বললেন, আপনি যা চান তা আমাদের নিকট থেকে নিয়ে ফিরে যান।

কিন্তু আবরাহা এ কথা শুনতে রাযী হল না এবং মক্কা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, আবরাহার সেনাবাহিনী যেখানে অবস্থান করছিল সেখান থেকে তারা মক্কাবাসীদের উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি পালিত পশু দখল করে নিয়েছিল। এর মধ্যে আবদুল মুত্তালিবেরও দুই শত উট ছিল। আবরাহার সঙ্গে আলোচনা করার সময় যখন আবদুল মুত্তালিব তাঁর উটের কথা বললেন এবং তা ফিরিয়ে দিতে বললেন, তখন আবরাহা বলল, আপনি কা'বা ঘরের খাদেম, আর আমি এসেছি সেই ঘর ধ্বংস করতে। অথচ এ ব্যাপারে আপনি কিছুই বললেন না, আর উটের জন্য এত ব্যস্ত হলেন ?

এ কথার জওয়াবে আবদুল মুত্তালিব বললেন, এ ঘরের যিনি মালিক ঘরের হিফাজত তারই দায়িত্ব, তার হিফাজত তিনিই করবেন। আমি এ ঘরের মালিক নই। আমি আমার উটের মালিক, আপনি আমার উট আমাকে ফিরিয়ে দিন। তখন আবরাহা উটগুলো ফিরিয়ে দিল। আবদুল মুত্তালিব মক্কায় ফিরে এসে মক্কাবাসীকে হুকুম দিলেন তাদের বিবি বাচ্চাদের নিয়ে পাহাড়ে আশ্রয় নিতে। এবং নিজে কয়েকজন কুরাইশ নেতাকে সঙ্গে নিয়ে কা'বা গৃহের দরজার কড়া ধরে আল্লাহ্র নিকটে দোয়া করতে লাগলেন। এ বিপদের সময় কোন সরদারই কা'বায় রাখা তিন শত ষাটটি মূর্তির কাছে সাহায্য চায় নাই। একমাত্র বিশ্ব জাহানের মালিক আল্লাহ্র কাছেই সবাই দোয়া করেছিলেন। দোয়া শেষে তারাও পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

পরের দিন আবরাহা মক্কায় প্রবেশ করার জন্য অগ্রসর হল। তখন তার নিজের হাতী যা সকলের অগ্রভাগে চলছিল সহসা বসে গেল। হাতীটিকে চাবুক মারা হলো এবং মারতে মারতে তাকে আহত করা হল; কিন্তু তবুও সে এক বিন্দুও নড়ল না। তাকে অন্যদিকে চালাতে চেষ্টা করলে সে দৌড়াতে শুরু করত; কিন্তু মক্কার দিকে চালাতে চেষ্টা করা হলে সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়ত। তখন কোনক্রমেই সম্মুখের দিকে চলতে প্রস্তুত হত না। এই সময় ঝাঁকে ঝাঁকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাখি ঠোঁটে ও পায়ে পাথর টুকরা নিয়ে উড়ে এল এবং কা'বা আক্রমণকারী

www.nagorikpathagar.org

বাহিনীর উপর নিক্ষেপ করতে লাগল। যার উপর এই পাথর পড়ল তার শরীর তখনি বিগলিত হতে লাগল। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ও ইকরামার বর্ণনা হল, পাথরের স্পর্শ লাগা মাত্রই বসন্ত রোগ শুরু হয়ে যেতে লাগল। আরবদেশ সমূহে এই রোগ প্রথম এই বছরই দেখা দেয়। যার উপরে এই পাথর পড়তে লাগল সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরে ভয়ানক রকমের চুলকানি শুরু হত। এই চুলকানির ফলে চামড়া ফেটে মাংস খসে পড়তে লাগল। শরীরের গোস্ত ও রক্ত পানির মত ঝরে পড়তে লাগল এবং অস্থি বের হয়ে পড়তে লাগল। স্বয়ং আবরাহারও এই অবস্থা হল। তার শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে খসে পড়তে লাগল। যেখান হতে গোশত খসে পড়তে লাগল সেখান থেকে পূঁজ ও রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল। অবশেষে তারা নিরুপায় হয়ে ইয়ামনের দিকে পালাতে লাগল। খাশইয়াম অঞ্চল হতে নুফাইল ইবনে হাবীব খাশইয়ামী নামক এক ব্যক্তিকে পথপ্রদর্শক বানিয়ে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল, তাকে খুঁজে এনে পথ দেখাতে বলল, কিন্তু সে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিল, পালাবার পথ আর কোথায় পাবে? যখন আল্লাহ্ তোমাদের পাকড়াও করেছেন।

এভাবে আবরাহা তার হস্তী বাহিনীসহ বিধ্বস্ত হয়ে গেল। আবরাহা ধ্বংস হয়ে যাবার পর ইয়ামনে হাবসী রাজত্ব শেষ হয়ে যায়। ইয়ামনীরা হাবসীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাদের স্বাধীনতা ফিরে পায়। মক্কা হতে আরাফাত যাবার পথে মুহাস্‌সাব উপত্যকার মুহাস্‌সির নামক স্থানে আবরাহার সৈন্য বাহিনীর উপরে আবাবিল পাথর নিক্ষেপ করেছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ্জের সফরে যখন মুজদালিফা হতে মিনার দিকে যাচ্ছিলেন তখন মুহাস্‌সাব উপত্যকায় চলার গতি খুব দ্রুত করে দিলেন। ইমাম নবুবী লিখেছেন, হস্তীওয়ালাদের ঘটনা ঠিক এই স্থানেই সংঘটিত হয়েছিল। এই কারণে স্থানটি দ্রুত অতিক্রম করে যাওয়া সুন্নাত। হজ্জের সময় আরাফাত থেকে আসার সময় মুজদালিফায় হাজী সাহেবদের খোলা আকাশের নিচে রাত্রি যাপন করতে হয়। তখন সবাই সাবধান থাকেন যেন ভুলে মুহাস্‌সির নামক স্থানটিতে অবস্থান না করা হয়।

আবরাহার হাবসী বাহিনী সমগ্র আরবে আসহাবে ফীল বা হস্তীওয়ালা বাহিনী নামে পরিচিত হয়। এবং যে বছরে এ ঘটনা সংঘটিত হয় সে বছরকে আমুল ফীল বলা হয়। এটা এত বড় মারাত্মক ঘটনা যার চর্চা ঘরে ঘরে হতে থাকল। কবিরাও এ ঘটনা নিয়ে অনেক কবিতা রচনা করেন। এ ঘটনা মুহররম মাসে সংঘটিত হয় আর রসূলুল্লাহ (সা) রবিউল আউয়াল মাসে ভূমিষ্ঠ হন। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে আবরাহার ঘটনার পঞ্চাশ দিন পরে রসূলে পাক (সা) জন্মগ্রহণ করেন।

www.nagorikpathagar.org

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্মের পূর্বাবস্থা

সূর্য উদয়ের পূর্বে যেমন সুবহে সাদিকের আগমনে অন্ধকার বিদায় নিতে থাকে, এবং পূর্ব আকাশের সোনালি আভায় সমগ্র দুনিয়া আলোকিত করে সূর্য উদয়ের সুসংবাদ জ্ঞাপন করতে থাকে, তেমনিভাবে যখন দীনের সূর্য উদয়ের সময় নিকটবর্তী হতে লাগল দুনিয়ার বুকে তেমনি অলৌকিক ঘটনাসমূহ সংঘটিত হতে লাগল। যে ঘটনার কথা পূর্বে আলোচনা করা হল এই ঘটনার কথা আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে করীমের সূরা ফিলের মধ্যে বিবৃত করেছেন। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্মের পঞ্চাশ দিন পূর্বে মক্কার বুকে এই ঘটনা সংঘটিত হয়।

এই ঘটনাকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আগমনের পূর্বাভাস বলা হয়। এরূপভাবে আমিনার নিকট অনেক আশ্চর্য ঘটনা প্রকাশ হতে থাকে এবং তিনি তা লক্ষ্য করে তাজ্জব হয়ে যেতেন। চলবার সময় পদতলে শক্ত পাথর মোমের মত নরম হয়ে যেত। প্রখর রোদ্রের সময় মেঘমালা মাথার উপরে ছায়া করত। গভীর কূপ হতে পানি উঠাবার সময় কূপের পানি কূপের মুখ পর্যন্ত উঠে আসত। আমিনা বর্ণনা করেছেন, যখন আমার প্রসবের সময় নিকটবর্তী হয়ে এল তখন আমি স্বপ্নে এক রাত্রে দেখলাম একজন আমাকে বলছেন, হে আমিনা! তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর, তোমার পেটে যিনি রয়েছেন তিনি আখেরী উম্মাতের নেতা হবেন। এমন একদিন আসবে যেদিন সমগ্র দুনিয়া তাঁর অনুসরণ করবে আর তারই অনুসরণের মধ্যে মানবকুলের মুক্তি ও কল্যাণ রয়েছে। আমিনা তুমি তাঁকে আল্লাহ্র উপর সোপর্দ করো, তাঁর নাম রেখ মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)।

স্বর্গীয় পুষ্পের স্বর্গ ছেড়ে ধূলির ধরায় অবতরণ

যে বছর আবরাহা বাদশাহ্ কা'বা গৃহ ধ্বংস করতে এসেছিল সেই বছর রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ সোমবার দুনিয়ার এক শুভ মুহূর্ত ছিল। এই শুভ মুহূর্তে হযরত আদম (আ)-এর বংশের গৌরব রবি হযরত নূহ (আ)-র কিস্তির হিফাজত, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়া, হযরত মূসা (আ) ও হযরত ঈসা (আ)-র সুসংবাদ তাজেদারে মদীনা, ফখরে রিসালাত, সরওয়ারে কায়েনাত, মুফাখখারে মওজুদাত, হুজুরপুর নূর (সা) সোমবার সুবহে সাদিকের শুভক্ষণে স্বর্গীয় পুষ্প স্বর্গ ছেড়ে পাপ-তাপপূর্ণ পৃথিবীকে পাপ-তাপ থেকে পবিত্র করতে ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ধূলির ধরায় অবতরণ করলেন।

www.nagorikpathagar.org

যে মুহূর্তে তিনি ধরাধামে পদার্পণ করেন সেই মুহূর্তে এমনি এক নূর প্রকাশ হয়, যে নূরের আলোকে মাশরিক হতে মাগরিব পর্যন্ত সমগ্র দুনিয়া উদ্ভাসিত হয়ে যায়। আবদুল মুত্তালিব যখন এই সংবাদ শুনতে পেলেন তখন সূতিকা গৃহে প্রবেশ করে পিতৃহীন ইয়াতীম পৌত্রকে বক্ষে ধারণ করলেন। এবং কা'বা গৃহে প্রবেশ করে নবজাতকের কুশল কামনা করে রব্বুল আলামীনের দরবারে দোয়া খায়ের করলেন। সপ্তম দিবসে আকিকা পর্ব সমাপন করে নাম রাখলেন মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

সত্যের সূর্যের উদয় অসত্যের অন্ধকার বিদায়

একদিকে দুনিয়ার ভাগ্যাকাশে সত্যের সূর্যের উদয় অপরদিকে কায়সার ও কিসরার ধ্বংসের পূর্বাভাস। রাসূলুল্লাহ (সা)-র ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে পারস্যের রাজপ্রাসাদে হঠাৎ ভূমিকম্প হয়ে গেল। এতে পারস্য সম্রাটের চৌদ্দ গম্বুজওয়ালা রাজপ্রাসাদ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। পারস্য দেশে সাওর নামে একটি নদী হঠাৎ শুষ্ক হয়ে যায়। পারসিকগণ অগ্নি পূজারী ছিল। রাজ অন্তপুরে হাজার বছর ধরে বিরাট অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত ছিল। হঠাৎ তা নির্বাপিত হয়ে গেল। এই সকল ঘটনা স্পষ্টরূপে প্রমাণ করে সত্যের আগমনে অসত্যের পলায়নের পূর্বাভাস।

بَلَغَ الْعُلٰى بِكَمَالِهٖ كَشَفَ الدُّجٰى بِجَمَالِهٖ

حَسُنَتْ جَمِيْعُ خِصَالِهٖ صَلُّوْا عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ

পৃথিবীতে মানব জাতির আগমনের ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জি

রাসূলুল্লাহ (সা)-র জন্ম তারিখ ১২ই রবিউল আউয়াল আসহাবে ফিলের হিসাব মুতাবিক এপ্রিলের বিশ তারিখ ৫৭১ খৃস্টাব্দ সোমবার। এই হিসাব অনুযায়ী হযরত ঈসা (আ) হতে রাসূলুল্লাহ (সা)-র মাঝখানে ব্যবধান ৫৭১ বছরের। হযরত মূসা (আ)-র যামানা হতে হযরত ঈসা (আ) পর্যন্ত ১৭১২ বছর। হযরত মূসা (আ)-র সময় হতে হযরত ইবরাহীম (আ) পর্যন্ত ৫৪৫ বছর। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যামানা হতে হযরত নূহ (আ)-র প্লাবন পর্যন্ত ১০৮১ বছর। হযরত নূহ (আ)-র তুফান হতে হযরত আদম (আ) পর্যন্ত ২২৪৬ বছর। রাসূলুল্লাহ (সা)-র জন্ম হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত ১৪১৫ বছর। এই হিসাব অনুযায়ী পৃথিবীতে মানুষের আগমন হয়েছে ৭৫৬৬ বছর পূর্বে।

এ হিসাবটি মওলানা আবদুল হক জালালাবাদী সাহেবের সীরাতে মোস্তফা নামক উর্দু গ্রন্থ হতে সংগৃহীত।

www.nagorikpathagar.org

মাতার পক্ষ হতে বংশধারা

মুহাম্মাদ (সা) ইবনে আমিনা বিনতে ওহাব ইব্‌ন্ আবদে মান্নাফ ইব্‌ন্ জহিরা ইবন কিলাব পর্যন্ত পৌঁছার পরে মাতৃবংশ আর পিতৃ বংশ এক। আবদুল মুত্তালিবের দশ পুত্র ছিলেন। এদের মধ্যে পাঁচজন কোন কোন গুণের কারণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আবূ লাহাব, আবূ তালিব, আবদুল্লাহ্‌, হামজা (রা) ও আব্বাস (রা)। দশ পুত্রের মধ্যে আবদুল্লাহ্‌ই ছিলেন সকলের প্রিয়। তিনি সতর বছর বয়সে কুরাইশ গোত্রের অন্য আর এক শাখা বনি জহিরা গোত্রের ওহাবের কন্যা আমিনার সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। বিবাহের কয়েক মাস পরে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে শাম দেশে গমন করেন। শাম হতে ফিরার সময় অসুস্থ হয়ে পড়েন। এবং মদীনায় মাতৃ বংশ বনি নাজ্জারদের নিকট উপস্থিত হন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর পরিত্যক্ত সম্পদের মধ্যে ছিল পাঁচটি উষ্ট্র ও একটি বাঁদী। পিতার মৃত্যুর তিন মাস পরে দয়ার নবী করুণার ছবি জন্মগত য়াতিমরূপে দুনিয়ার বুকে পদার্পণ করলেন। তাঁর প্রতিপালনের দায়িত্ব দাদা আবদুল মুত্তালিব গ্রহণ করলেন।

পিতার পক্ষ হতে বংশ তালিকা

রাসূলে আকরাম (সা) বলেছেন ঃ যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা যমীন, আসমান ও আঠারো হাজার কায়েনাতের কিছুই সৃষ্টি করেননি তখন সৃষ্টি করেন আমার নূর। আউয়ালু মা খালাকাল্লাহু নূরী ঃ পরে যখন আদম (আ)-কে মাটির দ্বারা তৈরী করে তাতে রূহ সংস্থাপন করা হয়, তখন উক্ত নূর মুবারক তাঁর ললাটদেশে সংস্থাপন করা হয়। অতঃপর উক্ত নূর পর্যায়ক্রমে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণের একজন হতে অন্যজনের নিকট স্থানান্তরিত হয়। উক্ত ব্যক্তিগণের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হল।

হযরত আদম (আ)-এর পুত্র হযরত শিশ (আ), তাঁর পুত্র নমুদ, তাঁর পুত্র কেনান, তাঁর পুত্র মোইমাইল, তাঁর পুত্র বারোদ, তাঁর পুত্র আখ মুখ, তাঁর পুত্র মুন সামাখা, তাঁর পুত্র হযরত নূহ (আ), তাঁর পুত্র সাম, তাঁর পুত্র ফাখসাদ, তার পুত্র সালেখ, তার পুত্র নালর, তাঁর পুত্র আমর, তার পুত্র আযর, তাঁর পুত্র হযরত ইবরাহীম (আ), তাঁর পুত্র ইসমাইল (আ), তাঁর পুত্র কেদার, তাঁর পুত্র আওয়াম, তাঁর পুত্র আউস, তাঁর পুত্র মুর, তাঁর পুত্র শামিহ্‌, তাঁর পুত্র রোমা, তাঁর পুত্র নাজিব, তাঁর পুত্র মোসের, তাঁর পুত্র ইয়াহাম, তাঁর পুত্র আফতাদ, তাঁর পুত্র ঈসা, তাঁর পুত্র হাস্‌সান, তাঁর পুত্র আলফা, তাঁর পুত্র আরোজ, তাঁর পুত্র বানাদি, তাঁর

www.nagorikpathagar.org

পুত্র বাহারি, তাঁর পুত্র হারি, তাঁর পুত্র ইসন, তাঁর পুত্র হোমরান, তাঁর পুত্র আলবোয়া, তাঁর পুত্র ওবায়েদ, তাঁর পুত্র আনাস, তাঁর পুত্র আসাক, তাঁর পুত্র মাহি, তাঁর পুত্র নাথর, তাঁর পুত্র কাজিম, তাঁর পুত্র কামেহ, তাঁর পুত্র বাদনাস, তাঁর পুত্র ইয়াস সারুম, তাঁর পুত্র হিরা, তাঁর পুত্র নাসিন, তাঁর পুত্র আকিনায়াম, তাঁর পুত্র মাতসায়েল, তাঁর পুত্র আন হোমায়সা, তাঁর পুত্র আকাদ, তাঁর পুত্র আদনান, তাঁর পুত্র সায়াদ, তাঁর পুত্র হামেন, তাঁর পুত্র নাবেদ, তাঁর পুত্র সালমান, তাঁর পুত্র আল হোমায়সা, তাঁর পুত্র এমিয়াসা, তাঁর পুত্র আদাদ, তাঁর পুত্র আদ, তাঁর পুত্র আদনান, তাঁর পুত্র মোয়াদ, তাঁর পুত্র নজর, তার পুত্র খোজায়মা, তার পুত্র কানানা, তার পুত্র আল-নজর, তার পুত্র সালেক, তার পুত্র ফিহর (বা কুরায়েশ), তার পুত্র গালেব, তার পুত্র মাভি, তার পুত্র কায়ার, তার পুত্র মোররা, তার পুত্র কিলাব, তার পুত্র কুশাই, তার পুত্র আবদে মান্নাফ, তাঁর পুত্র হাশিম (এঁর থেকেই হাশেমী বংশ), তাঁর পুত্র আবদুল মুত্তালিব তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্।

হযরত আদম (আ)-এর ললাটে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র যে মুবারক নূর সংস্থাপিত হয়েছিল, সেই নূর বংশানুক্রমিকভাবে সর্বশেষ ব্যক্তি আবদুল্লাহর ললাটে এসে সংস্থাপিত হয়। এই আবদুল্লাহর ঔরসে বিবি আমিনার গর্ভে রহমতে দো আলম, ফখরে রসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) জন্মগ্রহণ করেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র দুধ-মাতা

রাসূলুল্লাহ্ (সা) সর্বপ্রথম কয়েকদিন আপন মাতার দুধ পান করেন। পরে আবূ লাহাবের বাঁদী সোবিয়ার দুগ্ধ পান করেন। আরব দেশে শহরের লোকদের অভ্যাস ছিল নিজ নিজ দুগ্ধ পান উপযোগী শিশুকে গ্রামাঞ্চলে ধাত্রীর নিকটে দুধ পান করানো উদ্দেশ্যে প্রেরণ করত। এই উদ্দেশ্যে যে, শহরের উষ্ণ আবহাওয়া শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। গ্রাম্য মুক্ত আবহাওয়া শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী হবে এবং নির্ভেজাল আরবী ভাষা শিখতে পারবে। এ কারণে গ্রাম্য মেয়ে লোকেরা মাঝে মাঝে দুগ্ধ পান উপযোগী শিশুর সন্ধানে শহরে গমন করত। হযরত হালিমা সাদিয়া (রা) বলেন ঃ আমি তায়েফ থেকে বনি সায়াদের মেয়েদের সঙ্গে দুগ্ধ পান উপযোগী শিশুর সন্ধানে মক্কায় যাত্রা করলাম। কিন্তু আমার সওয়ারী জন্তুটি এত দুর্বল ছিল যে কাফেলার সঙ্গে চলতে সক্ষম ছিল না। এ কারণে সবাই আমাকে পিছু ফেলে আগে চলে গেল, আমি সর্বশেষে মক্কায় গিয়ে পৌছলাম। হযরত হালিমা বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট যে-ই গেল, পিতৃহীন শুনে সকলে ফিরে যেতে লাগল। কারণ পিতৃহীন শিশুর প্রতিপালন করে

www.nagorikpathagar.org

আশানুরূপ পারিতোষিক লাভ করা যাবে না। এই বছর সারা দেশে দুর্ভিক্ষ বিরাজ করছিল। অনাহারক্লিষ্টতার কারণে আমারও দুগ্ধ কম ছিল, দুগ্ধ কম থাকার কারণে ধনী লোকেরা তাদের শিশু আমাকে দিল না।

হালিমার স্তনে দুগ্ধ কম থাকাই তার জন্য আল্লাহ্র করুণা হয়ে দেখা দিল। হালিমা তাঁর স্বামীকে বললেন, খালি হাতে ফিরে যাওয়া হতে য়াতীম শিশুকে নিয়ে যাওয়াই উত্তম। হালিমার স্বামী রাযী হয়ে গেলেন এবং তাঁরা এই য়াতীম শিশুকে নিয়ে যাওয়াই স্থির করলেন। এই য়াতীম শুধু হালিমা আমিনার গৃহের আলোই ছিল না, এই শিশু মাশরিক থেকে মাগরিব পর্যন্ত সারা আলমের আলোকবর্তিকা নিয়ে এই ধরাধামে পদার্পণ করেছিলেন। আল্লাহ্র অনন্ত কৃপায় হালিমার অদৃষ্টের পরিবর্তন সূচিত হল। আমিনা তাঁর কলিজার টুকরা নয়নের মণি হালিমার নিকট সোপর্দ করলেন।

বরকত প্রকাশ

হালিমা যখন শিশু নবীকে বক্ষে তুলে নিলেন সঙ্গে সঙ্গে এক আশ্চর্য বিপ্লব সূচিত হল। অনাহারক্লিষ্ট শুষ্ক স্তন যাতে মোটেই দুগ্ধ ছিল না সেই শুষ্ক স্তনে দুগ্ধের জোয়ার এল। শিশু নবী আর হালিমার নিজের শিশু দুজনেই তৃপ্তিসহকারে দুগ্ধ পান করে মনের আনন্দে ঘুমিয়ে পড়লেন। সেই সাওয়ারীর জন্তু যা একটু পূর্বে দুর্বলতার কারণে চলতে সক্ষম ছিল না এখন তার বাগ টেনে ধরেও ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছিল না। আরব দেশ জুড়ে দুর্ভিক্ষ বিরাজ করছিল, লোক অনাহারে অর্ধাহারে দিন যাপন করছে অথচ হালিমার গৃহে সুখের প্রাচুর্য বিরাজ করছে। অনাবৃষ্টির কারণে বন-জঙ্গলে, মাঠে, প্রান্তরে গৃহপালিত পশুর খাবার মিলছে না, সকলের পশু অনাহারে মরছে আর হালিমার গৃহপালিত পশুগুলি পেট পুরে খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হচ্ছে। আসল কথ—এইরূপ হাজারও বরকত দুগ্ধ পানের সময় থেকেই প্রকাশ পেতে থাকে। তিনি হালিমার এক স্তনের দুগ্ধ পান করতেন অন্য স্তনের দুগ্ধ দুধ ভাইয়ের জন্য রেখে দিতেন।

মুবারক জবানের প্রথম বাক্য

হযরত হালিমা (রা) বলেছেন, মুবারক জবানে প্রথম যে বাক্য বের হয়েছিল তা ছিল আল্লাহু আকবর কাবীরান আলহামদু লিল্লাহ্ কাসীরান, সুবহানাল্লাহি বুকরাতাঁও ওয়া আসীলান। মুবারক জবানে যখন বাক্য স্ফুরিত হলো তখন সর্বপ্রথম বাক্য এটাই ছিল। দুই বছরের সময় হযরত হালিমা রাসূলুল্লাহ্

www.nagorikpathagar.org

(সা)-কে সঙ্গে নিয়ে মক্কায় হুযূর পাক (সা)-এর মাতা আমিনার নিকট সোপর্দ করার নিমিত্ত মক্কায় আগমন করলেন। কিন্তু এই সময় মক্কায় বিসূচিকা রোগ মহামারী আকারে দেখা দিয়েছিল। এ কারণেই আবার ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন।

ছাগল চরাবার জন্য হালিমার ছেলেদের সঙ্গে গমন

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মুবারক কদমে চলতে শিখলেন তখন একদিন হালিমার নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, মা আমার সাথী ভাই সমস্ত দিন কোথায় থাকে ? হালিমা বললেন, সে জংগলে ছাগল চরাতে যায়। তিনি বললেন, আমিও তার সঙ্গে ছাগল চরাতে যাব, হালিমা নিষেধ করলেন কিন্তু তা না শুনে দুধ-ভ্রাতা আবদুল্লাহ্র সঙ্গে ছাগল নিয়ে জংগলে গমন করলেন।

প্রথমবার সিনাচাক (বক্ষবিদীর্ণ)

একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) দুধ-ভ্রাতা আবদুল্লাহ্র সঙ্গে ছাগল চরাতে ছিলেন। এমতাবস্থায় আবদুল্লাহ্ দৌড়ে এসে তার মাতা-পিতার নিকট বললেন, আমার কুরায়েশী ভ্রাতাকে সাদা পোশাক পরিহিত দুই ব্যক্তি এসে ধরে চিৎ করে শোয়ায়ে সিনা চিরে ফেলেছে। আমি এই দৃশ্য দেখে চলে এসেছি। এই সংবাদ শোনামাত্র হালিমা ও তাঁর স্বামী পেরেশান হয়ে উন্মাদের ন্যায় ছুটে চললেন জংগলের দিকে। জংগলে গমন করে দেখলেন রাসূলে পাক (সা) সুস্থাবস্থায় রয়েছেন। হালিমা স্নেহের স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, বলো তোমার কি হয়েছিল ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করে শুনালেন ঃ সাদা পোশাক পরিহিত দুই ব্যক্তি এসে আমাকে চিৎ করে শোয়ায়ে আমার সিনা চিরে ফেললেন এবং ভিতর থেকে কি যেন বের করলেন এবং পানি দ্বারা ধৌত করে আবার যথা স্থানে স্থাপন করে আবার বক্ষ জুড়ে দিলেন, ইত্যাদি পূর্ণ বিবরণ শোনালেন। সকল ঘটনা শুনে হালিমা ভীত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সঙ্গে নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন।

হুযূর পাক (সা)-কে সঙ্গে নিয়ে গণকের নিকট গমন

গৃহে ফিরে হালিমা (রা) হুযূর পাক (সা)-কে সঙ্গে নিয়ে গণকের নিকট গমন করলেন। গণক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখেই চিনতে পারলো এবং বুকের উপরে তুলে নিয়ে বলতে লাগল ঃ হে আরবের লোক সকল! যে বিপদ অতি সত্বর তোমাদের উপর আগমন করছে সে বিপদ হতে বাঁচবার জন্য এই শিশুকে হত্যা কর। এবং সেই সঙ্গে আমাকেও হত্যা কর। যদি তোমরা এই শিশুকে হত্যা না

www.nagorikpathagar.org

কর তবে সে তোমাদের পিতৃপিতামহের দীনকে ধ্বংস করে ছাড়বে। এবং সে তোমাদের এমন এক দীনের দিকে আহ্বান করবে যা আজ পর্যন্ত শুনতেও পাও নাই।

এই গণকের কথা শুনে হযরত হালিমা ক্রুদ্ধ হয়ে বদ বখতের নিকট হতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ছিনিয়ে নিলেন এবং বললেন, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে? এখন তোমার নিজেরই মস্তিষ্কের চিকিৎসা প্রয়োজন। এরপর হযরত হালিমা রাসূলে পাক (সা)-কে নিয়ে গৃহে ফিরে এলেন।

মক্কায় মাতার নিকট সোপর্দ

এই দ্বিতীয় ঘটনার পর হযরত হালিমা সাদিয়া অনেক চিন্তা-ভাবনার পরে স্থির করলেন তাঁকে মক্কায় মাতার নিকট পৌঁছে দেয়াই উত্তম। একদিন হযরত হালিমা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সঙ্গে নিয়ে মক্কায় গিয়ে পৌঁছলেন। হালিমাকে দেখে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাতা হযরত আমিনা জিজ্ঞাসা করলেন, এত শীঘ্র আনবার কারণ কি ? হযরত হালিমা যা ঘটেছিল বিস্তারিত শোনালেন। আমিনা বললেন, নিঃসন্দেহে এ আমার পুত্রের জন্য শুভ লক্ষণ। মাতৃগর্ভে থাকাকালীন এবং জন্মের সময় যে সকল আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল তা শুনালেন। রাসূলুল্লাহ (সা) হালিমার নিকট কত দিন ছিলেন এই কথার মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক লিখেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত হালিমার নিকট ছয় বছর ছিলেন এবং এই ছয় বছরের সময়ই প্রথমবার সিনা চাক হয়েছিল। দুই ফেরেশতা আল্লাহর হুকুমে রাসূলে পাক (সা)-এর মুবারক সিনা চিরে মুবারক কলব খাহেশ নাফসানিয়াত থেকে পবিত্র করে ইসলাম ও আল্লাহ্‌র তাওহীদের নূর দ্বারা পূর্ণ করে দিয়েছিলেন।

মাতার সঙ্গে মদীনায় গমন

হযরত আমিনা তাঁর স্বামীর কবর জিয়ারত করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সঙ্গে নিয়ে মদীনায় গমন করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র বয়স তখন ছয় বছর মাত্র। আবদুল্লাহ মদীনায় তাঁর মাতুলালয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন, সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়েছিল। মা আমিনা এক মাস মদীনায় অবস্থান করে একমাস পরে মক্কায় প্রত্যাবর্তনের জন্য মক্কার দিকে যাত্রা করলেন। পথের মাঝে তাঁরা আবওয়া নামক স্থানে পৌঁছলেন এবং মা আমিনা সেখানেই ইন্তিকাল করলেন। সেখানেই তাঁকে দাফন করা হল। এই সফরে

www.nagorikpathagar.org

আমিনার সঙ্গে ছিলেন বিশ্বস্ত বাঁদী উম্মে আয়মন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে নিয়ে মক্কায় ফিরে এলেন।

দাদার নিকট সোপর্দ ও প্রতিপালন

উম্মে আয়মন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তাঁর দাদার নিকট পৌঁছে দিলেন। দাদা আবদুল মুত্তালিব তার য়াতীম পৌত্রকে বুকে তুলে নিলেন। এবং অত্যধিক আদর-যত্ন সহকারে প্রতিপালন করতে লাগলেন। সে কারণে সর্বদাই নিজের নিকটে রাখতেন এবং বিভিন্ন প্রকারে আদর-যত্নের দ্বারা মাতৃস্নেহের কথা ভুলিয়ে দিতে চেষ্টা করতেন।

আবদুল মুত্তালিবের ইন্তিকাল

দয়াল নবী রহমতে দো আলম (সা) যখন মাতৃগর্ভে ছয় মাস, তখন পিতৃহারা হলেন। ছয় বছর বয়সের সময় স্নেহময়ী জননীকে হারালেন। মাতৃস্নেহ হতে বঞ্চিত হয়ে দাদার নিকট পরম সমাদরে প্রতিপালিত হচ্ছিলেন। নয় বছর বয়সের সময় সেই স্নেহ হতেও বঞ্চিত হতে চলেছেন। আবদুল মুত্তালিব মৃত্যুর মুহূর্তে প্রিয় পুত্র আবূ তালিবকে নিকটে ডাকলেন। নিকটে এসে যে দৃশ্য দেখলেন তাতে আবূ তালিবের হৃদয় ফেটে যাবার উপক্রম হল। সম্মানিত পিতা চক্ষের পানিতে বক্ষ প্লাবিত করে জার জার হয়ে কাঁদছিলেন ? আবূ তালিব ব্যথিত হৃদয়ে অশ্রু-সজল চোখে বললেন, প্রিয় আব্বাজান! আপনি আর কাঁদবেন না, আপনি যা করতে বলেন আমি তাতেই প্রস্তুত আছি। তখন আবদুল মুত্তালিব রাসূলে পাক (সা)-কে আবূ তালিবের হাতে সমর্পণ করে বললেন ঃ আবূ তালিব! আমার কলিজার টুকরা, নয়নের মণি পিতৃ-মাতৃহীন প্রিয় মুহাম্মদকে তোমার হস্তে সমর্পণ করলাম। তুমি এ দায়িত্ব মৃত্যু পর্যন্ত পালন করবে। পিতৃ-মাতৃহীন য়াতীম মুহাম্মদ যেন দুঃখ না পায়, তার পিতামাতার কথা তাঁর মনে জেগে না ওঠে তুমি তাঁকে পিতৃস্নেহ সহকারে প্রতিপালন করবে। আবদুল মুত্তালিব য়াতীম পৌত্রের লালন পালনের দায়িত্ব আবূ তালিবের উপর অর্পণ করে এ নশ্বর সংসার ত্যাগ করে অবিনশ্বর পরলোকে পাড়ি জমালেন। আবূ তালিব পিতার দেয়া দায়িত্ব উত্তমরূপে প্রতিপালন করতে লাগলেন। আবূ তালিব য়াতীম ভাতিজাকে এত অধিক ভালবাসতেন যে, তাঁর ভালবাসার কাছে নিজের সন্তানদের ভালবাসার কোন স্থান ছিল না। শয়ন করতেন তো সাথে নিয়ে শয়ন করতেন, আহার

www.nagorikpathagar.org

করবার সময় সঙ্গে নিয়ে আহার করতেন. বাইরে গমন করবার সময় সঙ্গে করে গমন করতেন।

রাসূলে পাক (সা)-এর বাল্যকাল

বাল্যকাল হতেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র উত্তম স্বভাব, নেক চরিত্রের কথা সমাজের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করতে থাকে। তাঁর নেক চরিত্রের কথা সমাজের লোকের মুখে মুখে আলোচনা হতে থাকে। আবূ তালিব প্রিয় ভাতিজার উত্তম স্বভাব দেখে, লোকমুখে প্রশংসা শুনে আনন্দে ভরে যেতেন।

শাম দেশে সফর ঃ বহিরা রাহিবের মুলাকাত

আবূ তালিব একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ছিলেন। কুরাইশদের নিয়ম ছিল তারা বছরে অন্তত একবার হলেও ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে শামদেশে গমন করতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র বয়স যখন ১২ বছর পূর্ণ হল তখন আবূ তালিব পূর্ব অভ্যাস অনুযায়ী ব্যবসায়ের জন্য শামদেশে গমন করতে ইচ্ছা করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)ও সঙ্গে যেতে ইচ্ছা করলেন, কিন্তু আবূ তালিব সফরের কষ্টের কথা স্মরণ করে সঙ্গে নিতে অস্বীকার করলেন। কিন্তু আবূ তালিব যখন যাত্রা করলেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) কেঁদে লুটিয়ে পড়লেন। আবূ তালিব প্রিয় ভাতিজাকে অত্যধিক স্নেহ করতেন বলে বাধ্য হয়ে সঙ্গে করে নিয়ে চললেন।

আবূ তালিব বসরার এক খৃস্টান রাহিবের ইবাদতখানার কাছে অবতরণ করলেন। ঐ রাহিবের নাম ছিল বহিরা। বহিরা আল্লাহ্র রাসূলকে দেখে চিনে ফেললেন এবং বললেন ঃ ইনি হবেন আখিরী যামানার নবী-রাসূলগণের সরদার। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল ঃ আপনি কিরূপে জানলেন ? রাহিব বললেন, যখন তোমরা পাহাড় হতে অবতরণ করছিলে তখন লক্ষ্য করলাম পাহাড়ের বৃক্ষ সকল এবং পাথরসমূহ সিজদার জন্য ঝুঁকে পড়ল। তিনি আবূ তালিবকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার সঙ্গে এই বালক কে ? আবূ তালিব বললেন, আমার ভাতিজা। বহিরা বললেন ঃ আপনি তাকে স্নেহ করেন এবং দুশমনের হাত হতে তাঁর হিফাজত করতে চান ? আবূ তালিব বললেন ঃ নিশ্চয়ই আমি তাঁকে স্নেহ করি এবং দুশমনের হাত হতে তাঁকে হিফাজত করতে চাই।

আবূ তালিবের কথা শুনে বহিরা বললেন, কসম খোদার, শামের ইয়াহূদীগণ তাঁর দুশমন, তারা এঁকে হত্যা করবে। কেননা ইনি ইয়াহূদীদের দীনকে বাতিল করে দিবেন। আমি আখিরী যামানার নবীর যেসব আলামত আসমানী কিতাবে দেখেছি তৎসমুদয় এঁর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। এই রাহিব তাওরাত ও ইঞ্জীলের

www.nagorikpathagar.org

বিজ্ঞ আলিম ছিলেন। তাওরাত ও ইঞ্জীল কিতাবে আখিরী যামানার নবীর পূর্ণ বিবরণ দেয়া ছিল। এ কারণে রাহিব হুযূর (সা)-কে দেখামাত্র চিনতে পেরেছিলেন। ইনি তো সেই খাতামুন আম্বিয়া– যিনি তাওরাত ইঞ্জীল বাতিল করে ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের হুকুমত বাতিল করে ছাড়বেন।

বহিরার কথায় আবূ তালিব ভীত হয়ে রাসূল পাক (সা)-কে মক্কায় ফিরিয়ে দিলেন। আরব দেশের লোকদের বিশেষ করে কুরাইশ গোত্রের লোকেরা ইসলামের আবির্ভাবের হাজার হাজার বছর পূর্ব হতেই ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা তাদের জীবিকা নির্বাহ করে আসছিল। তারা ব্যবসা করতে এসেই মক্কায় বসতি স্থাপন করেছিল। হুযূর পাক (সা)-এর পরদাদা আবূল হাশিম আরবের বাইরেও যাতে কুরাইশ খান্দানের লোকেরা নির্বিঘ্নে ব্যবসা করতে পারে, কোন বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে না হয়, সে ব্যবস্থা তিনিই করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র চাচা আবূ তালিব একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। এ কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন জীবিকার চিন্তা করলেন তখন একমাত্র ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্বাহের উত্তম পন্থা খুঁজে পেলেন, এর চেয়ে উত্তম পন্থা আর খুঁজে পেলেন না।

রসূলে পাক (সা) তাঁর চাচা আবূ তালিবের সঙ্গে বাল্যকালেই ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে গমন করেছিলেন, যে কারণে বাল্যকালেই ব্যবসা সম্বন্ধে বহু অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর সুন্দর ব্যবহারের কথা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রত্যেক ধনী লোকই তার ব্যবসায়ের মূলধন কোন একজন বিশ্বস্ত লোকের নিকট সমর্পণ করে তার নিকট হতে লভ্যাংশ গ্রহণ করত। একারণে লোকেরা বিশ্বাস করে তাদের মূলধন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র হাতে সমর্পণ করত। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করতেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে বিশ্বস্ততা, সত্যবাদিতা অতীব প্রয়োজন। নবুয়ত লাভের পূর্বেই রাসূলে আকরাম (সা) উত্তম চরিত্রের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

আল আমীন উপাধি প্রাপ্তি

কুরাইশ গোত্রের লোকেরা মহানবী (সা)-র মধুর ব্যবহার, উত্তম চরিত্র, বিশ্বস্ততা, আমানতদারীতে মুগ্ধ হয়ে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র ঈমানদারী ও আমানতদারীর উপর আস্থা স্থাপন করে তাদের অর্থ-সম্পদ ও ব্যবসায়ের মূলধন পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট নিঃসংকোচে ও নির্দ্বিধায় আমানত রাখত। তারা আল-আমীন অর্থাৎ বিশ্বাসী, আস্-সাদিক অর্থাৎ সত্যবাদী উপাধিতে ভূষিত করে।

www.nagorikpathagar.org

ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে সফর

তৎকালীন মক্কার লোকেরা অধিকাংশই ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা তাদের জীবিকা নির্বাহ করত। একারণে তারা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ইয়ামন এবং শামদেশে গমন করত। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-ও জীবিকার অবলম্বন হিসাবে ব্যবসাকেই গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণ মূলধন না থাকার কারণে ব্যবসায়ে আশানুরূপ উন্নতি করতে পারেন নি।

হযরত খাদীজা (রা)-র ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে শামদেশে গমন

হযরত খাদীজা (রা) এক সম্ভ্রান্ত ও শরীফ খান্দানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বংশধারা পঞ্চম পুরুষের পরে রাসূলুল্লাহ (সা)-র সঙ্গে মিলিত হয়। এই সম্পর্কে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-র চাচাত ভগ্নী ছিলেন। প্রথমে তাঁর দুই বিবাহ হয়েছিল। বর্তমানে তিনি স্বামীহীনা বিধবা। তিনি সেই আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগেও জালিয়াতের কুসংস্কার মুক্ত ছিলেন। তাঁর পবিত্র আত্মা বা পুণ্য চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে সেই অন্ধকার যুগের লোকেরাও তাঁকে তাহিরা বলে সম্বোধন করত। তিনি সমগ্র মক্কার মধ্যে একজন ধনবতী মহিলা ছিলেন। যখন মক্কাবাসীদের ব্যবসায়ী কাফেলা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে বিদেশ গমনের জন্য যাত্রা করত, তখন শুধু খাদীজা (রা)-র ব্যবসায়ের সামান সমগ্র মক্কাবাসীর সামানের থেকেও অধিক হত। রাসূলুল্লাহ (সা)-র বয়স যখন পঁচিশ বছরে পদার্পণ করল তখন তাঁর সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ও আমানতদারীর প্রশংসা সমগ্র মক্কাবাসীর মুখে মুখে ধ্বনিত হত।

এ কথা হযরত খাদীজা (রা)-র নিকটও গোপন থাকল না। এজন্য তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ডেকে তার ব্যবসায়ের পণ্য নিয়ে ব্যবসায়ের জন্য সিরিয়া গমন করতে অনুরোধ করলেন। তিনি তাঁকে বললেন, "ব্যবসায়ের লভ্যাংশ সকলকে যে হারে দেয়া হয়ে থাকে আপনাকে তার দ্বিগুণ দেয়া হবে।" রাসূলুল্লাহ (সা) তা মঞ্জুর করে হযরত খাদীজা (রা)-র ব্যবসায়ের পণ্য নিয়ে সিরিয়া যাত্রা করেন। খাদীজা (রা) রাসূলে আকরাম (সা)-র খিদমতের নিমিত্ত নিজের বিশ্বস্ত ভৃত্য মায়সারাকে সঙ্গী করে দিলেন।

খৃস্টান রাহিবের সাক্ষাত

রাসূলে পাক (সা)-এর সিরিয়াগামী কাফেলা রাস্তার মাঝে এক স্থানে অবস্থান করছিল। এমতাবস্থায় এক খৃস্টান রাহিরের সাথে তাদের সাক্ষাত হয়।

www.nagorikpathagar.org

উক্ত রাহিব ইঞ্জীল কিতাবের আলিম ছিলেন। তিনি আসমানী কিতাব থেকে আখিরী যামানার নবীর যে সকল আলামত সম্পর্কে জানতেন তা রাসূলুল্লাহ (সা)-র মধ্যে পরিপূর্ণ রূপে দেখতে পেলেন। রাহিব পূর্ব হতেই মায়সারাকে চিনতেন। তাই মায়সারাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সঙ্গে ইনি কে? মায়সারা বলল, ইনি মক্কার অধিবাসী আবদুল্লাহ্‌র পুত্র মুহাম্মদ। রাহিব বললেন ঃ ইনি আখিরী যামানার নবী হবেন। আখিরী যামানার নবীর যেসব আলামত আমি আসমানী কিতাবে দেখেছি তার সবকিছুই তাঁর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। যাহোক এবারকার ব্যবসায়ে তিনি আশানুরূপ মুনাফা অর্জন করলেন এবং সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনকালে অন্য দ্রব্য খরিদ করে আনলেন। মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে সমস্ত মাল হযরত খাদীজা (রা)-র নিকট অর্পণ করলেন। সেই সকল পণ্য দ্রব্য মক্কার বাজারে বিক্রয় করে আশাতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করলেন। এতে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-র সত্যবাদিতা, আমানতদারি, জ্ঞান-গরিমা ও বিচক্ষণতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন।

হযরত খাদীজা (রা)-র সাথে শুভ পরিণয়

হযরত খাদীজা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র জ্ঞান-গরিমা, কৃতকার্যতা, বিচক্ষণতা, সত্যবাদিতা ও ঈমানদারী প্রত্যক্ষ করলেন এবং মায়সারার মুখে পথের ঘটনাবলী শুনলেন। রাস্তায় চলার সময় মেঘমালা মাথার উপরে ছায়া করে চলত, শুষ্ক বৃক্ষের নিম্নে উপবেশন করলে শুষ্ক বৃক্ষ জীবিত হয়ে যেত। বৃক্ষসমূহ মাথা ঝুঁকিয়ে সিজদা করত, পাথর সালাম করত। এ সকল ঘটনা শ্রবণ করে স্পষ্ট বুঝতে পারলেন তিনি সাধারণ মানুষ নন। তিনি একজন মহামানব হবেন। তাই তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-র সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। সিরিয়া হতে প্রত্যাবর্তনের পরে তিন মাস অতিবাহিত হয়ে গেল। এরপর হযরত খাদীজা (রা) নফিসা নাম্নী বিশ্বস্ত বাঁদীর মাধ্যমে রাসূলে আকরাম (সা)-এর নিকট বিবাহের প্রস্তাব পেশ করলেন।

এ সময়ে তিনি বিধবা ছিলেন, বয়সও হয়েছিল ৪০ বছর। রাসূলে আকরাম (সা)-এর বয়স হয়েছিল মাত্র ২৫ বছর। তবুও তিনি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান না করে সন্তুষ্টচিত্তে সম্মতি প্রদান করলেন। কয়েকদিন পরে বিবাহের দিন ধার্য হল। রাসূলুল্লাহ (সা)-র চাচা আবূ তালিব, হামজা (রা), আব্বাস (রা) এবং কুরাইশ গোত্রের অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তি দুলহীনের বাড়িতে গমন করলেন। আবূ তালিব বিবাহের খুতবা পাঠ করলেন। পাঁচশ দিরহাম দেনমোহরের বিনিময়ে অনাড়ম্বরভাবে বিবাহ সুসম্পন্ন হয়ে গেল। হযরত খাদীজা (রা) বিশ্ব মুসলিমের

www.nagorikpathagar.org

জননীর গৌরব অর্জন করলেন। বিশ্ব মুসলিমের জননী হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা) জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিপদে বিপদ তাড়িণী, দুঃখে সান্ত্বনা দায়িনী, কর্মে সাহায্যকারিণী রূপে মধুর দাম্পত্য জীবন যাপন করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও খাদীজা (রা) বেঁচে থাকা পর্যন্ত অন্য বিবাহ্ করেন নি। বিবাহের পরেও ব্যবসা পূর্বের মতই চলতে থাকে এবং হুযূরে পাক (সা) ব্যবসায়ের পণ্য নিয়ে আরবের বিভিন্ন শহরে যাতায়াত করতে থাকেন। এর ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র সত্যবাদিতা, নেক চরিত্র, আমানতদারীর প্রশংসা দিবালোকের ন্যায় বিস্তার লাভ করতে থাকে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র সন্তান-সন্ততি

হযরত খাদীজা (রা)-র গর্ভে রাসূলে পাক (সা)-এর দুই পুত্র এবং চার কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রদের মধ্যে একজনের নাম সাইয়েদিনা কাসেম (রা), অপরজনের নাম সাইয়েদিনা তাহের (রা)। কাসেমের নামানুসারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র কুনিয়াত হয়েছিল আবুল কাসেম মুহাম্মদ (সা)। কথিত আছে তাহেরের অপর নাম আবদুল্লাহ। এই দুই পুত্র বাল্যকালেই ইন্তিকাল করেন।

যুদ্ধবিগ্রহ ও হিলফুল ফজুল-এ অংশগ্রহণ

তৎকালীন আরবের লোকেরা বড় যুদ্ধপ্রিয় ছিল। কথায় কথায় তারা যুদ্ধে লিপ্ত হত। কেউ যদি যুদ্ধে মারা যেত তবে তার আত্মীয়-স্বজনেরা কিছুতেই এ হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ না করে ছাড়ত না।

এক সময়ে ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতা নিয়ে দু'টি গোত্রের লোকদের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়। এই যুদ্ধ চল্লিশ বছর ধরে চলতে থাকে। এরূপ একটা যুদ্ধের নাম ফুজ্জার। এই যুদ্ধ কুরাইশ এবং কায়েস গোত্রের মধ্যে সংঘটিত হয়। কুরাইশ গোত্রের লোকেরা পূর্ণ শক্তি সহকারে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রত্যেক গোত্রের ঝাণ্ডা পৃথক ছিল। হাশিমী গোত্রের ঝাণ্ডা আবদুল মুত্তালিবের এক পুত্র যুবায়েরের হাতে ছিল। এই ঝাণ্ডার নীচে মহানবী (সা)-ও ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছিলেন প্রত্যক্ষ দয়ার প্রতিমূর্তি, যুদ্ধবিগ্রহ আদৌ পছন্দ করতেন না। এই যুদ্ধ কুরাইশ গোত্রের লোকদের জন্য ন্যায়ের যুদ্ধ ছিল, এই জন্য মহানবী (সা) এতে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কাহারও প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করেন নাই। কারণ এই যুদ্ধ হারাম মাসে সংঘটিত হয়, দ্বিতীয় কারণ দুই জনই কাফির ছিল। মুসলমানদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা জিহাদ ফরয করেছেন শুধু এই কারণেই যে, আল্লাহর তৌহিদের আওয়াজ বুলন্দ হোক।

www.nagorikpathagar.org

আরবের লোকেরা বছরের মধ্যে চার মাস অতি পবিত্র মনে করত। সেগুলো হচ্ছে মুহররম, রজব, যিলকদ, যিলহজ্জ। তারা এই চার মাসে যুদ্ধ করা হারাম মনে করত। এই যুদ্ধ হারাম মাসে সংঘটিত হয় বলে এই যুদ্ধকে ফুজ্জার বলা হয়। অনবরত যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা ধ্বংস হয়ে যেত। কোন লোকের পক্ষে শান্তির সঙ্গে জীবন যাপন করার সৌভাগ্য হত না। অসংখ্য লোক মারা পড়ত। একারণে সমাজে পিতৃহীনের সংখ্যা বেড়ে যেত, বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি পেত। য়াতীম শিশু এবং বিধবাদের তত্ত্বাবধান করার লোক সমাজে মিলত না। এই সুযোগে জালিম লোকেরা তাদের উপর নির্যাতন চালাত; জবরদস্তিপূর্বক তাদের ধনসম্পদ আত্মসাৎ করত। সমাজে পিতৃহীন বালক-বালিকা ও অসহায় বিধবাদের জানমাল ও ইয্যতের নিরাপত্তা ছিল না।

এই অবস্থা লক্ষ্য করে দয়ার নবী রাহ্মাতুল্লিল আলামীন পেরেশান হয়ে পড়লেন। আর চিন্তা করতে লাগলেন কোন্ উপায় অবলম্বন করলে সমাজ হতে এই যুলুম-নির্যাতন-নিপীড়ন বন্ধ করে সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনা যায়। কিভাবে সমাজের লোক যুলুম-নির্যাতন হতে বেঁচে শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে জীবন যাপন করতে পারে। এ কথা সমাজের আরও কতিপয় লোকের অন্তরে জেগে উঠল—কি করে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো যায়। শেষ পর্যন্ত বনি হাশিম, বনি জহিরা বরং আরও কয়েকটি গোত্রের কিছুসংখ্যক সৎসাহসী ও হৃদয়বান যুবক একত্রিত হয়ে একটি সেবা সংঘ গঠন করলেন, যাকে বলা হয় হিলফুল ফজুল। এই সংগঠনের মধ্যে দয়ার নবী রাহ্মাতুল্লিল আলামীনও শরীক ছিলেন।

পবিত্র কা'বাগৃহ নির্মাণ

হযরত ইবরাহীম (আ) শামদেশে অবস্থানকালে একদা জিবরাঈল (আ) এসে তাঁকে বললেন, "আল্লাহ তা'আলা আপনাকে মক্কা নগরীতে পবিত্র কা'বাগৃহ নির্মাণ করতে আদেশ করেছেন।"

পুত্র ইসমাঈল (আ)-কে আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পূর্ণতা প্রদান করার উদ্দেশ্যে মক্কায় একটি ইবাদত গৃহ নির্মাণ করার ইচ্ছা ইবরাহীম (আ)-এর পূর্ব হতেই ছিল। এক্ষেত্রে জিবরাঈল (আ)-এর কথায় তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন; সেই ঘর কোথায় নির্মাণ করব?

হযরত জিবরাঈল (আ) বললেন ঃ আপনি একটি উটের পৃষ্ঠে আরোহণ করুন। এক খণ্ড মেঘ এসে আপনার উটকে পরিচালিত করবে অর্থাৎ উক্ত মেঘ

www.nagorikpathagar.org

যেদিকে গমন করবে আপনি আপনার উটকে সেদিকে পরিচালিত করবেন। অতপর মেঘ যেখানে থেমে যাবে, আপনার উটও সে স্থানে থেমে যাবে, উক্ত মেঘের ছায়া যে স্থানে পতিত হবে আপনি ঠিক সেস্থানে থামিয়ে কা'বা পুনঃনির্মাণ করবেন।

হযরত আদম (আ) দুনিয়ায় আসার পর আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করেছিলেন, হে আল্লাহ! আমি সপ্তম আকাশে বায়তুল মামুর নামে যে ইবাদত গৃহ দেখেছি যাতে ফেরেশতাগণ সালাত আদায় করে আমি দুনিয়াতে ঐরূপ একখানা ইবাদত গৃহ পেতে চাই, যাতে আমি ও আমার বংশধরগণ আপনার ইবাদত করতে পারি।

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ)-এর সেই দোয়া কবূল করে তাঁকে একখানা ইবাদতগৃহ নির্মাণ করার অনুমতি প্রদান করেন।

অতপর জিবরাঈল (আ) হযরত আদম (আ)-কে জানালেন, হে আদম! আপনি আকাশে যে একখণ্ড মেঘ দেখতে পাচ্ছেন তার পেছনে চলতে থাকুন। যে স্থানে মেঘখণ্ড স্থির হয়ে দাঁড়াবে, আপনি সেই স্থানে দেখতে পাবেন যে, সপ্তম আকাশে অবস্থিত বায়তুল মামুর মসজিদের ছায়া পতিত হয়েছে। আপনি সেই স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণ করবেন।

আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ ও জিবরাঈল (আ)-এর নির্দেশ মত হযরত আদম (আ) মেঘের পশ্চাতে চলতে লাগলেন। অবশেষে সেই মেঘ এক স্থানে স্থির হয়ে দাঁড়াল এবং ঠিক সেই স্থানে হযরত আদম (আ) বায়তুল মামুর মসজিদের ছায়া দেখতে পেলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই স্থান চিহ্নিত করে রাখলেন এবং যথা সময়ে তিনি ঐস্থানে একটি মসজিদ নির্মাণ করলেন। এটাই দুনিয়ার সর্বপ্রথম মসজিদ। তৎকালে এরও নাম ছিল বায়তুল মামুর, যেহেতু সপ্তম আসমানে যে স্থানে ফেরেশতাদের ইবাদত গৃহ বায়তুল মামুর অবস্থিত, হযরত আদম (আ)-এর নির্মিত এই মসজিদটিও সেই স্থানের নিম্নে দুনিয়ার বুকে স্থাপিত হয়েছিল।

হযরত নূহ (আ)-র সময় মহাপ্লাবন হয়, তখন এই গৃহটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। পরবর্তীকালে ঠিক সেই স্থানেই হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহর আদেশে এটা পুনর্নির্মাণ করেন, তখন হতে এর নাম হয় খানায়ে কা'বা ও বায়তুল্লাহ্ শরীফ।

হযরত ইবরাহীম (আ) জিবরাঈল (আ)-এর নির্দেশ অনুযায়ী শামদেশ হতে একটি উষ্ট্রে আরোহণ করে অনির্দিষ্টভাবে পথ চলতে লাগলেন। উর্ধ্বদিকে লক্ষ্য করে দেখলেন, এক খণ্ড মেঘ অগ্রে অগ্রে চলছে এবং তাঁর উটটি পরিচালনা ব্যতীতই উক্ত মেঘ খণ্ডকে অনুসরণ করে চলছে।

www.nagorikpathagar.org

অবশেষে উক্ত মেঘ খণ্ড একেবারে মক্কায় এসে স্থির হয়ে গেল এবং উটটিও সেই স্থানে সম্পূর্ণ থেমে গেল। অতঃপর যে স্থানে উক্ত মেঘের ছায়া পড়েছিল, সেই স্থানটি তিনি চিহ্নিত করে রাখলেন এবং সেখানেই আল্লাহর ঘর কা'বা গৃহ পুনর্নির্মাণ করতে মনস্থ করলেন। বলা বাহুল্য যে, এটা ঠিক সেই স্থানটিই ছিল, যেখানে হযরত আদম (আ) সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ) প্রার্থনা করলেন ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার ঘর প্রস্তুত করার জন্য পাথর কোথায় পাব ?

আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ করলেন লাবনান, হিরা, বুকবিল, ছাফা ও মারওয়া এই পাঁচটি পাহাড়ের পাথর দ্বারা তুমি বায়তুল্লাহ পুনঃ নির্মাণ করবে।

হযরত জিবরাঈল (আ) এবং আরও কতিপয় ফেরেশতা উক্ত পাঁচ পাহাড় হতে পাথর এনে দিলেন। তদ্দ্বারা হযরত ইবরাহীম (আ) ও তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আ) কা'বাগৃহ পুনর্নির্মাণ করলেন। এতদসম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন ঃ

وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَ اَمْنًا وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى وَ عَهِدْنَا اِلٰى اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّائِفِيْنَ وَ الْعٰكِفِيْنَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ - وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَ ارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ قَالَ وَ مَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلاً ثُمَّ اَضْطَرُّهٗ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ -

"এই কথাও স্মরণ কর আমরা এই (কা'বা) ঘরকে জনগণের জন্যে কেন্দ্র, শান্তি নিরাপত্তার স্থানরূপে নির্দিষ্ট করেছিলাম এবং লোকদের এই নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, ইবরাহীম যেখানে ইবাদতের জন্য দাঁড়ায়, সেই স্থানকে স্থায়িভাবে সালাতের জায়গারূপে গ্রহণ কর। ইবরাহীম ও ইসমাঈল-কে তাকিদ করে বলেছিলাম তাওয়াফ, ইতিকাফ ও রুকূ-সিজদাকারীদের জন্য আমার এই ঘরকে পবিত্র করে রাখ। এ কথাও স্মরণ কর যে, ইবরাহীম দোয়া করেছিল, হে আমার রব, এই শহরকে শান্তি ও নিরাপত্তার নগর বানিয়ে দাও এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ এবং আখিরাতকে মানে, তাদের সকল প্রকার ফলের রিয্ক দান কর।" উত্তরে তার রব বললেন, আর যে মানবে না, কয়েকদিনের জন্য এই জীবনের সামগ্রী তাকেও দিব। শেষ পর্যন্ত তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব এবং এটা নিকৃষ্টতম স্থান।" (সূরা বাকারা ঃ ১২৫-১২৬)

www.nagorikpathagar.org

পবিত্র কাবা গৃহ পুনর্নির্মাণ করার সময় হযরত ইসমাঈল (আ) পাথর উঠিয়ে দিতেন এবং হযরত ইবরাহীম (আ) তা গেঁথে কা'বা গৃহের প্রাচীর নির্মাণ করতেন। হযরত ইবরাহীম (আ) একখানা প্রস্তরের উপর দণ্ডায়মান হয়ে কা'বার প্রাচীর নির্মাণ করতেন। প্রাচীর যতই উচ্চ হত উক্ত পাথর খানাও ঠিক সেই পরিমাণ উচ্চ হয়ে উঠত যাতে নাগাল পেতে কোন অসুবিধা না হয়।

কা'বা গৃহ পুনর্নির্মাণ সমাপ্ত হবার পর যে স্থানে উক্ত প্রস্তর খানা রক্ষিত হয়েছে সেটাই মাকামে ইবরাহীম নামে অভিহিত। আল্লাহ তা'আলা নিজেও উক্ত স্থানকে পবিত্রতম বলে উল্লেখ করেছেন। পবিত্র কা'বা গৃহ নির্মাণ করবার সময় হযরত ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ) আল্লাহ্‌র নিকট যে প্রার্থনা করেছিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কালামে তাও উল্লেখ করেছেন ঃ

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ اِسْمَاعِيْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ –
رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَ تُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ
التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ – رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَيُزَكِّيْهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ –

"স্মরণ কর, ইবরাহীম ও ইসমাঈল যখন এই (কা'বা ঘরের) প্রাচীর নির্মাণ করছিল, তখন উভয়েই দোয়া করছিল, "হে আমাদের রব! আমাদের এই কাজ তুমি কবূল কর ; তুমি নিশ্চয়ই সব কিছু শুনতে পাও এবং সব কিছু জান। হে রব! আমাদের তোমার অনুগত বানিয়ে দাও। আমাদের বংশ হতে এমন একটি জাতির উত্থান কর যারা তোমার অনুগত হবে। তুমি আমাদের তোমার ইবাদতের পন্থা বলে দাও এবং আমাদের দোষত্রুটি ক্ষমা কর। তুমি নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী। হে রব! এদের প্রতি এদের জাতির মধ্য হতেই এমন একজন রাসূল প্রেরণ কর, যিনি তাদের তোমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনাবেন, তাদের কিতাব ও জ্ঞানের শিক্ষা দান করবেন এবং তাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ ও সুষ্ঠুরূপে গড়বেন। নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময়।" (সূরা বাকারা ঃ ১২৭-১২৯)

হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ)-এর উক্ত প্রার্থনা যে আল্লাহ তা'আলা কবুল করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। হযরত ইবরাহীম (আ) শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর শুভাগমন সম্বন্ধে প্রার্থনা করেছিলেন তা উল্লিখিত আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। তিনি প্রার্থনা করেছিলেন যে, হে

www.nagorikpathagar.org

আমাদের প্রতিপালক! আমার বংশধরগণের মধ্য হতে যারা এই নগরে বাস করবে তুমি তাদের মধ্য হতে তাদের জন্য একজন রাসূল প্রেরণ করো যিনি তাদের মধ্যে তোমার বাণী পাঠ করবেন এবং তাদের তোমার কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবেন এবং তাদের পবিত্র করবেন। এই বাক্য দ্বারা হযরত মুহাম্মদ (সা) কর্তৃক আল্লাহ্র বাণী কুরআন পাঠ এবং হিকমত শিক্ষা অর্থাৎ হাদীসের বাণী শিক্ষা দান করবেন ও তৌহিদের দ্বারা তাদের পবিত্র করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা হযরত ইসমাঈল (আ) ও তাঁর মাতাকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্যই এই স্থানে যমযম কূপের সৃষ্টি করেন এবং পবিত্র খানায়ে কা'বার জন্য স্থান নির্দিষ্ট করে দেন।

পবিত্র খানায়ে কাবা পুনর্নির্মাণে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ ছিলেন তাঁর পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ)। হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বিচিত্র জীবন-ধারা তাঁকে ও তার মাতাকে এই আরব ভূমিতে টেনে এনেছিল। সেই জন্যই পবিত্র কা'বা গৃহ, যমযম কূপ ও সাফা-মারওয়া পাহাড়ের সাথে তাঁদের পবিত্র স্মৃতি চির বিরাজিত হয়ে আছে।

পবিত্র কা'বা গৃহ পুনর্নির্মাণকালে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মনের অবস্থা কিরূপ ছিল তা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত তাঁর প্রার্থনা হতেই অনুমান করা যায়। তিনি কা'বা গৃহ নির্মাণ কার্য শেষ করে আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করেছিলেন—

> 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি অন্তর্যামী ও দীনের প্রার্থনা শ্রবণকারী। তুমি আমাদের এই দোয়া কবূল কর এবং আমাদের তোমার বাধ্যগত বান্দারূপে গ্রহণ কর, তুমি আমাকে তোমার অনুগত সন্তান দান কর, তোমার ইবাদতের পন্থা শিক্ষা দাও এবং আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা কর।
>
> হে আমার রব! তুমি দয়া করে আমার বৃদ্ধ বয়সে ইসমাঈল ও ইসহাক নামে দুটি সন্তান দান করেছ! তুমি আমাকে ও আমার বংশধরদিগকে সালাতে কায়েম রাখ। যেদিন তুমি আমার নিকট হতে হিসাব গ্রহণ করবে সেই দিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে আমার বংশধরদিগকে ক্ষমা এবং মুমিন মুসলমানদিগকে ক্ষমা কর।

কা'বা সংস্কার ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিরোধ মীমাংসা

কা'বা গৃহ দুনিয়ার সর্বপ্রথম ঘর। এটা অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্থানে অবস্থিত ছিল। একারণে বৃষ্টির সময় সমগ্র শহরের বৃষ্টির পানি হেরেম শরীফে জমা হত।

www.nagorikpathagar.org

চতুর্দিকে পানি জমা হবার কারণে কা'বার দেওয়াল নষ্ট হয়ে যায় এবং তা পুনরায় সংস্কার করবার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং কুরাইশগণ পরামর্শ করে কা'বার সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেয়। আরবের সামুদ্রিক বন্দর জিদ্দায় একখানা বিদেশী বাণিজ্যিক জাহাজ এসে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। মক্কার লোকেরা কা'বা গৃহের সংস্কারের নিমিত্ত এই জাহাজের কাঠগুলো খরিদ করে নেয়।

প্রত্যেক গোত্রই কা'বার সংস্কার করাকে অতীব পুণ্য কাজ মনে করত। আর কুরাইশ গোত্রের লোকেরা মনে করত কা'বার সঙ্গে তাদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই তারা স্থির করল কা'বার সংস্কারের কাজ এক সঙ্গে মিলে ও মিশে সম্পন্ন করবে ; কোন প্রকার বিবাদ-বিসম্বাদ হতে দেবে না। এরূপ সিদ্ধান্ত করে তারা কাজ শুরু করে দিল। কা'বার পুরান দেওয়ালে একটা কাল পাথর স্থাপন করা ছিল। বর্তমানেও তা আছে। এই পাথরকে বলা হয় হাজরে আসওয়াদ বা কাল পাথর। এই পাথরকে তারা অতিশয় পবিত্র বলে মনে করত এবং অতিশয় সম্মান প্রদর্শন করত। কথিত আছে এই পাথর হযরত আদম (আ) বেহেশত হতে সঙ্গে করে এনেছিলেন। এই পাথরকে মুসলমানরাও পবিত্র বলে জানে এবং হজ্জের সময় কা'বাগৃহের তাওয়াফের সময়ে হাজীগণ এই পাথরে চুম্বন করে এবং প্রতিটা তাওয়াফ এই হাজরে আসওয়াদ হতেই শুরু করা হয়।

যখন কা'বার দেওয়াল এই হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত উঁচু হল তখন প্রত্যেক গোত্রের লোকেরাই ইচ্ছা করল এই পাথরটা তারাই স্বস্থানে রেখে দেবে। এ ব্যাপার নিয়ে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের উপক্রম দেখা দিল। উপস্থিত জনগণের মধ্য হতে কিছু প্রবীণ জ্ঞানীলোকের পরামর্শের মাধ্যমে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্ত কা'বা গৃহে সকলেই একত্রিত হল। অনেক তর্কবিতর্কের পরে সিদ্ধান্ত হল আগামীকল্য যে সকলের আগে এখানে উপস্থিত হবে সে-ই এর মীমাংসা করে দেবে এবং সকলেই অবনত মস্তকে সেই সিদ্ধান্ত মেনে নেবে।

রাসূলুল্লাহ (সা)-র বয়স তখন ২৫ বছর। আল্লাহ পাকের কি অসীম কুদরত, পরের দিন যিনি সর্বপ্রথম কা'বা গৃহে উপস্থিত হলেন তিনি হচ্ছেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)। তাঁর উপরে কুরাইশ গোত্রের সমস্ত লোকই সন্তুষ্ট ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখে সকলেই এক বাক্যে বলে উঠল ঃ এইতো আমাদের আল-আমীন এসেছেন। তিনি যে মীমাংসা করে দিবেন আমরা সকলেই তা মেনে নিব। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) একখানা চাদর এনে তা বিছিয়ে দিয়ে পাথরখানা তার উপর রেখে দিলেন। এবং প্রত্যেক গোত্রের লোকদের চাদরের এক এক কোনা ধরে নিয়ে যেতে হুকুম দিলেন। পাথর খানা যখন স্বস্থানে নিয়ে যাওয়া হল

www.nagorikpathagar.org

তখন নিজের মুবারক হাতের দ্বারা তুলে তার জায়গায় রেখে দিলেন। এইরূপে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র মীমাংসার দ্বারা তারা একটা আসন্ন যুদ্ধের হাত হতে বেঁচে গেল। এই ঘটনার পর হতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি তাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল।

নবুওত লাভের পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র চরিত্র

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছিলেন আল্লাহ্র বান্দাদিগকে আল্লাহ্র দিকে আহবানের নিমিত্ত; তাদের বিকৃত চরিত্রকে সংশোধনের নিমিত্ত; তাদের খারাপ কাজ ও খারাপ কথা হতে ফিরিয়ে উত্তম কাজ ও উত্তম কথা শিখাবার জন্য; আল্লাহ-ভোলা বান্দাদের আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে দেয়ার জন্য; পাপ পঙ্কিল দুনিয়াকে পাপ পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত করে পুণ্য ও সত্যের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করে দেবার জন্য; তাঁকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য এটাই। একারণেই রব্বুল আলামীন মহানবী (সা)-কে সর্বগুণে গুণান্বিত করে উত্তম চরিত্র মাধুর্যে পরিপূর্ণ করে আশরাফুল আম্বিয়া রূপে প্রেরণ করেছিলেন। এতে কোনরূপ সংন্দেহের লেশমাত্র থাকতে পারে না।

রাসূলুল্লাহ (সা) বাল্যকাল হতেই সুন্দর স্বভাব ও আদর্শ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। সর্ব প্রকার অন্যায় ও পাপ-পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র ছিলেন। বাল্যকাল থেকেই বৃথা কাজ ও কথা এবং আমোদ-ফূর্তি থেকে সর্বদাই দূরে অবস্থান করতেন। যখন এমন কোন সামান্য কাজও হবার সম্ভাবনা দেখা দিত যা একজন নবীর জন্য অসম্ভব ও অশোভন ও নবুওতের শানের বিপরীত তখনই রাব্বুল আলামীন তাঁকে তা থেকে হিফাজত করতেন।

বাল্যকালের একটা ঘটনা ঃ কা'বা গৃহের দেওয়াল সংস্কারের কাজ চলছিল, বালকেরা পরিধানের বস্ত্র খুলে কাঁধের উপর রেখে পাথর বহন করে আনছিল। রাসূলুল্লাহ (সা)-ও চাচার নির্দেশ মত এইরূপ করতে ইচ্ছা করলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে গেলেন। অন্য আর একদিনকার ঘটনা ঃ বহু সংখ্যক যুবক ছেলে রাত্রিতে এক স্থানে সমবেত হয়ে কবিতা আবৃত্তি করত ও স্ফূর্তি করে রাত্র অতিবাহিত করত। রাসূলুল্লাহ (সা)-ও একদিন বাল্য সুলভ খেয়াল বশতঃ তাদের সঙ্গে যোগদান করতে ইচ্ছা করলেন, রব্বুল আলামীনের ইচ্ছায় এমন গভীর নিদ্রায় নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়লেন যে, সকাল না হওয়া পর্যন্ত আর নিদ্রা ভঙ্গ হল না।

কুরাইশ গোত্রের লোকেরা তাদের দাদা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রচারিত ধর্ম ত্যাগ করে সত্য দীন হতে বহু দূরে সরে পড়েছিল। আল্লাহকে বাদ

www.nagorikpathagar.org

দিয়ে মাটি ও পাথরের মূর্তির পূজা-অর্চনা করত। মূর্তির নামে কুরবানী করত। মহানবী (সা) এই পথভ্রষ্ট জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করেও এই অসার পূজা-অর্চনা হতে সর্বদাই দূরে অবস্থান করতেন। তাঁর সত্যবাদিতা, ঈমানদারী ও সচ্চরিত্রতা হতে দুশমনেরাও শিক্ষা গ্রহণ করত। এই সদগুণের কারণেই আল-আমীন বলে প্রসিদ্ধি লাভে সক্ষম হয়েছিলেন।

হুযূর (সা) উম্মি ছিলেন

একটি কথা সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য যে, মহানবী (সা)-র মধ্যে যে সকল জ্ঞান-গরিমা যা তাঁর মধ্যে সমাবেশ হয়েছিল তা সবই আল্লাহ্‌র দান। তিনি কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে ডিগ্রি লাভ করেন নি। তিনি যে পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলতে গেলে তাদের মধ্যে লেখাপড়ার কোন চর্চাই ছিল না।

আল্লাহ্‌র মাহবুব নির্জনতা-প্রিয় ছিলেন

নবুওত লাভের পূর্বেও তিনি নির্জনে থাকতে ভালবাসতেন। যতটা সম্ভব দুনিয়ার ঝামেলা এড়ায়ে নির্জনে থেকে কি যেন চিন্তা করতেন। নবুওত লাভের পূর্বে ২৫ বছর বয়স হতেই মক্কার থেকে তিন মাইল দূরে হেরা নামক গুহায় চলে যেতেন। গুহার নির্জন পরিবেশে রাতের নিস্তব্ধতায় দুনিয়া ও এর সৃষ্টির মাহাত্ম্য সম্পর্কে গভীর ধ্যানে মগ্ন হতেন। রাতের পর রাত আল্লাহ্‌র ইবাদতের ভিতর দিয়ে অতিবাহিত করতে লাগলেন। বাঞ্ছিত রত্ন নবুওত লাভের সময় যত আসন্ন হতে থাকল চিন্তা-সাধনার পরিমাণও ততই বৃদ্ধি পেতে লাগল। এমনকি সবসময় আল্লাহ্‌র ইবাদত ও মাখলুকের মুক্তির চিন্তায় ডুবে থাকতে লাগলেন।

নবুওত লাভের সময় আসন্ন

মহানবী (সা)-র বয়স যখন চল্লিশ বছর পূর্ণ হলো, তখন আশ্চর্য আশ্চর্য স্বপ্ন জাহির হতে লাগল। স্বপ্নের মাধ্যমেই আল্লাহ্‌র হুকুম প্রকাশ হতে লাগল। আসলে এটাই ছিল বাঞ্ছিত রত্ন নবুওতি প্রাপ্তির সূচনা। একদিন চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন আছেন, এমন সময় এক জ্যোতির্ময় পুরুষের আবির্ভাব হল। তিনি আর কেহ নন, তিনি আল্লাহ্‌র দূত জিবরাঈল (আ) আমীন যিনি সমস্ত নবীর নিকট আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছাতেন। তিনি আল্লাহ্‌র প্রেরিত পয়গাম (ওহী) মহানবী (সা)-কে শুনালেন—

৩—

www.nagorikpathagar.org

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ -

পাঠ করুন আপনার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।
যিনি জমাট রক্ত হতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন।
আপনি পাঠ করুন, আপনার রব বড়ই মহান।
যিনি কলম দ্বারা ইল্‌ম শিক্ষা দিয়েছেন।
মানুষকে ঐ জ্ঞান দান করেছেন যা সে জানত না।
(সূরা আল আলাক)

এ ছিল সর্বপ্রথম ওহী। ওহী অবতীর্ণ করে রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসূলের উপর মানব জাতির পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব অর্পণ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এই প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হয়ে ভীত হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা (রা)-কে বললেন, আমাকে কম্বলাচ্ছাদিত করে দাও এবং সকল ঘটনা হযরত খাদীজা (রা)-কে শুনালেন। হযরত খাদীজা (রা) সকল কথা শ্রবণ করে সান্ত্বনার স্বরে বললেন, আপনি ভীত হবেন না, আল্লাহ্ আপনাকে হালাক করবেন না। আপনি গরীবের উপরে দয়া করেন, মযলুমের সাহায্য করেন, অভাবগ্রস্তের অভাব মোচন করেন, বরং আল্লাহ্ শীঘ্রই আপনাকে মদদ করবেন।

ওরাকা ইবন নওফেলের নিকট গমন

হযরত খাদীজা (রা) রাসূলে পাক (সা)-কে সঙ্গে করে ওরাকা ইবনে নওফেলের নিকট গেলেন। ওরাকা হযরত খাদীজা (রা)-র চাচাত ভাই এবং সুবিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। সত্যের সন্ধানে পৌত্তলিক ধর্ম ত্যাগ করে খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করেন এবং ইবরানী ভাষা শিক্ষা করেন। তাওরাত ও ইঞ্জীল কিতাবের সুবিজ্ঞ আলিম হন। তিনি রাসূলে পাক (সা)-এর নিকট সকল কথা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করে বললেন, ইনি আল্লাহ্‌র সেই ফেরেশতা যিনি হযরত মূসা (আ)-এর নিকট অবতীর্ণ হতেন এবং সমস্ত নবীর নিকট আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছাতেন। পুনরায় বললেন, হে প্রিয় যদি আমি সেই পর্যন্ত বেঁচে থাকতাম যখন আপনার জাতি আপনার প্রতি যুলুম করবে, আপনাকে কষ্ট দিবে, আপনাকে ঘরবাড়ি হতে বিতাড়িত করে দিবে তখন আমি আপনাকে পরিপূর্ণরূপে সহায়তা করতাম।

www.nagorikpathagar.org

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ কথা শ্রবণ করে বললেন ঃ এরূপই কি হবে ? ওরাকা বললেন ঃ যে পয়গাম নিয়ে আপনি আগমন করেছেন, আপনার পূর্বে যারা এই পয়গাম নিয়ে আগমন করেছিলেন তাঁদের জাতি তাদের সঙ্গে এরূপই করেছিল। এ ঘটনার কয়েকদিন পরই ওরাকা ইন্তিকাল করলেন। জাতি আল্লাহ্র রাসূলের সঙ্গে সেই ব্যবহারই করতে লাগল যার সংবাদ ওরাকা পূর্বে দিয়েছিলেন।

সত্যের দাওয়াত শুরু

আরবের লোকেরা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসে মজবুত ছিল। তাদের দেব-দেবীর নামে তারা উন্মাদের মত প্রায়। তাদের ধর্মান্তরিত করা সহজ ছিল না, তাদের বাতিল আকিদা ও পূর্ব পুরুষদের রসম-রেওয়াজ ত্যাগ করে খোদায়ে ওয়াহিদের সম্মুখে মাথানত করতে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। এই কারণে তাদের সত্য পথে পরিচালিত করার জন্য সুকৌশলে কাজ করার প্রয়োজন ছিল।

গোপন দাওয়াত

শুরু থেকেই ইসলামের দাওয়াত ও প্রচারকার্য অতি সংগোপনে চলতে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা) যাদের অপেক্ষাকৃত সৎ ও সত্যপ্রিয় বলে মনে করতেন, যারা আল্লাহ্র রাসূলকে অধিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতেন, ভালবাসতেন; তাদের কাছে সত্যের দাওয়াত শুরু করলেন।

সর্বপ্রথম যারা সত্য গ্রহণ করেছিলেন

মেয়েদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-র জীবন সঙ্গিনী বিশ্ব মুসলিমের জননী হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা)। আজাদ পুরুষদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা)-র প্রিয় সহচর হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা)। বালকদের মধ্যে হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব (রা) যিনি রাসূলে পাক (সা)-এর নিকট প্রতিপালিত হয়েছিলেন। কৃতদাসদের মধ্যে হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা (রা) যিনি হুযূর আকরাম (সা)-র আযাদকৃত কৃতদাস এবং পালক পুত্র ছিলেন। সর্বপ্রথম যখন হযরত খাদীজা (রা)-র নিকট দাওয়াত দিলেন সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। কারণ দাওয়াত দেয়ার পূর্বেই তিনি ঈমান এনেছিলেন। বিবাহের পূর্বেই তিনি বুঝেছিলেন যে, তিনি একজন মহামানব তাই তিনি মানুষ মুহাম্মদ (সা)-কে বিবাহ না করে নবী মুহাম্মদ (সা)-কেই বিবাহ করেছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের সুফল

হযরত আবূবকর সিদ্দীক (রা) সমাজের মধ্যে একজন সম্মানিত, খ্যাতি সম্পন্ন ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল এখন আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য কি? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, রাব্বুল আলামীন আমাকে যে দায়িত্ব ও কর্তব্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন আপনার উপরেও সেই দায়িত্ব রয়েছে। তখন হতেই তিনি রাসূলে আকরাম (সা)-এর সহকর্মীরূপে সত্য প্রচারে আত্মনিয়োগ করলেন। তিনি সেই সকল লোকের নিকটে দাওয়াত দিতে লাগলেন যারা কিছু সদগুণ সম্পন্ন ছিলেন। হযরত উসমান (রা), হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রা), হযরত সা'দ বিন আবি ওক্কাস (রা), হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা), হযরত তালহা বিন আবদুল্লাহ (রা)—এই সকল হযরত হযরত আবূবকর সিদ্দীক (রা)-এর দাওয়াতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। লোকদের মধ্যে ইসলামের চর্চা হতে লাগল। ক্রমান্বয়ে কিছু কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলেন এবং মুসলমানের সংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে লাগল।

প্রাথমিক পর্যায়ে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাদের সাবেকীন আওয়ালীন বলা হয়। সাবেকীন আওয়ালীনদের মধ্যে হযরত আম্মার (রা), হযরত খাব্বাব ইবনুল আরেত (রা), হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা), হযরত উসমান ইবেন মাজউন (রা), হযরত তালহা (রা), হযরত আরকাম বিন আবিল আরকাম (রা), সাইদ ইবনে যায়েদ (রা), আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা), আবূ উবায়দা বিন জাররাহ (রা), সুহাইব রুমী (রা), জাফর ইবনে আবি তালিব (রা)—এ সকল লোকই বিখ্যাত ও বুযুর্গ ছিলেন।

প্রাথমিক পর্যায়ে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

এভাবে গোপন প্রচারের মাধ্যমে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাদের অধিকাংশই ছিলেন গরীব আবার কেউ কেউ কৃতদাসও ছিলেন। কুরাইশদের নিকট তাদের কোনই মর্যাদা ছিল না। একারণে মুসলমান হবার পরও তাদের ইসলাম গ্রহণ গোপন রাখতে হয়েছিল।

গোপন শিক্ষাকেন্দ্র

আরকাম বিন আবিল আরকাম (রা) ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে ১২তম ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর বাড়ি সাফা পর্বতের পাদদেশে একটা নিভৃত স্থানে ছিল। তাঁর

www.nagorikpathagar.org

ইসলাম গ্রহণের পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও অন্যান্য মুসলমান ঐস্থানেই অধিকাংশ সময়ে সমবেত হতেন এবং সেই স্থানেই শিক্ষা-দীক্ষার কাজ চলত। অন্য কেউ ইসলাম গ্রহণ করতে ইচ্ছা করলে সেখানে গিয়েই ইসলাম গ্রহণ করতেন। সেখানেই ওয়াজ-নসিহতের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির কাজও চলত।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র আগমনের পূর্বে দুনিয়ার অবস্থা

একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার, এমন এক সময়ে রাব্বুল আলামীন তাঁর মাহবুবকে দুনিয়ার বুকে প্রেরণ করেছিলেন যখন সমগ্র দুনিয়া গুমরাহীর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। সমগ্র দুনিয়ার মানুষ চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় জীবন যাপন করত। মানুষের জীবন যাপনের পদ্ধতি বই-পুস্তকে লিপিবদ্ধ ছিল মানুষের জীবনে তার নাম-নিশানাও মিলত না। বনি ইসরাঈলদের অবস্থা আরও করুণ ছিল, আকৃতিতে মানুষ দেখা গেলেও মানবতা বলতে কিছুই তাদের মধ্যে ছিল না। এই সময়ে আরবদের অবস্থা বড়ই বেদনাদায়ক ছিল। নরহত্যা, লুঠতরাজ, ছিনতাই তাদের নিত্য-নৈমিত্তিক পেশায় পরিণত হয়েছিল। তাদের শাসন করার মত কেউ ছিল না। কোন আইন-শৃঙ্খলার ধারও তারা ধারত না। আল্লাহকে চিনত না। ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ)-এর পরে দুই হাজার বছরেরও অধিককাল তাদের কাছে আল্লাহ্র কথা শোনাবার মত কেউ আগমন করেন নাই। তারা পাথরের নির্মিত মূর্তির পূজা করত। রাব্বুল আলামীন সমগ্র বিশ্বের সংস্কারের কাজ এই স্থান হতেই শুরু করলেন।

প্রকাশ্য দাওয়াত শুরু

নবুওতের তিনটি বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। মুসলমানদের সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি পেল আর ইসলামের আলোচনা প্রকাশ্যভাবে চলতে লাগল। তখন রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসূলকে প্রকাশ্য দাওয়াতের কাজ শুরু করার নির্দেশ দান করলেন। "আপনি আপনার নিকটতম আত্মীয়-স্বজনকে আল্লাহ্র আযাব সম্পর্কে ভয় দেখান ও সতর্ক করুন" বলে কালামে পাকের আয়াত অবতীর্ণ করলেন।

একদিন সকাল বেলায় নবী করীম (সা) সাফা পর্বতের চূড়ায় উঠে উচ্চ কণ্ঠে চিৎকার করে বললেন ঃ يا صباحا 'হায়, সকাল বেলার বিপদ!' তদানীন্তন আরবে যদি কেউ অতি প্রত্যূষে কোন দুশমনকে নিজ গোত্রের লোকদের উপর আক্রমণ করবার জন্য আসতে দেখতে পেত তখন সে পাহাড়ের উপর উঠে এরূপ চিৎকার দিতে থাকত। এ ছিল তখনকার সময়ে আরবদের সাধারণ নিয়ম।

www.nagorikpathagar.org

নবী করীম (সা)-এর এই চিৎকার শুনে লোকজন পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করল ঃ কে চিৎকার করছে ? বলা হল মুহাম্মদ (সা)। তখন কুরাইশদের সকল গোত্রের লোকেরা দৌড়িয়ে উপস্থিত হল। যে নিজে আসতে পারল সে নিজে এল আর যে নিজে আসতে পারল না সে অন্য কাউকে পাঠিয়ে দিল বৃত্তান্ত জানবার জন্য। সব লোক যখন সমবেত হল তখন রাসূলুল্লাহ (সা) কুরাইশদের এক এক গোত্রের নাম ধরে ডেকে বলতে লাগলেন ঃ হে বনু হাশিম, হে বনু আবদুল মুত্তালিব, হে বনু ফিহর, হে বনু আবদে শামস্ ইত্যাদি। আমি যদি তোমাদের বলি, এই পাহাড়ের অপর পার্শ্বে এক শত্রুবাহিনী তোমাদের উপর আক্রমণ চালাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, তা হলে তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে? সমবেত লোক সকল সমস্বরে বলে উঠল ঃ হ্যাঁ, আমরা অবশ্যই বিশ্বাস করব, কারণ আমরাতো আপনার নিকট কখনো মিথ্যা কথা শুনতে পাই নি। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) ঘোষণা করলেন ঃ আমি তোমাদের সাবধান করছি যে, সামনে এক কঠিনতম আযাব অপেক্ষা করছে। এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে অন্য কারো কিছু বলার পূর্বেই হুযূর (সা)-এর আপন চাচা আবূ লাহাব বলে উঠল ঃ تَبًّا لَكَ اَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا 'তোমার সর্বনাশ হোক!' এই কথা বলবার জন্যই কি তুমি আমাদের একত্র করেছ ? এই কথা বলে সে চলে গেল, সঙ্গে সঙ্গে অন্য লোকেরাও চলে গেল।

কুরাইশদের বিরোধিতা ও শত্রুতা

এই প্রকাশ্য দাওয়াতের পরে কুরাইশগণ যদিও অসন্তুষ্ট হয়ে চলে গিয়েছিল তবুও তখন বিরোধিতা এবং প্রকাশ্য দুশমনি করতে শুরু করেনি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মূর্তি ও মূর্তি পূজার বিরোধিতা করতে লাগলেন, আল্লাহ্র বন্দেগীর হুকুম করতে লাগলেন এবং আল্লাহ্র আযাবের কথা শোনাতে লাগলেন, তখন সেই সমস্ত লোক যারা এতদিন ভালবাসত ও ইজ্জত করত, আমিন ও সত্যবাদী বলে মান্য করত তারাই আজ শক্ত বিরোধিতা করতে শুরু করে দিল। মক্কার সমস্ত কাফির মুশরিক একযোগে শত্রুতা করা শুরু করল।

আবূ তালিবের সাহায্য

আবূ তালিব যখন দেখলেন মক্কার কাফিররা সাংঘাতিক রূপে বিরোধিতা করতে শুরু করেছে, তখন তিনিও প্রকাশ্য সাহায্যের কথা ঘোষণা করে দিলেন। ঐ সময় আবূ তালিব মক্কার একজন প্রভাবশালী নেতা ছিলেন, যার সঙ্গে মুকাবিলা করার মত শক্তি কারো ছিল না। সমস্ত বনি আবদে মান্নাফ তাঁর কথায়

www.nagorikpathagar.org

জীবন দান করতেও কুণ্ঠিত ছিল না। একারণে কাফিররা শক্ত বিরোধিতা করা সত্ত্বেও কিছুই করতে পারল না। রাসূলুল্লাহ (সা) একনিষ্ঠভাবে রিসালাতের দায়িত্ব পালন করে যেতে লাগল।

আবূ তালিবের নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ

কাফিররা যখন দেখল তাদের অসন্তুষ্টিতে কোন কাজ হল না, আর তাদের মা'বুদের বিরোধিতা করাও বন্ধ হল না আর তাঁর চাচাও সাহায্য করা হতে বিরত হল না, এতে কাফিরদের ক্রোধের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেল। শেষ পর্যন্ত তারা পরামর্শক্রমে স্থির করল এবং বলল ঃ চল আমরা আবূ তালিবের উপর চাপ সৃষ্টি করে এর একটা ব্যবস্থা করে নেই। হয় সে আমাদের মা'বুদদের বিরোধিতা করা বন্ধ করিয়ে দিক আর না হয় তাকে সাহায্য করা বন্ধ করে দিক। কুরাইশদের সম্মানিত লোকেরা আবূ তালিবের নিকট গমন করে এই দাবি জানাল। আবূ তালিব সেই সকল কুরাইশ নেতাকে মিষ্ট কথায় বুঝিয়ে বিদায় করে দিলেন।

আবূ তালিবের নিকট দ্বিতীয়বার প্রতিনিধি প্রেরণ

রাসূলে পাক (সা) ইসলামের প্রচারকার্য চালিয়ে যেতে লাগলেন এবং লোকদের মূর্তি পূজা করতে নিষেধ করতে লাগলেন। বহু সংখ্যক লোক মূর্তি পূজা ত্যাগ করে আল্লাহ্র দীন গ্রহণ করতে লাগল। ইসলামের সত্য আকিদার গভীর প্রভাব তাদের উপর পড়তে লাগল। একারণে কাফিররা ভীষণভাবে ক্রোধান্বিত হয়ে পড়ল। কুরাইশদের প্রত্যেক দলের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে সমালোচনা চলতে লাগল। একে অন্যকে আল্লাহ্র রাসূলের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সবাই মিলে আবার আবূ তালিবের কাছে উপস্থিত হল এবং বলল ঃ হে আবূ তালিব, আপনি আমাদের বয়সে প্রাচীন এবং জ্ঞানে প্রবীণ, মর্যাদাও আমাদের চেয়ে আপনার অনেক বেশি। আপনি আমাদের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। আমরা আপনার নিকট আশা করেছিলাম আপনি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে সতর্ক করে দিবেন যাতে সে আমাদের মা'বুদের সম্পর্কে এই অন্যায় আচরণ আর না করে। কিন্তু আপনি তার কিছুই করলেন না।

আল্লাহ্র কসম, আমরা আর ধৈর্য ধারণ করতে পারছি না যে, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাদের মা'বুদের নিন্দা করবে, আমাদের মাযহাবের বিরোধিতা করবে। আপনি এখনও তাকে সতর্ক করে দিন যেন সে এরূপ আর না করে;

www.nagorikpathagar.org

অন্যথায় আমরা তরবারির দ্বারা এর ফয়সালা করব। হয় আমরা থাকব আর না হয় আপনারা থাকবেন। এই পর্যন্ত বলে কাফিররা চলে গেল।

আবূ তালিবের পেরেশানী ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র দৃঢ় প্রতিজ্ঞা

আবূ তালিব কাফিরদের এই কঠোর মনোভাব লক্ষ্য করে ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি চিন্তা করলেন সমগ্র জাতি যখন দুশমনি শুরু করেছে সমগ্র জাতির দুশমনির সম্মুখে আমি একা কি করতে পারি। তিনি এ কামনাও করতেন না যে, সত্যের দাওয়াত বন্ধ হয়ে যাক। এবং কাফিররা প্রাণপ্রিয় ভাতিজাকে বে-ইজ্জত করুক বা হত্যা করে ফেলুক। আবূ তালিব এই নাজুক পরিস্থিতিতে ভ্রাতুষ্পুত্রকে সম্বোধন করে বললেন, হে আমার কলিজার টুকরা! নয়নের মণি! তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা আবার আমার নিকটে এসেছিল এবং আমার উপরে ভীষণ চাপ প্রয়োগ করছে, তুমি তোমার নিজের উপরে এবং তোমার বৃদ্ধ পিতৃব্যের উপরে দয়া কর। আমার উপরে এত কঠিন বোঝা চাপিয়ে দিও না যা বহন করা আমার সাধ্যের অতীত। আবূ তালিবের কথা হতে রাসূলুল্লাহ (সা) স্পষ্ট বুঝতে পারলেন যে, চাচা কাফিরদের চাপের সম্মুখে নিজেকে অক্ষম মনে করছেন আর আমার সাহায্য হতে মুখ ফিরিয়ে হাত গুটিয়ে নিতে ইচ্ছা করছেন।

আবূ তালিবের কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ প্রিয় চাচা! কসম সেই মহান সত্তার যার মুষ্টিতে মুহাম্মদের প্রাণ! এই সকল লোক যদি আমার দক্ষিণ হস্তে সূর্য বাম হস্তে চন্দ্র এনে রেখে দিয়ে বলে যে, তুমি আর আল্লাহ্র কথা বল না তবুও আমি তা না বলে ছাড়ব না। আল্লাহ আমাকে যে দায়িত্ব পালনের জন্য সৃষ্টি করেছেন সে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যদি আমার জীবনও হালাক হয়ে যায় তবুও আমি সে দায়িত্ব পালন না করে ছাড়ব না।

আবূ তালিবের উপর রাসূলুল্লাহ (সা)-র দৃঢ় সংকল্প ও অনমনীয় মনোভাবের প্রভাব পড়ল। তিনি বললেন ঃ হে আমার প্রাণপ্রিয় ভাতিজা! তুমি একনিষ্ঠভাবে তোমার দায়িত্ব পালন করে যাও, আমি কিছুতেই তোমাকে দুশমনের হাতে ছেড়ে দিব না। আমি সর্বশক্তি দিয়ে তোমার কাজে সহায়তা করতে থাকব।

আবূ তালিবের সাহায্য বন্ধের শেষ চেষ্টা

এই ঘটনার পরে যখন কাফিররা বুঝতে পারল আবূ তালিব কিছুতেই তার ভ্রাতুষ্পুত্রের অবমাননা সহ্য করবে না, তাকে সাহায্য করতেও ত্রুটি করবে না,

www.nagorikpathagar.org

তখন তারা নতুন পন্থা অবলম্বন করল। কাফিররা আম্মারা বিন ওলিদকে সঙ্গে নিয়ে আবূ তালিবের নিকট উপস্থিত হয়ে বলল ঃ হে আবূ তালিব, আপনি সবকিছুই অবগত আছেন আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের কার্যকলাপ সম্পর্কে। আমরা এখন আম্মারা বিন ওলিদকে আপনার নিকট নিয়ে এসেছি, সে কুরাইশদের মধ্যে সুদর্শন যুবক আপনি তাকে গ্রহণ করুন এবং আপনার ভাতিজাকে আমাদের নিকট ছেড়ে দিন। তাদের কথা শুনে আবূ তালিব বললেন ঃ সুবহানাল্লাহ এ-তো তোমাদের উত্তম বিচার, আমি তোমাদের ছেলেকে প্রতিপালন করি, আর তোমরা আমার ছেলেকে নিয়ে হত্যা কর। এ কথা বলতেও তোমাদের বিবেক বাধা দিল না। যাও তোমাদের যা ইচ্ছা হয় করতে পার।

শক্তি প্রয়োগে সত্যের দাওয়াত বন্ধ করার প্রচেষ্টা

কুরাইশদের সকল চেষ্টাই বিফলে গেল। আবূ তালিবের কাছে বারবার গিয়েও যখন কিছু করতে পারল না, শেষ পর্যন্ত যুলুম জবরদস্তি পূর্বক কার্যোদ্ধার করতে মনস্থ করল। তারা বিভিন্ন প্রকারে আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দিতে লাগল। তাঁর চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখত। নামায পড়ার সময় উটের পচা নাড়ীভূঁড়ি চাপিয়ে দিতে লাগল। অকথ্য ভাষা ব্যবহার করতে লাগল। একদা রাসূলে পাক (সা) হেরেম শরীফে নামায পড়ছিলেন এমতাবস্থায় ওকবা বিন আবি মুয়িত গলায় চাদর জড়িয়ে টান মেরে উলটে ফেলে দিল। এরূপভাবে বিভিন্ন প্রকারে নির্যাতন চালিয়ে যেতে লাগল।

আল্লাহ্র রাসূল (সা)-কে হত্যা করার চেষ্টা

অন্য একদিনকার ঘটনা। রাসূলুল্লাহ (সা) হেরেম শরীফে নামায আদায় করছিলেন। যখন সিজদায় গেলেন তখন কাফির নেতা আবূ জেহেল একখানা পাথর নিয়ে মুবারক মস্তক চূর্ণ করে দেয়ার জন্য নিকটে যাওয়া মাত্র তার হস্ত প্রকম্পিত হয়ে পাথরখানা হাত হতে পড়ে গেল। তার চেহারা বিবর্ণ ও মলিন হয়ে গেল। সে দৌড়িয়ে কাফিরদের ভিড়ের মধ্যে গিয়ে পৌছল। এবং বলতে লাগল যখন আমি পাথর নিয়ে তার কাছে গেলাম তখন দেখতে পেলাম একটি ভীষণ আকৃতি বিশিষ্ট উষ্ট্র মুখ খুলে আমার দিকে অগ্রসর হচ্ছে, মনে হচ্ছিল যেন আমাকে খেয়ে ফেলবে। এরূপ উষ্ট্র আমি আর কখনও দেখি নি। এই ঘটনা কাফিরদের সম্মুখেই ঘটেছিল। এই ঘটনার পর আবূ জেহেল প্রতিজ্ঞা করেছিল আর কখনও তাঁর সঙ্গে দুশমনি করবে না।

www.nagorikpathagar.org

জাদুকররূপে পরিচিত করার অপচেষ্টা

কুরাইশগণ দেখতে পেল বনি হাশিম, বনি আবদে মান্নাফ কোনক্রমেই রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়। এদিকে হজ্জের সময়ও আসন্ন। এই সুযোগে ইসলাম প্রচারের কাজ খুব জোরেশোরে চালিয়ে যাবে। তাঁর ধর্মকে সমগ্র আরবে বিস্তার করার চেষ্টা করবে। কাফিরকুল একত্রিত হয়ে পরামর্শ করল, মক্কার রাস্তায় রাস্তায় লোক নিযুক্ত করতে হবে। যারা হজ্জ করতে আসবে তাদের সতর্ক করতে হবে যে, আমাদের এখানে একজন জাদুকর আছে, সে জাদুর সাহায্যে পিতা ও পুত্রের মধ্যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে, ভ্রাতা-ভ্রাতার মধ্যে, এমনকি সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়। তোমরা তার থেকে দূরে থেকো, কখনও তার নিকটে যেয়ো না।

আল্লাহর অসীম কুদরতে কাফিরদের প্রচেষ্টা রাসূলুল্লাহ (সা)-র সহায়ক হলো। তারা যদি এরূপ না করত তবে হয়ত বহু লোক রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে জানতেই পারত না। সুতরাং কাফিরদের এই প্রচেষ্টার ফলে রাসূলুল্লাহ (সা) লোকদের নিকট পরিচিত হয়ে গেলেন।

লোভ দেখিয়ে ইসলাম প্রচার বন্ধের চেষ্টা

যখন কাফিরগণ দেখল তাদের সকল চেষ্টাই বিফলে গেল, ভয় দেখিয়ে নির্যাতন চালিয়েও কোন ফল হল না, তখন সম্পদের লোভ দেখিয়ে ইসলাম প্রচার বন্ধের চেষ্টা করতে স্থির করল। তারা পরামর্শ করে ওৎবা বিন রবিআকে প্রেরণ করল। সে সমাজের মধ্যে একজন সুচতুর ও বুদ্ধিমান লোক ছিল। ওৎবা রাসূলুল্লাহ (সা)-র নিকট গিয়ে বলল ঃ হে মুহাম্মদ! তুমি তোমার জাতিকে বড় বিপদে ফেলেছ, তুমি তাদের বরবাদ করে দেয়ার উপক্রম করেছ। তুমি তাদের মন-মগজ খারাপ করে দিয়েছ। তুমি তাদের মা'বুদের নিন্দা করে থাক। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বললেন ঃ আবুল ওলিদ, তুমি আমার নিকট যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছ তাই ব্যক্ত কর।

ওৎবা বলল ঃ হে মুহাম্মদ! তুমি যদি অর্থ-সম্পদের লোভে এরূপ নতুন কথা বলতে থাক তা হলে বল আমরা তোমার জন্য অর্থ-সম্পদের ব্যবস্থা করে দেব। আর যদি নেতৃত্বের আশায় এরূপ কথা বলতে থাক তা হলে বল আমরা তোমাকে আমাদের নেতা বানিয়ে নেব। আর যদি মেয়ে মানুষের মোহে এরূপ কথা বলতে থাক তাও বল, আমরা আরবের সৎগোত্র হতে সুন্দরী নারী যোগাড় করে দেব। আর যদি জিন পরীর আসর হয়ে থাকে তবে আমরা চিকিৎসা করাব।

www.nagorikpathagar.org

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওৎবার প্রলাপোক্তি শ্রবণ করে তার কথার কোন জবাব না দিয়ে কুরআনে কারীমের কয়েকটি আয়াত পাঠ করে শুনালেন। কুরআনের আয়াত শ্রবণ করে ওৎবার মনের অবস্থার পরিবর্তন হয়ে গেল। এই অবস্থায়ই কাফিরদের নিকট ফিরে গেল। কাফিররা জিজ্ঞাসা করল ঃ কিহে আবুল ওলিদ, সংবাদ কি ? তখন সে বলল ঃ তোমরা আমার নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করো না। আমি এমন পবিত্র কালাম শ্রবণ করেছি যা না কোন কবির রচনা আর না কোন গণকের কথা, আর না কোন উন্মাদের প্রলাপ। হে আমার সম্প্রদায়ের লোক সকল! তোমরা আমার কথা মেনে নেও, তোমরা তাঁর সঙ্গে দুশমনি ছেড়ে দাও, তার নিকটে যেয়ো না, তা হলে আল্লাহ্র কালাম তোমাদের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। কাফিররা ওৎবার মুখে এমন কথা শুনল যা তারা কখনও আশাও করে নাই। তখন তারা সকলেই এক বাক্যে বলল ঃ আবুল ওলিদ, মনে হচ্ছে তোমাকেও জাদু করেছে।

বশীভূত করার জন্য সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা

এই ঘটনার পর একদিন কুরাইশ নেতৃবৃন্দ কা'বা গৃহের নিকট একত্রিত হল এবং পরামর্শ করে স্থির করল—আজ মুহাম্মদকে ডেকে একটা ফয়সালা করে ফেলব। তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ডাকার জন্য লোক পাঠিয়ে দিল। হুযূর আকরাম (সা) তাদের আহবান পেয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তারা আজও সেই একই কথা বলল যা ওৎবা বলেছিল। তাদের কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ আল্লাহ্ আমাকে তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব অর্পণ করে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন, আমার কাজ শুধু তাঁর পয়গাম মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়া। যদি তোমরা তা গ্রহণ কর তবে তোমরা দুনিয়া এবং আখিরাতে কল্যাণ প্রাপ্ত হবে। আর যদি গ্রহণ না কর তবে তোমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, আর আমি ধৈর্য ধারণ করব।

আল্লাহ্ তা'আলা আমার এবং তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। আমি তোমাদের নিকট অর্থ-সম্পদের কামনাও করি না, ইজ্জতের আশাও রাখি না, তোমাদের বাদশাহীর প্রয়োজনও আমার নেই। আমি আমার উপরে অর্পিত রিসালাতের ফরজিয়াত পালন করে যাচ্ছি মাত্র।

কাফিরদের জটিল প্রশ্নের মাধ্যমে আল্লাহ্র রাসূল (সা)-কে পরীক্ষা

কাফিররা যখন হাজারো প্রকারের চেষ্টা ও তদবীর করেও এঁটে উঠতে পারল না বরং হিতে হল বিপরীত। তখন কাফিররা একত্রিত হয়ে জটিল প্রশ্ন করতে

www.nagorikpathagar.org

লাগল। রাসূলে আকরাম (সা) তাদের প্রশ্ন শুনতে লাগলেন এবং উত্তর দিতে লাগলেন। একে একে তাদের সমস্ত প্রশ্ন হয়ে গেল। তখন মদীনার ইয়াহূদী পণ্ডিতগণের নিকট হতে প্রশ্ন সংগ্রহের জন্য লোক প্রেরণ করল, তারা আসহাবে কাহাফ ও জুলকারনায়েনের ঘটনা সম্পর্কে প্রশ্ন করতে বলে দিল। তখন কাফিররা খুশী হয়ে বিরাট আকারে সাধারণ সভার আয়োজন করে সভার মধ্যে ঐ সকল প্রশ্ন করতে লাগল যা তারা মদীনা হতে জেনে এসেছিল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা সূরায়ে কাহাফ অবতীর্ণ করে কাফিরদের সকল প্রশ্নের উত্তর তাঁর রাসূলকে অবগত করিয়ে দিলেন।

চন্দ্র দ্বিখণ্ডিতকরণ

কাফিরদের সকল চেষ্টাই যখন বিফলে গেল তখন তারা এক নতুন বুদ্ধি আঁটল। তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলল ঃ হে মুহাম্মদ! তুমি নিজেকে আল্লাহ্‌র সত্য রাসূল বলে দাবি করছ; এ যদি হয় তবে তুমি আমাদের এমন আশ্চর্য কোন জিনিস দেখাও যার কারণে আমরা তোমাকে রাসূল বলে স্বীকার করতে বাধ্য হই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তোমরা কি দেখতে চাও তাই বল। কাফিররা বলল, আমরা দেখতে চাই তুমি চন্দ্রকে দুই টুকরা করে দাও। যদি পার তবে বুঝব তুমি আল্লাহ্‌র সত্য রাসূল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) শাহাদত অঙ্গুলি দ্বারা চন্দ্রের দিকে ইশারা করলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্র দুই টুকরা হয়ে গেল। এই অলৌকিক ঘটনা যাকে বলা হয় মুজিযায়ে নবুওত। এই মুজিযা দেখেও কাফিরকুলের মনের কালিমা দূরীভূত হলো না, তাদের জ্ঞানচক্ষু খুলল না। বরং তারা বলল, এত বড় জাদুকর যে আকাশেও জাদু লাগাতে পারে। এই কথা বলে সকলে চলে গেল।

কাফিরদের রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র সঙ্গ বর্জন

কাফিররা যখন দেখল তাদের সকল প্রকার চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল, বিভিন্ন প্রকার জটিল প্রশ্ন করেও কোন সুফল হল না, তখন তারা পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত করল কোন লোকই তার সঙ্গে বাক্যালাপ করবে না। তর্ক-বিতর্ক ও বাহাস মুবাহাসা করবে না, তার কুরআন পাঠ শুনবে না। তার সঙ্গে বাহাস করতে গেলে তার সঙ্গে পারা যাবে না। কুরআন পাঠ শ্রবণ করলে হয়ত তাকে নবী বলে মেনে নিতে হবে। এখন আমাদের শুধু একটিই মাত্র পথ তা হলো তাঁকে এবং তাঁর কুরআনকে এড়িয়ে চলতে থাকা।

www.nagorikpathagar.org

সাহাবায়ে কিরামদের উপর কঠোর নির্যাতন

কুরাইশগণ যখন দেখল মুসলমানের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে, কিন্তু তাদের কোন প্রকারেই ঠেকান যাচ্ছে না তখন কাফিররা যুলুম ও নির্যাতন শুরু করে দিল। গরীব ও বিত্তহীন মুসলমানদের উপরে কঠোর নির্যাতন চালাতে লাগল। দিপ্রহরের রোদ্রের সময় আরবের বালি এবং পাথর আগুনের মত উত্তপ্ত হয়ে উঠত। ঐ সময় গরীব এবং যাদের সাহায্য করবার মত কেউ ছিল না ঐ সকল মুসলমানকে উত্তপ্ত বালুকার উপরে চিৎ করে শোয়ায়ে বুকের উপর ভারি পাথর চাপিয়ে দিতে লাগল। শরীরের উপরে গরম বালুকা বিছিয়ে দিতে লাগল। লোহা আগুনে উত্তপ্ত করে শরীরের উপর দাগ দিতে লাগল, পানির মধ্যে ডুবিয়ে রাখত, আগুনের কয়লার উপরে চিৎ করে শুইয়ে বুকে পাথর চাপিয়ে দিত। এত অমানুষিক নির্যাতন করেও একটি মুসলমানকেও সত্য ত্যাগ করাতে পারল না।

নির্যাতিত মুসলমান

এইরূপ নির্যাতন সমস্ত গরীব এবং সহায়-সম্বলহীন মুসলমানদের উপরে চালাতে লাগল। কুরাইশগণ যাদের উপরে অধিক নির্যাতন চালিয়েছিল নিম্নে তাদের নামের তালিকা প্রদান করা হলো।

হযরত বিলাল (রা)—ইনি সেই বিলাল যিনি ইসলামের সর্বপ্রথম মুয়ায্যিনের গৌরব লাভ করেছিলেন। ইনি কাফির উমাইয়া ইবনে খলফের কৃতদাস ছিলেন। কাফির তাঁকে দ্বিপ্রহরের রোদ্রের সময় প্রজ্বলিত বালুকার উপর চিৎভাবে শুইয়ে বুকের উপর ভারী পাথর চাপিয়ে দিত, যাতে কোনরূপ নড়াচড়া করতে না পারে। কাফির এতেও খুশী হতে পারল না। গলায় রশি লাগিয়ে মক্কার অলিতে গলিতে টেনে নিয়ে বেড়াত। এমতাবস্থায়ও হযরত বিলাল (রা) মুখে উচ্চারণ করতেন, 'আহাদুন, আহাদুন' অর্থাৎ আল্লাহ্ এক, আল্লাহ্ এক। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁকে খরিদ করে আযাদ করে দেন।

হযরত সুহায়েব রুমি (রা)—ইনিও কাফিরের কৃতদাস ছিলেন। তাঁকেও তাঁর কাফির মনিব বেদম মারতে থাকত। মার খেতে খেতে যখন সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলতেন তখন ঐ অবস্থায় ফেলে রেখে চলে যেত।

হযরত খাব্বাব ইবনুল আরেত (রা)—ইনি একজন কাফির মেয়েলোকের কৃতদাস ছিলেন। এই কাফির হযরত খাব্বাবের উপরে বিভিন্ন প্রকারের অত্যাচার করত। আগুনযুক্ত কয়লার উপরে শুইয়ে বুকে ভারি পাথর চাপা দিত। শরীরের রক্ত বের হয়ে চর্বি গলে আগুন নিভে যেত, শরীরের ভিতরে কয়লা ঢুকে যেত।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ্‌র পথে প্রথম শহীদ

হযরত ইয়াসির (রা), হযরত আম্মার (রা), হযরত সুমাইয়া (রা)—পিতা-পুত্র ও মাতা, তাঁরা মক্কার গরীব মুসলমান ছিলেন। তাঁরা তিনজনই এক সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণ করার অপরাধে কাফিররা অমানুষিক নির্যাতন করত।

একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কার একটি পার্বত্য এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা)। তাঁরা দেখতে পেলেন ইয়াসির পরিবারকে হাত-পা বেঁধে গরম পাথরের উপর চিৎ করে শুইয়ে রাখা হয়েছে। বুকের উপর বড় বড় পাথর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। কিছু সময় পরে পরে তাঁদের শরীর আগুন দিয়ে পোড়ানো হচ্ছে আর সেই সঙ্গে শরীরে খঞ্জর চালান হচ্ছে ও বল্লম দিয়ে বিদ্ধ করা হচ্ছে। তবুও তাদের মুখ দিয়ে কোন শব্দ বের হচ্ছে না।

রাসূলুল্লাহ (সা) সেখানে পৌঁছার সাথে সাথেই কাফিররা দেখল সুমাইয়ার ঠোঁট দু'টি নড়ছে। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! দিন কি এভাবেই চলতে থাকবে ?

প্রিয় নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ হে ইয়াসির পরিবার! তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। আল্লাহ্‌র বেহেশত তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র কথা শুনে সুমাইয়া বলে উঠলেন ঃ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই আর আপনি আল্লাহ্‌র সত্য রাসূল, আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য।"

এ সময় আম্মারও চিৎকার করে বললেন ঃ ওহে আল্লাহ্‌র দুশমনরা! শুনে রেখো, এবার তোমাদের যত ইচ্ছা আমাদের শাস্তি দিতে পার, আমাদের কোন পরোয়া নেই। আল্লাহ্‌র বেহেশত আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আর তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

হযরত আম্মার (রা)-এর কথাগুলো যেন কাফিরদের অন্তরে আগুন জ্বালিয়ে দিল। তারা একযোগে তিনজনের উপরই ঝাঁপিয়ে পড়ল।

মক্কায় মুসলমানদের উপর দিনের পর দিন এরূপ যুলুম চলতে লাগল। একদা তিনজন কাফির আবূ জেহেল, ওতবা, শায়বা শৃঙ্খলিত ইয়াসির পরিবারের নিকটে গেল। দিনের পর দিন অত্যাচারে জর্জরিত হবার পরও তাদের মুখে আল্লাহ্‌র নাম শুনে আবূ জেহেলের মাথায় যেন খুন চেপে গেল। সে ক্রোধান্ধ হয়ে তাঁদের চাবুক মারতে লাগল। তাদের শরীরে জ্বলন্ত আগুন লাগাতে শুরু

www.nagorikpathagar.org

করল। চিৎ করে শুইয়ে পানির মশকের মুখ খুলে দিল মুখের ও নাকের উপর। পর পর পানির চৌবাচ্চার মধ্যে তাঁদের নাক মুখ ডুবিয়ে দিয়ে চেপে ধরল। তাদের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। কিছু সময় পর তাদের পানি হতে তুলে নিয়ে শ্বাস চলার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

কাফিররা মনে করেছিল বাধ্য হয়ে আমাদের দেব-দেবীর প্রশংসা করবে, মুহাম্মদ ও তাঁর আল্লাহ্‌কে ভুলে যাবে। কিন্তু তা হলো না। হুঁশ হবার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্‌র নাম এবং মুহাম্মদ (সা)-এর প্রশংসা শোনা যেতে লাগল। এ নাম যেন তাদের মুখের সঙ্গে বাঁধা হয়ে গিয়েছে।

আবূ জেহেল ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে গেল। সে উন্মাদের মত চিৎকার করে বলল, যদি তোমরা মুহাম্মদ ও তার আল্লাহকে ত্যাগ না কর তা হলে তোমাদের নির্মমভাবে হত্যা করে ফেলা হবে।

আবূ জেহেলের কথা শুনে সুমাইয়া ধীর-স্থির কণ্ঠে বললেন ঃ ধ্বংস হোক তোর দেব-দেবীরা। মৃত্যু আমার নিকট প্রিয় জীবনের থেকেও। তা হলে অন্তত তোর কর্কশ বাক্য শুনতে হবে না, কুৎসিত চেহারা আর দেখতে হবে না।

আবূ জেহেল একথা শুনে ক্রোধে অধীর হয়ে উন্মাদের মত সুমাইয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সুমাইয়া মাটিতে পড়ে গিয়েও বলতে লাগলেন, ধ্বংস হয়ে যা তুই আর ধ্বংস হোক তোর মা'বুদরা।

শয়তান আবূ জেহেল আর সহ্য করতে পারল না। সে সুমাইয়ার প্রস্রাবের দ্বার দিয়ে বর্শা ঢুকিয়ে মাথা দিয়ে বের করে দিল। হযরত সুমাইয়া রাদিআল্লাহু আনহা ইসলামের পথে সর্বপ্রথম শাহাদাতের গৌরব অর্জন করলেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

হযরত ইয়াসির (রা) চিৎকার করে বললেন ঃ ওরে আল্লাহ্‌র দুশমন। তুই তাকে মেরে ফেললি। আল্লাহ্‌র লানত তোর উপরে, তোর মা'বুদদের উপরে। আবূ জেহেল আর সহ্য করতে পারলো না। সে সজোরে লাথি মারলো ইয়াসিরের পেটে। শুধু একটা অস্ফুট শব্দ শোনা গেল। তারপর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন হযরত ইয়াসির (রা)। ইসলামের পথে, সত্যের পথে দ্বিতীয় শাহাদত বরণ করলেন হযরত ইয়াসির রাদিআল্লাহু আনহু।

হযরত জুয়াইরাহ (রা) জনৈক কাফিরের কৃতদাসী ছিলেন। তাঁর উপরে কাফির মনিব তাঁকে এমন নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করত, যার কারণে তার দুই চক্ষু অন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

মোট কথা কাফিররা সমস্ত গরীব ও নিঃসহায় মুসলমানের উপরে এইরূপ নিষ্ঠুর নির্যাতন চালাত।

www.nagorikpathagar.org

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা), হযরত বিলাল (রা), হযরত লবিনা (রা), মাহাদিরাহ (রা), উম্মে আবিস (রা) আনহা প্রমুখ মুসলমান গোলাম ও বাঁদি তাঁদের কাফির মনিবের নিকট হতে খরিদ করে আযাদ করে দেন।

এ-তো গরীব এবং কৃতদাস শ্রেণীর মুসলমানদের অবস্থা ছিল। এ ছাড়াও যারা বিত্তবান এবং মর্যাদাশালী ছিলেন তাঁরাও তাঁদের নিজ গোত্রের লোকদের হাতে কঠোর নির্যাতন ভোগ করতেন। হযরত উসমান (রা)-কে তাঁর চাচা হাকাম হাতে পায়ে রশি দিয়ে বেঁধে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করতে থাকত।

হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা) এবং তাঁর স্ত্রী ফাতিমা (রা) যিনি হযরত উমর (রা)-এর ভগ্নী ছিলেন, হযরত উমর (রা) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে স্বামী-স্ত্রী উভয়কে এক সঙ্গে মেরে রক্তে রঞ্জিত করে দিয়েছিলেন। হযরত যুবায়ের (রা)-কে তার চাচা চাটাই দিয়ে জড়িয়ে বেঁধে নাকে ধূম্র দিতে থাকত।

নির্যাতিত মুসলমানদের আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর সান্ত্বনা দান

কাফিরের কঠোর নির্যাতনের মুখে নির্যাতিত মুসলমানদের কিছুই করার ছিল না। অতিষ্ঠ হয়ে দয়ার নবী রাহমাতুল্লিল আলামীনের নিকটে গিয়ে তাঁদের দুঃখ-কষ্টের কথা শুনালেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের জন্য দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ আমাদের এই যুলুম হতে মুক্তি দেন। রাসূলে পাক (সা) এই সকল নির্যাতিত মুসলমানকে বললেন ঃ তোমরা আল্লাহ্র রহমতের আশা রেখে ধৈর্য ধারণ কর শীঘ্রই তোমাদের জন্য আল্লাহ্র সাহায্য আসবে, আর তোমরাই জয়যুক্ত হবে আর যালিমরা ধ্বংস হবে। তিনি আরও বললেন ঃ স্মরণ কর তোমাদের পূর্বেকার নবী ও রাসূলগণের এবং তাঁদের সঙ্গী-সাথীদের কথা। তাঁদের উপরে যুলুম করা হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে কাউকে করাতে চিরে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছিল, কাউকে জীবন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, কারো শরীরের উপরে লোহার চিরুনি চালিয়ে শরীরের চামড়া শিরা-উপশিরা গোশ্‌ত পর্যন্ত ছিঁড়ে ফেলা হয়েছিল। তারা সত্যের জন্য কত যুলুম-নির্যাতন সহ্য করেছিলেন। তোমাদের উপরে তো এখনও সে অবস্থা আসে নাই। তোমরা ধৈর্য ধারণ কর সত্যের সূর্য অধিক দিন লুকিয়ে থাকবে না, শীঘ্রই উদিত হবে এবং আল্লাহ্ তোমাদেরই বিজয়ী করবেন।

নবুওতের পঞ্চম বছর হাবশায় প্রথম হিজরত

মুসলমানেরা মক্কায় থেকে অশেষ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেও স্বাধীনভাবে আল্লাহ্র হুকুম পালন করার সুযোগ পেতেন না। এই সময় পর্যন্ত কা'বা গৃহে

www.nagorikpathagar.org

কুরআন পাঠ করার কোন উপায় ছিল না। স্বয়ং রাসূলে পাক (সা) বিভিন্ন প্রকারের নির্যাতন সহ্য করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সাহাবীদের কষ্ট আর সহ্য করতে পারছিলেন না। এই জন্য তাদের মক্কা ছেড়ে হাবশায় হিজরত করার আদেশ দিলেন। ঐ সময় হাবশায় আশহামা নামক একজন নেক বখত খৃস্টান বাদশা বাদশাহী করতেন। সেই সময় আরবের লোকেরা হাবশার বাদশাকে নাজ্জাশী বলত।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুওতের পঞ্চম বছরের রজব মাসে ৬ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলা মক্কা ছেড়ে হাবশায় হিজরত করলেন। এর মধ্যে হযরত উসমান (রা) ও তাঁর সহধর্মিণী হযরত রুকাইয়া (রা) ছিলেন। এই হিজরতের একটা বৈশিষ্ট্য এটাও ছিল, যদি কেউ ইসলাম নিয়ে কোথাও গমন করে তবে ইসলাম আপনার থেকেই বিস্তার লাভ করে।

কুরাইশদের বাদশা নাজ্জাশীর নিকট গমন

বাদশা নাজ্জাশী এই মুহাজিরদের খুবই সম্মান করলেন এবং তাদের থাকার উত্তম ব্যবস্থা করে দিলেন। তাঁরা সেখানে আরামের সঙ্গে অবস্থান করতে লাগল। যখন কুরাইশগণ জানতে পারল, তখন তারা আমর ইবনে আস এবং আবদুল্লাহ বিন রবিআকে নাজ্জাশীর নিকট প্রেরণ করল। কাফিররা বাদশা নাজ্জাশীর নিকট গিয়ে বলল, বাদশা নামদার, এই সমস্ত লোক কলহপ্রিয়, তারা নিজেদের দেশে ফাসাদ করে আপনার দেশে পালিয়ে এসেছে। সুতরাং আপনি এদের আপনার দেশে থাকতে দিবেন না। আপনি এদের আমাদের নিকট ফিরিয়ে দিন। বাদশা নাজ্জাশী একজন বিচক্ষণ বুদ্ধিমান ও ন্যায়পরায়ণ লোক ছিলেন। নাজ্জাশী তাদের কথার জবাবে বললেন ঃ এই কাজ ঐ সময় পর্যন্ত সম্ভব নয় যত সময় পর্যন্ত তাদের উদ্দেশ্য অবগত হতে না পারি।

বাদশা নাজ্জাশীর দরবারে হযরত জা'ফর (রা)-এর ভাষণ

বাদশা নাজ্জাশী মুসলমানদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন তাদের মাতৃভূমি ত্যাগ করার কারণ সম্পর্কে। তখন হযরত আলী (রা)-র ভ্রাতা হযরত জা'ফর ইবনে আবি তালিব (রা) বাদশাহর নিকট বলতে লাগলেন ঃ জনাব বাদশা নামদার, আমরা আল্লাহকে ভুলে পাথরের মূর্তির পূজা করতাম, ভ্রাতা ভ্রাতার উপরে যুলুম করতাম, প্রতিবেশীর উপরে নির্যাতন চালাতাম, মিথ্যা কথা বলতাম, ব্যভিচার করতাম, পশু অপহরণ করতাম, সবলেরা দুর্বলের উপর নিপীড়ন চালাতাম।

www.nagorikpathagar.org

এই অবস্থায় আল্লাহ আমাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করলেন। তাঁর সত্যবাদিতা, সচ্চরিত্রতা, ঈমানদারী ও আমানতদারী সম্পর্কে আমরা পূর্ব হতেই অবগত ছিলাম। তিনি আমাদের সত্য দীনের দিকে আহবান করলেন এবং বললেন ঃ তোমরা মূর্তির পূজা ছেড়ে দাও, সত্য কথা বল, যুলুম করো না, ব্যভিচার করো না, সতী-সাধ্বী মেয়ের উপর যিনার অপবাদ দিও না, নামায পড়, রোযা রাখ, মযলুমের সাহায্য কর, দান-খয়রাত করতে থাক। আমরা এই ব্যক্তিকে আল্লাহর সত্য রাসূল বলে মেনে নিলাম এবং তাঁর কথা অনুযায়ী কাজ করতে লাগলাম। এই কারণে আমাদের জাতি আমাদের প্রাণের দুশমন হয়ে গেল এবং আমাদের উপর শক্তি প্রয়োগ করে আবার আমাদের গুমরাহীর দিকে ফিরিয়ে নিবার জন্য প্রচেষ্টা করতে লাগল।

নাজ্জাশী বললেন ঃ তোমাদের পয়গম্বরের উপর যে কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তার থেকে কিছু পাঠ কর। হযরত জা'ফর (রা) সূরা মরিয়ম থেকে কয়েকটা আয়াত পাঠ করলেন। আল্লাহর কালাম বাদশা নাজ্জাশীর উপর এমন প্রভাব বিস্তার করল—বাদশা কেঁদে ফেললেন। পরে বললেন ঃ আল্লাহর কসম এই কালাম আর ইঞ্জীল একই বাতির দুটি শিখা। এই কথা বলে কুরাইশদের লোকদের বলে দিলেন, তোমরা চলে যাও, আমি এসব মজলুমকে ফিরিয়ে দেব না।

মুহাজিরদের মক্কায় প্রত্যাবর্তন

হিজরতকারী মুসলমানেরা হাবশায় আরামের সঙ্গে অবস্থান করছিলেন। ইতিমধ্যে একটি গুজব রটে গেল, মক্কার সমস্ত লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে। এই কথা শুনে মুহাজিরগণ আবার মক্কায় ফিরে চললেন। কিন্তু শহরের নিকটবর্তী হয়ে জানতে পারলেন যে, সংবাদটা সত্য নয় সম্পূর্ণ মিথ্যা। এস্থান হতেই কিছুসংখ্যক ফিরে গেলেন আর কিছুসংখ্যক মক্কায় প্রবেশ করলেন।

হাবশায় দ্বিতীয়বার হিজরত

যারা মক্কায় ফিরে এসেছিলেন, মক্কার লোকেরা তাদের উপরে আরও অধিক পরিমাণে নির্যাতন শুরু করে দিল। এত অধিক পরিমাণে নির্যাতন করতে লাগল যে, পুনরায় হিজরত করতে বাধ্য করে ছাড়ল। কিন্তু এবার হিজরত এত সহজ ছিল না। তবুও হিজরত না করে উপায়ও ছিল না। যেকোন প্রকারে হোক হিজরত করতেই হবে। এবার বহু সংখ্যক সাহাবী যাদের সংখ্যা অন্তত একশ হবে মক্কা হতে বের হয়ে পড়লেন এবং হাবশায় স্থায়িভাবে বাস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। যখন রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় হিজরত করলেন তখন কিছুসংখ্যক

www.nagorikpathagar.org

সাহাবী হাবশা হতে মদীনায় চলে গেলেন। আর যারা হাবশায় থেকে গেলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সপ্তম হিজরীতে তাদের মদীনায় ডেকে নিলেন।

হযরত হামজা (রা)-র ইসলাম গ্রহণ

হযরত হামজা (রা) নবুওতের ষষ্ঠ বছরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র চাচা এবং দুধভাই ছিলেন। কারণ দুজনই সোবিয়ার দুগ্ধ পান করেছিলেন। আম্মারাহ তার কুনিয়াত ছিল। ষষ্ঠ নবুবীর এক ঘটনা। একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাফা পাহাড়ে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। মক্কার সমস্ত কাফিরের মধ্যে আবূ জেহেল নিতান্ত জাহেল, একগুঁয়ে, বদমেজাজী ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখামাত্র অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে লাগল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার কথার কোন জবাব দিলেন না, শেষ পর্যন্ত আবূ জেহেল নিজেই চুপ করে চলে গেল। এই ঘটনার সময় হযরত হামজা (রা)-র এক বাঁদী ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। সে ঘরে পৌঁছে সমস্ত ঘটনা হযরত হামজা (রা)-কে শুনালেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র ধৈর্য এবং আবূ জেহেলের ঔদ্ধত্যের কথা শুনেই হযরত হামজা (রা)-র রক্তে যোশ মেরে উঠল। আল্লাহ্র নামে কসম খেয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, যত সময় আমার নিরপরাধ ভাতিজার অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ না করব তত সময় পর্যন্ত আমার জন্য খানাপিনা গ্রহণ করা হারাম। হযরত হামজা (রা) মক্কার শ্রেষ্ঠ বীর এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন।

তিনি প্রথমেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট আগমন করলেন এবং বললেন ঃ হে আমার প্রিয় ভাতিজা! আমি তোমার চাচা, তোমার নিকট এসেছি। তোমার দুশমনদের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে। বল আবূ জেহেল তোমাকে কি বলেছে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ এই রকম একটা লোকের জন্য আপনি কি করতে পারেন? যার না আছে মাতা না আছে পিতা না আপনজন আর না তার ব্যথায় ব্যথিত হবার কেউ। আপনি আমার চাচা তাতে কি হবে ? আপনি যদি এই মুশরেকী অবস্থায় কাফিরের রক্ত দিয়ে আরবের মাটি লালে লাল করে দেন তাতে কি লাভ হবে ? যদি আপনি আল্লাহ্র উপর ঈমান না আনেন। আপনি যদি মুসলমান হয়ে দীন ইসলামের সাহায্যকারী হতেন তবে তো এই সাহায্য আপনার জন্য সওয়াব এবং নাজাতের কারণ হতো। আর তা যদি না হয় তবে আমি আমার আল্লাহ্র সাহায্য ব্যতীত কারো সাহায্য চাই না। আমি যাঁর কাজ করি তিনিই আমার সাহায্যকারী।

www.nagorikpathagar.org

হযরত হামজা (রা) প্রিয় ভাতিজার এরূপ জবরদস্ত ধৈর্যশীলতা দেখে এবং হৃদয়বিদারক বাক্য শ্রবণ করে তখনই জবান হতে উচ্চারণ করলেন ঃ আশহাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্। তিনি ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করলেন। তাওহীদের আবেহায়াত পান করে জীবন ধন্য করলেন।

হযরত উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত উমর (রা) যাঁর নামে এখনও সমগ্র বিশ্বের মুসলমান গর্ববোধ করে থাকে, সেই হযরত উমর (রা) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মুসলমানদের ঘোর দুশমন ছিলেন এবং মুসলমানদের উৎপীড়নে অগ্রগামী ছিলেন। এতদিনে ইসলামের শক্তি পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা)-র চাচা মহাবীর হামজা (রা) ইসলাম গ্রহণ করেছেন। ইসলামের এই শক্তি বৃদ্ধি কুরাইশ নেতাগণকে ক্ষিপ্ত করে তুলল। তারা সভা আহবান করল, এর একটা চূড়ান্ত ফয়সালা করার জন্য তারা উঠেপড়ে লাগল। তারা বুঝতে পারল, মুহাম্মদ (সা)-কে দুনিয়া হতে বিদায় করতে না পারলে ইসলামকে প্রতিরোধ করা যাবে না। সুতরাং তারা একটি জরুরী সভা আহবান করল। সভায় উচ্চকণ্ঠে আবূ জেহেল বলতে লাগল, হে কুরাইশ বীরগণ! আর কতদিন তোমরা নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থাকবে? আমাদের পিতৃপিতামহের ধর্ম, মান সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি সবই বিপন্ন হতে চলেছে। একটি নগণ্য লোক এত বড় বিপ্লব সৃষ্টি করল অথচ তোমরা তার কিছুই করতে পারলে না। এখন আমরা সবাই মিলে তার পদসেবা করব নাকি?

আবূ জেহেলের বক্তৃতায় চরম উত্তেজনাকর শক্তি নিহিত ছিল। সে আরবের এক সুদক্ষ বক্তা হিসাবেও বিখ্যাত ছিল। তার বক্তৃতায় কুরাইশদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হল। কুরাইশ বীরগণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। তাদের ধমনীতে উষ্ণ রক্ত উদ্দাম গতিতে প্রবাহিত হতে লাগল। এমনি উত্তেজনার সৃষ্টি করে আবূ জেহেল আসল কথাটি পাড়ল; কুরাইশ বীরগণ! তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি মুহাম্মদের মস্তক এনে আমার সম্মুখে রাখতে পারবে, আমি তাকে এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা এবং একশ উষ্ট্র পুরস্কার দিব! কে প্রস্তুত আছ বল! সভায় দুর্ধর্ষ যুবক কুরাইশ নেতা উমরও উপস্থিত ছিলেন। তিনি উলঙ্গ তরবারি হস্তে বীর দর্পে দণ্ডায়মান হয়ে বললেন, সর্দার! আমি প্রস্তুত। মুহাম্মদের শির দ্বিখণ্ডিত করে আপনার সম্মুখে উপস্থিত করব। এই আমি এখনি চললাম, প্রতিজ্ঞা করে গেলাম। আমি মুহাম্মদের শির না নিয়ে ফিরব না।

www.nagorikpathagar.org

উত্তেজিত জনতা মুহুর্মুহু করতালি দিয়ে তাকে অভিনন্দিত করল। উমর বক্ষ ফুলিয়ে সদর্পে মুহাম্মদ (সা)-এর শির আনতে বের হলেন।

কিন্তু আল্লাহর মহিমা মানুষ কি বুঝবে, আবূ জেহেলের এই চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে গেল। এ হল তাদের জন্য হিতে বিপরীত। এটা ইসলামের জন্য বিরাট লাভের কারণ হয়ে দেখা দিল। আরকাম বিন আবিল আরকাম (রা)-এর বাড়ি ছিল সাফা পাহাড়ের পাদদেশে অতি নিভৃতস্থানে। হযরত উমর (রা) নিষ্কোষিত অসি হস্তে সেই দিকেই ছুটে চলেছেন। পথিমধ্যে সাক্ষাত হল নঈমের সঙ্গে। তিনি পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কিহে উমর কোন্‌দিকে যাত্রা করেছ ? তিনি বললেন ঃ মুহাম্মদের শির আনতে যাচ্ছি। নঈম বললেন ঃ প্রথমে তোমার ঘর সামলাও! তোমার ভগ্নি ও ভগ্নিপতি মুহাম্মদ (সা)-এর ধর্ম গ্রহণ করেছে।

একথা শুনে উমর (রা) রাস্তা পরিবর্তন করে ভগ্নির বাড়ির দিকে চললেন। সেখানে হযরত খাব্বাব (রা) ঘরের দরজা বন্ধ করে স্বামী-স্ত্রী উভয়কে কুরআন শিক্ষা দিচ্ছিলেন। উমরের পদধ্বনি শ্রবণ করে হযরত খাব্বাব (রা) গৃহকোণে আত্মগোপন করলেন। হযরত উমর (রা) ভগ্নির নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা নাকি পিতা-পিতামহের ধর্ম ত্যাগ করে মুহাম্মদের ধর্ম গ্রহণ করেছ? হযরত উমরের ভগ্নিপতি সাঈদ বললেন ঃ সে ধর্ম যদি সত্য হয় তবে সে ধর্ম গ্রহণে বাধা কিসের? উমর (রা) ক্রোধে অধীর হয়ে তার দাড়ি ধরে বেদম প্রহার করতে লাগল। ফাতিমা ভ্রাতার হাত হতে স্বামীকে রক্ষা করতে গিয়ে আহত হলেন। আর বললেন, আমরা মুশরিকী ধর্ম ত্যাগ করে সত্য ধর্ম গ্রহণ করেছি। এখন তোমার যা ইচ্ছা হয় তাই করতে পার। ভগ্নির শরীরে রক্তের ধারা দেখে উমরের মন গলে গেল এবং জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমরা কি পাঠ করছিলে, আমাকে দেখাও। ফাতিমা বললেন, "তুমি অপবিত্র, সুতরাং অপবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা যায় না।" অতপর উমর গোসল করে পবিত্র হয়ে কুরআন হস্তে নিয়ে পাঠ করতে শুরু করলেন। এতে সূরায়ে তোয়াহা লিখিত ছিল, যখন এই আয়াত পর্যন্ত পাঠ করলেন।

إِنَّنِىْ أَنَا اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِىْ وَ أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ

"নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ্। আমি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত কর, আমার সালাত কায়েম কর। তখন পাঠ মাত্র হযরত উমরের মনের পরিবর্তন হয়ে গেল সত্য গ্রহণের নিমিত্ত। তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। ভগ্নি ফাতিমাকে বললেন ঃ আমাকে মুহাম্মদ (সা)-এর সমীপে নিয়ে

www.nagorikpathagar.org

চল। এই কথা শ্রবণ করে হযরত খাব্বাব (রা) বের হয়ে এসে বললেন ঃ হে উমর সুসংবাদ গ্রহণ করুন। রাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্র নিকট দোয়া করেছেন, 'হে আল্লাহ্! উমর এবং আবূ জেহেল দুইজনের মধ্যে যাকে তুমি পছন্দ কর তাকে হিদায়াত দান করে ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করে দাও। মনে হচ্ছে আল্লাহ্ আপনার জন্যই তাঁর দোয়া কবূল করেছেন।

অতপর সকলে মিলে আরকামের বাড়িতে উপস্থিত হলেন। হযরত উমর (রা)-কে যেতে দেখে সমবেত সাহাবীগণ ভীত হয়ে পড়লেন। তখন বীর কেশরী হামজা (রা) বললেন ঃ "উমর যদি সদুদ্দেশ্য নিয়ে এসে থাকেতবে ভাল। অন্যথায় তার হস্তস্থিত তরবারি দ্বারা তাকে উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "তাকে আসতে দাও।" নিকটবর্তী হতেই রাসূলে আকরাম (সা) তাঁর হস্ত ধারণ পূর্বক বললেনম ঃ "উমর! সারা জীবন কি লড়তেই থাকবে ?" উমর বললেন, "আল্লাহ্র রাসূল! আমি লড়তে আসি নি, আত্মসমর্পণ করতে এসেছি।" এই কথা বলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র হস্ত ধারণ পূর্বক পবিত্র কলেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ পাঠ করে জীবন ধন্য করলেন। হযরত উমর (রা) রাসূলের শির নিতে এসে নিজের শির রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র মুবারক কদমে সমর্পণ করলেন। সমবেত মুসলমানেরা খুশীতে তাকবির ধ্বনি উচ্চারণ করলেন। হযরত উমরের শক্তি, সাহস, প্রতিভা এবং যোগ্যতার কথা কারও অজানা নয়। তিনি ইসলামের সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করে দিলেন। পরবর্তীকালে ইসলামের খিলাফতের পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। তাঁর মত ন্যায়নিষ্ঠ এবং দক্ষ শাসক দুনিয়ার ইতিহাসে বিরল।

যা হোক হযরত উমর (রা)-এর ন্যায় কুরাইশ নেতার এভাবে ইসলাম গ্রহণ করায় কুরাইশগণ বিচলিত হয়ে পড়ল। হযরত উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ্র ইবাদত গোপনে করা হত। হযরত উমর (রা) ইসলাম গ্রহণ করে বললেন, "কাফিররা মহান আল্লাহ্কে ভুলে প্রস্তরনির্মিত জড় প্রতিমার পূজা অর্চনা প্রকাশ্যে করবে আর আমরা সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের মালিক মহান বিশ্ব প্রভুর ইবাদত করব গোপনে ? তা কিছুতেই হতে পারে না। হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কি এমনি কাপুরুষ ? আমাদের বাহুতে কি শক্তি নেই? কা'বাগৃহে কি আমাদের অধিকার নেই? কা'বাগৃহে মিথ্যা প্রতিমার পূজা দ্বারা বিধর্মীরা তার পবিত্রতা নষ্ট করবে আমরা তার প্রকৃত মালিকের উপাসনা করতে পারব না, এ কেমন কথা? আমরা আল্লাহ্র বান্দা এবং তাঁরই আজ্ঞানুবর্তী। আমরা অবশ্যই কা'বা গৃহে আল্লাহ্র ইবাদত প্রকাশ্যে করব।

www.nagorikpathagar.org

হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) আপনি যদি অনুমতি দেন, তবে আজই কা'বাগৃহে প্রকাশ্যে সালাত আদায় হোক। যদি কোন বিধর্মী কাফির বাধা দিতে আসে তবে জানবেন এই উন্মুক্ত তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলব।

হযরত উমর (রা)-এর এরূপ ঐকান্তিকতা এবং সৎসাহস দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যারপরনাই সন্তুষ্ট হলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ উমর (রা)-এর প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করতে প্রস্তুত হলেন।

এ সময় মুসলিম দলে তিনজন বীরের সমাবেশ ঘটেছে—হযরত হামজা (রা), হযরত উমর (রা) ও হযরত আলী (রা)। এদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ হযরত আলী (রা)। কিন্তু হলে কি হবে, ইতিমধ্যেই আলী (রা)-র তেজ, বিক্রম, সৎসাহসের কথা সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছিল। লোকেরা স্বীকার করত যে, সত্যিকারভাবেই আলী (রা) একজন বিক্রমশালী যুবক।

যা হোক, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নির্দেশক্রমে মুষ্টিমেয় মুসলিমকে দু'টি কাতারে বিভক্ত করা হল। বাম কাতারের অগ্রে থাকলেন মহাবীর হামজা (রা) দক্ষিণ কাতারের সম্মুখে থাকলেন প্রবীণ সাহাবী হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা)। উভয় কাতারের মধ্যস্থলে সম্মুখভাগে স্থান গ্রহণ করলেন বীরকেশরী হযরত আলী (রা) এবং তারই পিছনে রাসূলে আকরাম (সা) স্বয়ং। সকলের অগ্রে উন্মুক্ত তরবারি হস্তে মহাবীর উমর (রা) অগ্রসর হতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই মুষ্টিমেয় মুসলমানের এই মিছিল কা'বাগৃহের সম্মুখে উপস্থিত হল।

ওদিকে আবূ লাহাব, আবূ জেহেল প্রমুখ কুরাইশ নেতা কা'বাগৃহের নিকটে বসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হত্যা করবার পন্থা উদ্ভাবনী এক পরামর্শ সভায় সমবেত হয়েছিল। দূর হতে তারা হযরত উমর (রা)-কে দেখে আবূ জেহেল বিদ্রূপের স্বরে বলল, কিহে উমর! মুহাম্মদের শির কোথায়?

উমর (রা) আবূ জেহেলের বিদ্রূপোক্তিতে ব্যাঘ্রের ন্যায় গর্জে উঠলেন ঃ "যে আমার প্রকৃতি সম্পর্কে অবগত সে নিশ্চয়ই আমার সাথে সংযতভাবে কথা বলবে। আর যে আমাকে চিনবার সুযোগ পায় নাই সে আমার সম্মুখীন হয়ে উত্তমরূপে চিনে নিতে পারে। জেনে রেখ, আমি কাফিরদের জন্য যমরূপী খাত্তাব তনয় উমর। আমি আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা) সমীপে স্বীয় মস্তক এমনকি মনপ্রাণ সমস্ত কিছুই কুরবান করেছি। আর তোমাদেরও পরামর্শ দিচ্ছি, আল্লাহ্‌র রাসূলের আদেশ শিরোধার্য করত ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে জীবন ধন্য কর। আমাদের কাজে সামান্য বাধা দান করলে আমরা তা সহ্য করব না। উন্মুক্ত তরবারি দেখতেই পাচ্ছ। দুঃসাহস দেখালে তার উচিত শিক্ষা দিয়ে

www.nagorikpathagar.org

ছাড়ব। জেনে রেখ, আমরা আল্লাহ্‌র দুনিয়া হতে আল্লাহ বিরোধিতার মূলোৎপাটন করে আল্লাহ্‌র রাজত্ব কায়েম করে ছাড়ব।

হযরত উমর (রা)-এর তেজোদৃপ্ত বাক্য শুনে কুরাইশগণ স্তম্ভিত হয়ে গেল। কিন্তু তারা চিন্তা করে দেখল আজ যদি বিনা বাধায় কা'বাগৃহে নামায পড়বার সুযোগ পায়, তবে তাদের শক্তি আরও বেড়ে যাবে। সুতরাং বাধা দান করাই সাব্যস্ত হলো। কাফিররা একযোগে হযরত উমর (রা)-কে আক্রমণ করল। তিনিও কাফিরদের সম্মুখীন হয়ে বিপুল বিক্রমে প্রতি আক্রমণ করলেন। মহাবীর আলী (রা) আর সহ্য করতে পারলেন না। কাফিরদের ঔদ্ধত্য দেখে ক্রোধে ফেটে পড়লেন এবং বিপুল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাফির দমনে প্রবৃত্ত হলেন। হযরত আলীর আক্রমণে কাফিরগণ দিগ্বিদিগ ছুটাছুটি করতে লাগল। হযরত আলী (রা) কাউকে মুষ্টাঘাত, কাউকে পদাঘাত, কাউকে শূন্যে তুলে আছড়ে ফেলে সম্মুখে অগ্রসর হতে লাগলেন।

এদিকে হযরত উমর (রা) এক পরাক্রমশালী কাফিরের সঙ্গে দৈরথ যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন, তাকে পরাজিত করা সহজ হচ্ছিল না। তা দেখে হযরত আলী (রা) ভীষণ আওয়াজে মেদিনি কাঁপিয়ে সেই দিকে অগ্রসর হলেন। সেই আওয়াজে কাফিরের আত্মা কেঁপে উঠল, আপনা হতেই তার শক্তি রহিত হয়ে গেল। এই সুযোগে হযরত উমর (রা) তাকে ধরাশায়ী করে ফেললেন। অতপর বুকে চড়ে তাকে হত্যা করতে উদ্যত হতেই সে করুণ আর্তনাদ করে উঠল। তার কাকুতি মিনতিতে তাকে ছেড়ে দিলেন। সে উঠে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করল। কাফিরগণ পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেল। কা'বাগৃহ সম্মুখে আর কোন কাফিরই রইল না। সানন্দে চল্লিশজন সাহাবীসহ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবার কা'বাগৃহে প্রকাশ্যভাবে সালাত আদায় করলেন। হযরত উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের পরেই তা সম্ভব হলো।

আবূ তালিবের ঘাঁটিতে নজরবন্দী নবুওতের সপ্তম বছর

এভাবে বাদশা নাজ্জাশীর দরবার হতে বিফল মনোরথ হয়ে ও আবূ তালিবের কাছে নিরাশ হয়ে, তদুপরি মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি ইসলামের পথ পরিষ্কার এবং প্রসার দেখে কাফিরগণ এক নতুন পথ অবলম্বন করল। তারা সকলে গিয়ে মুহাম্মদ (সা) এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজন এবং তাঁর সাহাবীগণকে সম্পূর্ণরূপে সমাজচ্যুত করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল এবং প্রতিজ্ঞাপত্র কা'বাগৃহের দেয়ালের সাথে আটকিয়ে দিল। তৎকালীন আরবে সমাজচ্যুতির এই প্রচলনটি বড়ই মারাত্মক ছিল, যাকে সমাজচ্যুত করা হত, তার নিকট হতে কোন লোক

www.nagorikpathagar.org

কোন মাল খরিদ করত না। কেউ তার নিকট কোন দ্রব্য বিক্রয়ও করত না। কথা-বার্তা তো তার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়া হত। মোটকথা সমাজচ্যুত ব্যক্তির পক্ষে তখন সমাজে বাস করার কোন উপায়ই থাকতো না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর আত্মীয়-স্বজন এবং সাহাবীগণের উপর এই অবস্থা সৃষ্টি হল। তখন তাঁদের সমাজে বসবাস করার কোন উপায় রইল না।

আবূ তালিব যদিও ইসলাম গ্রহণ করেন নাই কিন্তু মূলত তিনিই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী ছিলেন। কুরাইশদের অনুরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এবং শত্রুতামূলক নিষ্ঠুর আচরণ দেখে বৃদ্ধ আবূ তালিব নিরতিশয় চিন্তিত হয়ে পড়লেন। সুতরাং তিনি অনতিবিলম্বে হাশিম ও মুত্তালিব বংশের লোকদের ডেকে পরামর্শ করলেন। সিদ্ধান্ত হল তারা শেব নামক গিরি সঙ্কটে চলে যাবেন। কারণ এরূপ শত্রু পরিবেষ্টিত অবস্থায় বাস করা যায় না। আর এইরূপ থাকাও উচিত নয়। উক্ত স্থানটি পূর্ব হতেই বনি হাশিমদের অধিকারভুক্ত ছিল। তা ছাড়া স্থানটি একটি সুরক্ষিত দুর্গের মত ছিল। এটা শহর হতে সামান্য মাত্র দূরে অবস্থিত ছিল।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ হল। বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের লোকজন অন্য মুসলিমদের সঙ্গে নিয়ে গিরিসঙ্কটে চলে গেলেন। সেখানে তারা বন্দী জীবন যাপন করতে লাগল। খাওয়া-পরায় তাদের কষ্টের আর সীমা রইল না। কাফির কুরাইশগণ বাহির হতে তাদের খাদ্য সরবরাহেও হস্তক্ষেপ করতে লাগল। এই অসহনীয় অবস্থা একদিন-দু'দিন নয়, দীর্ঘ তিনটি বছর বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবদের এই নিদারুণ কষ্ট সহ্য করতে হল। দলনেতা বৃদ্ধ আবূ তালিবের স্বাস্থ্য একেবারেই ভেঙে গেল। হযরত আলী (রা) পিতার অবস্থা দেখে বিচলিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু করবার মত কিছুই ছিল না। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল, খাদ্যের অভাবে তাঁদের বৃক্ষপত্র, তৃণলতা প্রভৃতি অখাদ্য খেয়ে জীবন ধারণ করতে হতে লাগল। নারী, শিশু ও কিশোরদের করুণ ক্রন্দনে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল। কিন্তু নরাধম কাফিরদের মন তাতে একটুও টলল না। গিরিসঙ্কট জুড়ে একটি করুণ দৃশ্য ফুটে উঠল। বহু বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, শিশু ও কিশোর মৃত্যুর মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। এমনি সময়ে কতিপয় সৎবিবেক সম্পন্ন ব্যক্তির বোধ হয় মানবতাবোধ জেগে উঠল। তাদের মনে দয়ার উদ্রেক হল। তারা সমাজবন্ধের প্রতিজ্ঞাপত্র ছিঁড়ে ফেলে গিরিসঙ্কটে আবদ্ধ লোকদের মুক্তি ঘোষণা করল। তারা গিরিসঙ্কট হতে মুক্ত আকাশের নিম্নে বের হয়ে এলেন। এবং পূর্বের মতই রিসালাতের দায়িত্ব পালনে আত্মনিয়োগ করলেন।

www.nagorikpathagar.org

হযরত তোফায়েল বিন আমির দৌসির ইসলাম গ্রহণ

নবুওতের দশম বছরে তোফায়েল বিন আমির দৌসি মক্কায় আগমন করেন। ইনি ইয়ামনের প্রসিদ্ধ দৌসি খান্দানের লোক ছিলেন। ইয়ামনে এই গোত্র প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী ছিল, তোফায়েল দৌসি গোত্রের গোত্রপতি ছিলেন। তিনি একজন বিখ্যাত কবি এবং বিচক্ষণ বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। তার মক্কায় আগমনের সংবাদ পেয়ে কুরাইশগণ শহর ছেড়ে বাইরে গিয়ে তাকে সাদর সম্ভাষণ জানাল এবং সঙ্গে করে নিজেদের ঘরে এনে মেহমানদারী করতে লাগল। তাকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য বিভিন্ন প্রকারে চেষ্টা করতে লাগল। এবং তারা (কুরাইশগণ) তাকে সতর্ক করে দিল যে, আমাদের এখানে একজন জাদুকর আছে, সে জাদুর প্রভাবে পিতাপুত্রে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে, ভ্রাতা-ভ্রাতার মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করে দেয়। সে আমাদের পেরেশান করে দিয়েছে। আমাদের ধর্মীয় একতা নষ্ট করে আমাদের ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। আমরা এটা পছন্দ করি না যে, মুসিবত আমাদের উপরে এসেছে, এই মুসিবত আপনাদের পরেও আসুক। এজন্য আপনাকে আমাদের বিশেষ অনুরোধ আপনি কখনো তার নিকটে যাবেন না, তার কোন কথা শুনবেন না, এবং আপনি তার সঙ্গে কোন বাক্যালাপও করবেন না।

তোফায়েল বলেছেন ঃ তারা এই কথা আমার মন মস্তিষ্কে এমনভাবে বদ্ধমূল করে দিয়েছে যে, আমি যদি কখনো যেতাম তখন আমার কর্ণ তুলা দ্বারা বন্ধ করে নিতাম যাতে মুহাম্মদ (সা)-এর কথার শব্দ পর্যন্ত আমার কর্ণে প্রবেশ করতে না পারে। একদিন আমি অতি প্রত্যূষে কা'বা গৃহে গমন করলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালাত আদায় করছিলেন। আমি শুনতে পেলাম তিনি এমন মধুর কালাম পাঠ করছেন যে, এমন সুন্দর কালাম আমি আর জীবনে কখনো শুনিনি। এই সময় আমি নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলাম। আমি নিজে আলিম, আমি জ্ঞানী, ভালমন্দ বুঝবার ক্ষমতাও রাখি, তাহলে কোন্ কারণে কি বাধা আছে আমি তার কথা শুনব না? কথা যদি উত্তম হয় গ্রহণ করব আর উত্তম না হয় ত্যাগ করব। আমি এই কথা চিন্তা করে বসে রইলাম। নবী করীম (সা) সালাত আদায় করে বাড়ির দিকে চললেন, আমিও সঙ্গে সঙ্গে চললাম।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন ঘরে ফিরে এলেন, তখন আমি সকল কথা তাঁর নিকট খুলে বললাম। আমি সুদূর ইয়ামন হতে কেন মক্কায় আগমন করলাম, লোকের ধোঁকায় পড়ে কানে তুলা প্রবেশ করাতাম ইত্যাদি সমস্ত বিবরণ আল্লাহ্র রসূলের নিকট বিবৃত করলাম। আমি হুযূরের নিকট নিবেদন করলাম, আপনি আমাকে কালামে পাক শ্রবণ করান। তিনি পাক কালাম পাঠ করলেন, আমি মোহিত

www.nagorikpathagar.org

হলাম, বিমুগ্ধ হলাম, এমন মধুর কালাম আমি আর কখনো শ্রবণ করি নাই, যে কালাম মানুষকে সৎ ও সুন্দর বানাতে পারে।

দৌসি নেতা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র মুবারক হস্তে হস্ত স্থাপন পূর্বক ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। কুরাইশগণ যেরূপ তার খাদেম ও হুকুম বরদার ছিল, দৌসি নেতাও তদ্রূপ পবিত্র কলেমা পাঠ করে নিজেকে রসূলে পাক (সা)-এর মুবারক কদমে উৎসর্গ করে দিলেন। এরূপ একজন নেতার ইসলাম গ্রহণ কুরাইশদের জন্য অসহনীয় ব্যাপার হয়ে পড়ল। তারা ক্রোধে অধীর হয়ে জ্বলে-পুড়ে মরতে লাগল।

এক ব্যবসায়ীর ঘটনা

এই সময় মক্কায় এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল। একজন ব্যবসায়ী তার ব্যবসায়ের মাল বিক্রয় করবার জন্য মক্কায় আগমন করল। আবূ জেহেল তার নিকট হতে সমুদয় মাল খরিদ করল অথচ তার মূল্য দিল না। বেচারা পেরেশান হয়ে দারুণ নদওয়ায় গিয়ে দেখতে পেল কুরাইশগণ সকলেই উপস্থিত। সে তাদের বলল, হে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে আবূ জেহেলের নিকট হতে আমার দ্রব্য মূল্য আদায় করে দিতে পারে ? আমি একজন গরীব ব্যবসায়ী। সে আমার মাল খরিদ করে এখন তার মূল্য দিচ্ছে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও ঐ সময় কা'বাগৃহে উপস্থিত ছিলেন। কুরাইশগণ আল্লাহ্র রাসূলকে অপদস্থ করার উদ্দেশ্যে রাসূলে আকরাম (সা)-কে দেখিয়ে বলল, ঐ লোকটা আবূ জেহেলের নিকট থেকে তোমার মূল্য আদায় করে দিতে পারে। সে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জানত না। আবূ জেহেল ছিল আল্লাহ্র রাসূলের বড় দুশমন। কাফিরদের উদ্দেশ্য ছিল অসৎ। তারা চেয়েছিল আল্লাহ্র রাসূলকে অপদস্থ করতে।

বেচারা ব্যবসায়ী বিদেশী লোক। কাফিরদের চক্রান্ত সম্পর্কে সে অবগত ছিল না। তাই সে হুযুরের মুবারক খিদমতে গিয়ে সকল ঘটনা খুলে বলল এবং আরও বলল, কুরাইশগণ বলেছে আপনি নাকি আবূ জেহেলের নিকট হতে আমার দ্রব্যমূল্য আদায় করে দিতে পারেন। রাসূলে আকরাম (সা) তাকে সঙ্গে নিয়ে আবূ জেহেলের বাড়ির দিকে গমন করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যেতে দেখে কুরাইশগণ বিচলিত হয়ে উঠল এবং তাদের মধ্য হতে একটা লোক প্রেরণ করল অবস্থা জানবার জন্য। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ জেহেলের দরজায় গিয়ে আঘাত করলেন। শব্দ শুনা মাত্র আবূ জেহেল বেরিয়ে আসল। তখন রাসূলুল্লাহ বললেন ঃ এই ব্যবসায়ীর প্রাপ্য মূল্য তাকে প্রদান কর। আবূ জেহেল কাল বিলম্ব না করে

www.nagorikpathagar.org

তার দ্রব্যমূল্য তাকে প্রদান করল। কুরাইশদের দূত ফিরে এসে সমুদয় ঘটনা বিবৃত করল। একথা শুনে সকলেই তাজ্জব হয়ে গেল।

আবূ জেহেলও সঙ্গে সঙ্গে তার দলবলের নিকট ফিরে এল। কুরাইশগণ তার নিকটে জিজ্ঞাসা করল অবস্থা সম্বন্ধে। আবূ জেহেল বলল ঃ সে যখন আমার দরজায় আঘাত করল তখন আমি দরজা খুলে দেখতে পেলাম একটি ভীষণ আকৃতি বিশিষ্ট উষ্ট্র আমাকে গ্রাস করার নিমিত্ত মুখ খুলে আমার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আমার কোন কথা বলার সাহস পর্যন্ত হচ্ছিল না, তখন আমি বাধ্য হয়েই তার পাওনা পরিশোধ করে দিলাম।

আবূ তালিব এবং খাদীজা (রা)-র ইন্তিকাল ঃ নবুওতের দশমবর্ষ

নবুওতের দশম বর্ষ। তিনটি বছর পর্যন্ত শিবে আবূ তালিবের গিরি সঙ্কটে অবরুদ্ধ জীবন যাপন ও অনাহারজনিত ক্লেশে বৃদ্ধ আবূ তালিবের স্বাস্থ্য একেবারেই ভেঙে পড়েছিল। তিন বছর পরে অন্তরীণ অবস্থা হতে মুক্তিলাভ করলেন বটে কিন্তু ভগ্ন স্বাস্থ্যের উন্নতি আর হল না। ক্রমে ক্রমে তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন এবং তাঁর অন্তিম সময় ঘনিয়ে এল। তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে এসেছে। আবূ তালিব আত্মীয়-স্বজনদের ডেকে এনে শেষ উপদেশ দিতে লাগলেন। তিনি ছিলেন গোত্রপ্রধান। অতএব কুরাইশ দলপতিগণ প্রায় সকলেই তার শয্যাপার্শ্বে এসে উপস্থিত হলো। আবূ তালিব তাদের সকলকেই উপদেশ দিলেন। তোমরা আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো, পরস্পরে হিংসা-বিদ্বেষ পরিত্যাগ করে মিলেমিশে থেকো। তিনি আরও বললেন ঃ কুরাইশগণ! তোমরা আমার পুত্র আলী এবং ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ-এর সঙ্গে অন্যায় আচরণ কর না। কুরাইশ দলপতিগণ নিস্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে আবূ তালিবের উপদেশ শুনছিল। আবূ তালিবের অন্তিমকাল আসন্ন মনে করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বশে আনবার শেষ চেষ্টা করল। আবূ জেহেল ও কুরাইশ প্রধানগণ বলতে লাগল, কুরাইশ নেতা! আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, আমরা আপনাকে অশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা করে থাকি। আপনি আমাদের গোত্রপ্রধান। সুতরাং আপনার কথা আমাদের মানতেই হবে। তবে মুহাম্মদ-কে শেষ বারের মত নিষেধ করে যান, সে যেন আমাদের প্রিয় দেব-দেবীর কুৎসা প্রচার আর না করে।

সঙ্গে সঙ্গে আবূ তালিব প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ (সা)-কে নিকটে ডেকে কুরাইশ নেতাদের কথা তাঁকে শুনালেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ হে আমার সম্মানিত পিতৃব্য! সত্য চিরদিনই সত্য। সত্য কোনদিনই মিথ্যার সঙ্গে আপস করে না। যে সত্য নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি তার প্রচার আমি করবই। অতপর

www.nagorikpathagar.org

তিনি আবেগ জড়িত কণ্ঠে আবূ তালিবকে বললেন ঃ প্রিয় চাচাজান! এখনও সময় আছে, একবার খালেস দিলে পবিত্র কলেমা তাইয়্যেবা মুখে উচ্চারণ করুন। আবূ তালিব শেষ মুহূর্তে ইসলাম কবূল করে ফেলেন নাকি কুরাইশগণ এই আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত হয়ে বলে উঠল, কুরাইশ নেতা! মৃত্যুর ভয়ে আপনি কি শেষ পর্যন্ত আমাদের পিতৃ-পিতামহের ধর্ম ত্যাগ করবেন ?

আবূ তালিব কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকলেন। আলী (রা) ও মুহাম্মদ (সা)-এর দিকে তাকিয়ে বাষ্প জড়িত কণ্ঠে বললেন ঃ তোমরা কুরাইশদের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করে চল।

আলী (রা) বললেন ঃ পিতঃ আমি তাদের এমন একটি কথা বলব, যদি তাতে তারা সম্মত হয় তবে তারা সমগ্র আরবের একচ্ছত্র অধিপতি হতে পারবে।

আবূ জেহেল বলল ঃ তোমাদের সঙ্গে যদি সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয় একটি মাত্র কথা কেন, তোমাদের সহস্র কথাও অবাধে মেনে নিতে প্রস্তুত আছি। এবার আলী (রা) বললেন, তা হলে অকপটে ও বিশুদ্ধ মনে মুখে উচ্চারণ করুন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। হযরত আলীর কথায় কুরাইশ নেতৃবৃন্দ ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে বিরক্তি সহকারে তৎক্ষণাৎ সেখান হতে চলে গেল। হযরত আলী (রা) পিতার দিকে তাকিয়ে বললেন, আব্বাজান দুরাচার কুরাইশদের অবস্থা দেখলেন। এইমাত্র তারা বলল ঃ আমাদের সহস্র কথাও তারা মানতে প্রস্তুত। কিন্তু একটি মাত্র কথায় নারাজ হয়ে চলে গেল। এই পথভ্রষ্ট কুরাইশদিগকে ন্যায় ও সত্যের পথপ্রদর্শন করতে যাওয়ায় এবং তাদেরকে পরকালের কঠিন শাস্তি হতে মুক্তি লাভের উপদেশ দেয়ায় তারা প্রতিমুহূর্তে আমাদের লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করতে চেষ্টা করছে।

ওরা পাপের গভীর আবর্তে ঘুরে ঘুরে অতল নরক কুণ্ডে পতিত হয়ে অনন্ত জীবন নরক অনলে জ্বলে মরবে, তবুও আমাদের সাথে সদ্ভাব স্থাপন করবে না। পিতঃ! আপনার বর্তমানেই আমাদের প্রতি আপনার দৃঢ় সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা সত্ত্বেও ওরা আমাদের প্রতি কিরূপ অন্যায় ও নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করছে তা আপনি সচক্ষেই দেখলেন। আপনার অবর্তমানে ওরা আমাদের সাথে আরও যে কত শত্রুতায় লিপ্ত হবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। প্রিয় পুত্রের এই আক্ষেপপূর্ণ বাক্যে আবূ তালিব সান্ত্বনার স্বরে বললেন, প্রিয় বৎস আলী! ধৈর্য ধারণ কর। আশঙ্কার কিছু নেই। তোমরা সত্য ধর্মের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছ, তার সেবায় মনপ্রাণ নিয়োজিত করেছ তখন তিনিই তোমাদের সকল প্রকার প্রতিবন্ধকতা অপসারিত করবেন। স্বয়ং বিশ্বপালক তোমাদের প্রতি কৃপার দৃষ্টি নিক্ষেপ

www.nagorikpathagar.org

করলে সমগ্র আরববাসী তোমাদের বিপক্ষে গেলেও তোমাদের কিছুই করতে পারবে না।

নিঃশঙ্কচিত্তে তোমরা তোমাদের কর্তব্য সাধন করে যাও। দুরাচার কুরাইশগণের মতের কাছে মাথানত করে তোমাদের কর্তব্যে অবহেলা করো না। অতপর আবূ তালিব মুহাম্মদ (সা)-কে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন ঃ হে মুহাম্মদ! হতভাগ্য কুরাইশগণ তোমাকে চিনতে না পেরে অমৃত হেলায় হারিয়ে গরলের গ্লাস নিয়ে সন্তুষ্ট রইল। যারা নিজেরা নিজেদের ভাল বুঝতে পারে না তাদের কল্যাণ সাধন করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ নরকই ওদের যোগ্য স্থান।

তবে মুহাম্মাদ তুমি শুনে রাখ, দুরাত্মা কুরাইশগণ যদিও তোমার প্রচারিত সত্য ধর্মের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারল না কিন্তু আমি মনেপ্রাণে তোমার ধর্মের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমি উত্তমরূপে জানি, বিশ্বস্রষ্টা স্বীয় বান্দার কল্যাণ কামনায় তোমাকে তাঁর সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন। পিতৃব্যের কথা শুনে মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র হৃদয়খানা আনন্দে ভরে গেল। খুশীর আবেগে তাঁর নেত্রদ্বয় ছল ছল করে উঠল। তিনি বলতে লাগলেন ঃ চাচাজান! আপনি আমাকে আশৈশব পুত্রাধিক স্নেহে প্রতিপালন করেছেন, আমার প্রতি আপনার স্নেহ-মমতা ও সাহায্যের তুলনা নেই। শত্রুর হিংস্র নখের থাবা থেকে আমাকে রক্ষা করতে গিয়ে আপনি আহত হয়েছেন তবুও আপনি আমাকে শত্রুর হাতে ছেড়ে দেন নি। আপনার এই দানের বদলা আমি যে কিছুই দিতে পারলাম না। আপনি যে অপরিশোধ্য ঋণজালে আমাকে আবদ্ধ করেছেন তার বিন্দুমাত্র আমি পরিশোধ করতে পারলাম না, তাতে আমি যে কি গভীর দুঃখ অনুভব করছি তা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারব না।

এখন জীবনের এই শেষ মুহূর্তে একটিবার মাত্র অকপট চিত্তে ও ভক্তি-সহকারে কলেমায়ে তাওহীদ মুখে উচ্চারণ করতেন তবে আমি আল্লাহ্র কাছে আপনার পারলৌকিক মুক্তির জন্য সুপারিশ করতে পারতাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি শুনে আবূ তালিব আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বললেন ঃ প্রিয় ভাতিজা মুহাম্মদ! (সা) আমি পবিত্র কলেমা মুখে উচ্চারণ করতাম কিন্তু দুর্মতি কুরাইশগণ আমাকে কাপুরুষ বলে উপহাস করবে। শুধু এই একটিমাত্র কারণেই মুখে বলতে পারছি না।

আবূ তালিবের কথায় তার ঈমান সম্বন্ধে পরিষ্কার কিছুই বোঝা গেল না। মুহাম্মদ (সা) এতে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। অবশ্য নিরাশও হলেন না। তিনি ভগ্ন কণ্ঠে বললেন ঃ 'চাচাজান! আল্লাহ্ তা'আলা নিষেধ না করা পর্যন্ত আমি

www.nagorikpathagar.org

আপনার জন্য মুক্তির প্রার্থনা করতে থাকব। মুমূর্ষু আবূ তালিব বাষ্পাকুল দৃষ্টিতে মুহাম্মদ (সা)-এর পানে তাকিয়ে রইলেন। কয়েক মুহূর্ত পরই তার জীবন প্রদীপ নির্বাপিত হল। মৃত্যুর সময়ে ভ্রাতা আব্বাস (রা) পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন।

আবূ তালিবের পরলোকগমনের পরে শিশু ইসলাম একজন দৃঢ় সমর্থক ও শুভাকাঙক্ষীকে হারাল। এমন কি মুহাম্মদ (সা) শৈশবকাল অবধি যার স্নেহের ক্রোড়ে লালিত-পালিত ও বর্ধিত হয়েছিলেন, যার সবল আশ্রয়ে নিরাপদ ছিলেন, আজ নীড়হারা ও আশ্রয়চ্যুত হয়ে পড়লেন, অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে পড়লেন। এই ব্যথা তিনি সহজে কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। বহুদিন পর্যন্ত স্নেহশীল পিতৃব্যের বিয়োগজনিত শোক বক্ষে নিয়ে তিনি কালযাপন করেছিলেন।

আবূ তালিবের মৃত্যুতে দুরাত্মা কুরাইশগণ মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি দ্বিগুণ অত্যাচার শুরু করে দিল। তবে স্বয়ং আল্লাহ্ যাঁর সাহায্যকারী, সত্য ও ন্যায় যাঁর অবলম্বন তাঁর আর পরোয়া কিসের? সকল অত্যাচার ও শত্রুতা উপেক্ষা করে মুহাম্মদ (সা) প্রভুর আদিষ্ট ধর্মের বাণী প্রচার করে যেতে লাগলেন।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা (রা)-র তিরোধান

প্রাণপ্রিয় পিতৃব্যের মৃত্যুর কয়েকদিন পরই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রথম জীবন সঙ্গিনী উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা (রা) দুনিয়ার কর্ম সাঙ্গ করে সংসারের মায়া কাটিয়ে শোকসন্তপ্ত নবীকে শোক সাগরে ভাসিয়ে প্রভুর আহবানে সাড়া দিয়ে অনন্তের পথে পাড়ি জমালেন।

নির্মম নিষ্ঠুর কুরাইশগণ দয়ার নবীর উপরে নির্মম অত্যাচার-নিপীড়ন করত। হযরত খাদীজা (রা)-র স্নেহমাখা সান্ত্বনার বাণী সমস্ত দুঃখ-বেদনা দূরীভূত করে নতুনরূপে কর্মপ্রেরণা যুগিয়ে দিত। একের পর এক একটির ব্যথা মুছে যেতে না যেতেই অপরটি এসে হৃদয়ের সমস্ত গ্রন্থি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিল। এজন্য এই বছরকে বলা হয় দুঃখের বছর।

কুরাইশদের অত্যাচার

আবূ তালিবের মৃত্যুকে কাফিররা মহা সুযোগ মনে করে তার সদ্ব্যবহারে মনোনিবেশ করল। আল্লাহ্র প্রিয় রাসূলের উপর যুলুম-নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি করে দিল। রাস্তায় চলার সময় মুবারক মাথার উপর ধূলাবালি ঢেলে দিত। নামায পড়ার সময় সিজদায় গমন করলে পিঠের পরে উটের পচা নাড়ীভুঁড়ি চাপিয়ে দিত। কখনও বা কাপড়ের অঞ্চল ধরে রাস্তায় রাস্তায় টেনে নিয়ে বেড়াত এবং বলতে থাকত—কেমন তুমি না আমাদের খোদাদের পরিত্যাগ করে এক

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহকে গ্রহণ করেছ ? তোমার আল্লাহ্ এখন তোমাকে রক্ষা করে না? হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এসে এই কুরাইশ দুরাচারদের যুলুম হতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মুক্ত করতেন।

তায়েফে সফর ঃ তায়েফবাসীর নির্যাতন

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন দেখলেন মক্কায় সফলতার কোন আশা নেই তখন তিনি তায়েফের দিকে যাত্রা করলেন। উদ্দেশ্য, তায়েফে গিয়ে সত্য দীনের প্রচার করবেন। তায়েফ মক্কা হতে সত্তর মাইল দূরে অবস্থিত। সেখানে বনি সাকিফ গোত্রের প্রাধান্য ছিল। এবং তাদের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র দূর সম্পর্কের আত্মীয়তা বিদ্যমান ছিল। তিনি আশা করেছিলেন আত্মীয়তা সম্পর্ক থাকার কারণে হয়ত তারা ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করবে। এ কারণে তিনি গিয়ে বনি সাকিফ গোত্রের নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন। এই কমবখতের দল ইসলাম গ্রহণতো করলোই না বরং দয়ার নবী করুণার ছবি রাহমাতুল্লিল আলামীনের সঙ্গে অমানুষিক ব্যবহার করে তাদের শহরের যুবকদের ডেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র পিছনে লেলিয়ে দিল। এসব দুর্বৃত্ত রাহমাতুল্লিল আলামীনের মুবারক দেহের উপর পাথর নিক্ষেপ করতে শুরু করে দিল। বৃষ্টির পানির মত পাথর বর্ষিত হতে লাগল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র সঙ্গে ছিলেন হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা (রা)। তিনি আর কি করতে পারেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে রক্ষা করতে গিয়ে তিনিও রক্ষা পেলেন না। দয়ার নবীর মুবারক দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে রক্তের ফোয়ারা ছুটল। দিনের শেষে শহর হতে বের হয়ে এক আঙ্গুরের বাগিচায় আশ্রয় গ্রহণ করলেন। বাগিচার মালি দয়া পরবশ হয়ে কিছু আঙ্গুর খিদমতে পেশ করল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্র দরবারে শুকরিয়া আদায় পূর্বক আঙ্গুর গ্রহণ করলেন। দয়ার নবী সেই জনমানব শূন্য প্রান্তরে বসে দয়াময় আল্লাহ্র নিকট নিজের আশ্রয়হীনতার কথা জানিয়ে আকুলভাবে ক্রন্দন করতে লাগলেন। সে কথা স্মরণ করলে কার না হৃদয় ফেটে যায়!

দয়াময় আল্লাহ! হে আমার মাওলা আমি তোমায় ডাকছি। দুর্বল আমি, আশ্রয়হীন আমি, তোমার কাছে আমার অন্তরের আকুল মিনতি। হে আল্লাহ অনন্ত করুণার আধার তুমি অশরণের শরণ তুমি, দুর্বলের সহায় তুমি, প্রভু আমার তুমি ছাড়া আমার আশ্রয়দাতা আর কেহ নাই, কার হাতে তুমি আমাকে ছেড়ে দিলে। লোকেরা আমার উপরে যুলুম করছে নির্যাতন চালাচ্ছে অকথ্য ভাষা ব্যবহার করছে। দয়াময় আল্লাহ্, মানুষ আমার সর্ব সাধনা ব্যর্থ করে দিচ্ছে।

www.nagorikpathagar.org

এমন অনাত্মীয় দয়ামায়াহীন শত্রুর হাতে আমাকে ছেড়ে দিলে, ওগো আমার প্রভু তোমার সন্তোষ আমার কাম্য। তোমার রেজা আমার অনন্ত সাধনার ধন। তা যদি পাই প্রভু বিপদে আমার কি ভয়, আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম সম্বল তোমার দয়া। তোমার পুণ্য জ্যোতির পুণ্য প্রভায় সকল আঁধার কেটে যায়। তোমার স্মরণে মানব জীবনে মঙ্গলের জ্যোতি নেমে আসে, আমি সে জ্যোতির আশ্রয় চাইছি। প্রভু আমাকে তোমার রহমতের ছায়ায় স্থান দাও। তোমার অসন্তুষ্টি যেন আমার গতি না হয় ; প্রভু হে তোমার সন্তুষ্টি যেন লাভ করতে পারি, আমার বেদনার্ত অন্তরের এই আকুল আবেদন—তুমিই একমাত্র আশা, তুমিই একমাত্র ভরসা।

মুশরিক কওমের জন্য হিদায়েতের দোয়া

আল্লাহ্‌র হুকুমে জিবরাঈল (আ) এসে উপস্থিত হলেন এবং বললেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্ আমাকে পাঠিয়েছেন আপনি যদি হুকুম করেন তবে দুইদিকের পাহাড় চাপা দিয়ে এই বর্বর জাতিকে নিষ্পেষিত করে দিই। দয়ার নবী রাহ্‌মাতুল্লিল আলামিন দরবারে ইলাহিতে দুই হাত তুলে দোয়া করতে লাগলেন ঃ আল্লা হুম্মা ইহ্‌দি কওমী ইন্নাহু লা ইয়া'লামুন। হে আল্লাহ্! আপনি আমার জাতিকে হিদায়েত দিন, তারা আমাকে জানে নাই।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এখন চিন্তা করতে লাগলেন কোথায় যাবেন, কি করবেন। তায়েফবাসীরা তো স্থানই দিল না। মক্কায় ফিরে গেলেও কাফিররা আরও বেশী অত্যাচার করবে। নাখলা নামক উপত্যকায় কয়েকদিন অবস্থান করার পর তথা হতে হিরা গুহায় প্রত্যাবর্তন করলেন। এরপর মুতয়িম বিন আদি তার খান্দানের লোকদের অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত করে রাসূলে পাক (সা)-কে সঙ্গে করে মক্কায় পৌছে দিলেন।

শবে মি'রাজ ঃ উদ্দেশ্য ও শিক্ষা

ইসলামের ইতিহাসে বিভিন্ন দিবসের যেমন মর্যাদা ও গুরুত্ব রয়েছে, বছরের মধ্যে তেমনি কয়েকটি রাতেরও বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব রয়েছে। এ রাতসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাশালী রাত হচ্ছে লাইলাতুল কদর ও লাইলাতুল মি'রাজ। মি'রাজ শব্দটি আরবী উরুজ শব্দ হতে উদ্ভূত। উরুজ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে উর্ধ্বে আরোহণ, মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখরে উত্তরণ, উন্নতি ও শ্রেষ্ঠতম সম্মান প্রাপ্তি ইত্যাদি। লাইলাতুল মি'রাজকে এ জন্যই মি'রাজের রাত বলা হয়। এই রাতেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস, তথা হতে

www.nagorikpathagar.org

আরশে মুয়াল্লা পর্যন্ত ভ্রমণ করেন। কোন ফেরেশতা পর্যন্ত যেখানে গমন করতে সক্ষম হন নাই এমন ঊর্ধ্বলোকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) গমন করেছিলেন বলেই এই রাতকে মি'রাজ বা ঊর্ধ্বলোকে গমনের রাত বলা হয়। এই রাতে মাটির মানুষকে আল্লাহ্র আরশ সফরের মর্যাদা দান করে মহানবী (সা)-কে সর্বোচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন বলেই এ রাতের নাম করা হয়েছে উন্নতি বা উত্থানের রাত।

সাধারণত আমরা মনে করে থাকি আল্লাহ্ তা'আলা মহানবী (সা)-কে ঊর্ধ্বলোকের বহু কিছু দেখাবার জন্য যা অন্য কাউকেও দেখান হয় নাই এই মি'রাজের ব্যবস্থা করেছিলেন। আসলে একথা ঠিক নয়। তাঁকে যে দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পণ করে ধরাধামে প্রেরণ করা হয়েছিল, সেই দায়িত্ব পালনের প্রশিক্ষণ দান করা ও দায়িত্ব পালনের উপযোগী করে গড়ে তোলাই উদ্দেশ্য। সে দায়িত্ব হচ্ছে পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্র খিলাফত প্রতিষ্ঠা করে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। এই লাইলাতুল মি'রাজের রাতেই রাব্বুল আলামিন আদর্শ-সমাজ প্রতিষ্ঠার ১৪ দফা মূলনীতি প্রদান করে মানব সভ্যতার চরম উৎকর্ষের উন্নতি উত্থানের পথনির্দেশ করেন। এ রাতেই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর মাহবুবকে দরবারে ইলাহিতে ডেকে নিয়ে কুদরতের অপরিসীম রহস্য প্রত্যক্ষ করান।

মহানবী (সা)-র জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে লাইলাতুল মি'রাজ। গভীর রাতে মক্কা মুকাররমা থেকে শুরু করে বায়তুল মুকাদ্দাস, তথা হতে সপ্তাকাশ, সিদরাতুল মুনতাহা, বেহেশত, দোযখ, আরশে মুয়াল্লা, মদীনা ইত্যাদি স্থান ভ্রমণ করে প্রভাতের পূর্বেই মক্কায় ফিরে আসাকে অনেকেই অবিশ্বাস করে থাকেন।

আজও অনেক তথাকথিত যুক্তিবাদী চরম জড়বাদে বিশ্বাসী ব্যক্তি মি'রাজকে অসম্ভব বলে মনে করেন। এমনকি পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী দর্শনে বিশ্বাসী কোন কোন মুসলিম পণ্ডিত ব্যক্তি একে শুধু মহানবী (সা)-র জীবনের একটি স্বপ্ন বলে চালিয়ে দেয়ারও অপচেষ্টা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে যুক্তির কষ্টিপাথরে একে অবিশ্বাস বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

আজকের বিজ্ঞান ও বিভিন্ন আইনের ক্ষেত্রে 'স্থগিত করণ' নীতিকে স্বীকার করে নিয়েছে। আল্লাহ্কে যদি সর্বশক্তিমান বলে মেনে নিয়ে থাকি তবে তিনি তার সময় পরিচালনার নীতিকে সাময়িকভাবে মুলতবি রেখে তার মাহবুবকে অলৌকিক সফর করিয়ে আনেন তবে এতে বিস্মিত হবার বা অবিশ্বাস্য বলে মন্তব্য করার কি যুক্তি থাকতে পারে? গাড়ির চালক যদি ইঞ্জিন স্টার্ট রেখে

www.nagorikpathagar.org

গাড়ির চাকা বন্ধ করে রাখতে পারে তবে স্বয়ং বিশ্বজাহানের মালিক রাব্বুল আলামীন কি উর্ধ্ব জগত চালু রেখে নিম্ন জগত বন্ধ করে রাখতে সক্ষম নন?

আজকের মানুষের তৈরি বিভিন্ন কৃত্রিম উপগ্রহ ও নভোযান যদি অল্প সময়ের মধ্যে কোটি কোটি মাইল অতিক্রম করতে পারে তবে রাব্বুল আলামীন তাঁর নিজ কুদরতে বুরাক জাতীয় দ্রুতগামী যানবাহনে আরোহণ করিয়ে এ বিশাল সৃষ্টি জগত সফর করিয়ে আনেন তবে তা কিছুতেই অযৌক্তিক ও অসম্ভব হতে পারে না।

অতপর যারা মি'রাজের এ বিস্ময়কর ঘটনাকে শুধু স্বাপ্নিক ঘটনা বলে চালিয়ে দিতে চায় তাদের এ দুর্বল ধারণা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়, তার কিছু প্রমাণ নিম্নে প্রদান করা হল।

১. মি'রাজ যদি শুধু স্বপ্নে প্রদর্শিত কোন ঘটনা হত তবে দেড় হাজার বছর ধরে এ নিয়ে এত আলোড়ন ও এত বিতর্কের সৃষ্টি হত না। মহানবী (সা) যদি বলতেন, আমি স্বপ্নে সপ্তাকাশ, বেহেশত, দোজখ, আরশ ভ্রমণ করেছি এবং বহু অদৃশ্য বস্তু দর্শন করেছি তবে মক্কার কুরাইশগণ তাঁকে বিদ্রূপ করত না, মিথ্যাবাদী এবং পাগল বলে আখ্যায়িত করত না। স্বপ্নে আজ আপনি ৫ মিনিটের মধ্যে সমগ্র দুনিয়া ভ্রমণ করে আসতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বপ্নে দেখেছেন বলে প্রকাশ করলে এ নিয়ে কোন বিতর্কই সৃষ্টি হত না।

২. বহু সংখ্যক সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র সশরীরে মি'রাজ অনুষ্ঠিত হবার কথা বর্ণনা করেছেন। এ বিষয়ে বর্ণনাকারীর সংখ্যা হচ্ছে ২৮ জন। তন্মধ্যে ২১ জন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র মুবারক জবান থেকে ঘটনার কথা শুনেছেন।

৩. সূরা বনী ইসরাঈলের প্রথমে বলা হয়েছে—'মহান পবিত্র সে আল্লাহ্ যিনি তাঁর বান্দাকে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত কুদরতের নিদর্শনসমূহ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নৈশ ভ্রমণ করিয়েছেন। বান্দা শব্দটি কখনও শুধু আত্মার জন্য ব্যবহার হয় না বরং দেহ ও আত্মার সমন্বিত সত্তার উপরেই ব্যবহার হয়ে থাকে। এ কারণে মি'রাজ সশরীরে অনুষ্ঠিত হবার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

৪. মি'রাজ ভ্রমণ বায়তুল্লাহ্ শরীফ হতে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত বুরাক নামক সওয়ারীতে আরোহণ করে হয়েছে। সশরীরে ভ্রমণ না হলে যানবাহনের কোন প্রশ্নই উঠে না, আত্মা কখনো যানবাহনে আরোহণ করে না।

৫. মক্কার মুশরিকগণ এ ঘটনার উপর সন্দেহ পোষণ করে রাসূলে আকরাম (সা)-কে বায়তুল মুকাদ্দাসের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করে। রাসূলে আকরাম (সা)

www.nagorikpathagar.org

তাদের প্রশ্নের উত্তর বিস্তারিত বিবরণসহ প্রদান করেন। সশরীরে না হলে প্রশ্নের বিস্তারিত বিবরণসহ উত্তর দেয়া কখনই সম্ভব হতে পারে না।

৬. কুরাইশগণ সশরীরে সফরের ঘটনায় সন্দেহ পোষণ করলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) পথিমধ্যে কুরাইশদের একটি ব্যবসায়ী কাফেলার শিবিরে অবস্থান এবং বুরাকের মত অদ্ভুত জন্তু দেখে কাফেলার উষ্ট্র রশি ছিড়ে পলায়নের ঘটনার উল্লেখ করেন। কুরাইশগণ উক্ত কাফেলার নিকট জিজ্ঞাসা করলে তারা ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে। এই সকল ঘটনার দ্বারা মি'রাজ সশরীরে সংঘটিত হয়েছিল তা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

আল্লাহ্র কুদরত প্রদর্শন

আম্বিয়ায়ে কিরাম সৃষ্টি জগতে আল্লাহ্র বিধান কার্যকরী করার ব্যাপারে আল্লাহ্র প্রেরিত প্রতিনিধি। মানুষের উপর আল্লাহ্র বিধান কার্যকরী করার ক্ষেত্রে আল্লাহ্র নিজের প্রশাসন পরিচালনার বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। তাই হিজরতের পর ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বাহ্নেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আল্লাহ্র অসীম কুদরত ও রহস্যরাজী সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভের জন্য জান্নাত, জাহান্নাম, আসমান ও আরশে ভ্রমণ করিয়ে তাঁর অসীম কুদরত ও রহস্যরাজী প্রদর্শন করান।

মি'রাজের ঘটনা সংঘটিত হবার এক বছর পরেই মহানবী (সা) মদীনায় পরিপূর্ণ ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে মি'রাজের রাতের বিস্ময়কর ঘটনার মাধ্যমে রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসূলকে বিভিন্ন বাস্তব শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে আরশে নিজের সান্নিধ্যে নিয়ে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিশেষ প্রশিক্ষণ দান করেন। প্রকৃতপক্ষে বিশেষ প্রশিক্ষণ ব্যতীত কারো উপরে কোন দায়িত্ব অর্পণ করা যায় না। যেমন দুনিয়ার প্রশাসনিক ব্যাপারে দক্ষতা অর্জনের জন্য সুপিরিয়র সার্ভিস ও সিভিল সার্ভিস-এর বিশেষ প্রতিযোগিতা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় তেমনি আল্লাহ্র বিশাল ধরিত্রীর বুকে আল্লাহ্ প্রদত্ত 'নিযামে রবুবিয়ত' তথা খোদায়ী প্রশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য রাব্বুল আলামীন বিশেষ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মি'রাজের ভ্রমণ করান।

একদিন মানুষ বেহেশত হতে এ ধুলার ধরায় নেমে আসে; এ পৃথিবীতে পাপ ও পুণ্যের মূল্যায়নের ভিত্তিতে শেষ বিচারের পর মানুষ হয় জান্নাতে আর না হয় জাহান্নামে চিরস্থায়ীভাবে প্রবেশ করবে। মানুষের এ আদি নিবাস ও চিরস্থায়ী ঠিকানা জান্নাত ও জাহান্নাম স্বচক্ষে দর্শন মানুষের পুরস্কার ও শাস্তির অভিজ্ঞতা অর্জনও মি'রাজের অন্যতম শিক্ষা।

www.nagorikpathagar.org

মি'রাজের এ গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা হচ্ছে রাব্বুল আলামীন সার্বজনীন ও চিরন্তন আদর্শের প্রতিষ্ঠাতা মহানবী (সা)-কে ইসলামী দর্শন ও ইসলামী রাষ্ট্রের মূলনীতি উপহার প্রদান করেন। কুরআনুল করীমের সূরায়ে বনী ইসরাঈলের ২২ নাম্বার আয়াত হতে ৩৭ নাম্বার আয়াত পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্রের ১৪ দফা মূলনীতি পেশ করেছেন। এই চৌদ্দ দফা মূলনীতির ভিত্তিতে যে রাষ্ট্র গঠিত হবে সেই রাষ্ট্র হবে কল্যাণ রাষ্ট্র। সেই রাষ্ট্রে পাপ ও অশান্তির কোন চোরা পথও বাকী থাকতে পারবে না। মানুষের পাপের কারণেই আসে অশান্তি। সুতরাং পাপ না থাকলে অশান্তিও থাকবে না।

চৌদ্দ দফা মূলনীতি

১. আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْٓا اِلاَّ اِيَّاهُ

আপনার প্রভুর সিদ্ধান্ত এই যে তোমরা একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত কারও দাসত্ব, আনুগত্য ও উপাসনা করবে না। সূরা বনী ইসরাঈল আয়াত ঃ ২৩

২. মাতাপিতার সাথে ব্যবহার

وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ وَّ لاَ تَنْهَرْهُمَا

وَ قُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا – وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ

صَغِيْرًا – رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا –

পিতা-মাতার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে। যদি তাদের একজন অথবা দুজনই বৃদ্ধ বয়সে বেঁচে থাকে তবে তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে, তাদের সম্মুখে উফ শব্দটা পর্যন্ত করবে না। তাদের তুচ্ছ জ্ঞান করবে না। তাদের সামনে যাবে অত্যন্ত বিনম্রভাবে ও দয়ার্দ্র চিত্তে, আর বলবে হে প্রভু তাদের সেভাবে প্রতিপালন কর যেভাবে তারা আমাদের ছোট বেলায় প্রতিপালন করেছিলেন। তোমার প্রভু তোমার অন্তরের খবর রাখেন। যদি তোমরা সৎ হয়ে যাও তবে মনে রেখ আল্লাহ্ প্রার্থনা কবুল করেন। সূরা বনী ইসরাঈল আয়াত ঃ ২৩-২৫

ব্যখ্যা ঃ পারিবারিক জীবনে সুখ-শান্তি নির্ভর করে পিতা-মাতার হুকুম মেনে চলার উপরে, তাদের অধিকার আদায় করা, তাদের বৃদ্ধাবস্থায় অত্যন্ত

www.nagorikpathagar.org

দায়িত্বানুভূতির সঙ্গে যত্ন করা এবং মনে রাখতে হবে, তারা যেরূপ কষ্ট করে তাদের সন্তানদের লালনপালন করেছেন নন্তানরাও তাদের সঙ্গে সেইরূপ ব্যবহার করবে। এই নীতির উপর নির্ভর করে পারিবারিক জীবনের সুখ-শান্তি। (বনী ইসরাঈল)

৩. পারস্পরিক সহযোগিতা ও সংবেদনশীলতা

وَاٰتِ ذَاالْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَ الْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا –

আত্মীয়-স্বজনের হক বুঝে দাও, মিসকীন ও পথিকের হক বুঝে দাও আর অন্যায়ভাবে অর্থ খরচ করো না। বনী ইসরাঈল আয়াত ঃ ২৬

ব্যাখ্যা ঃ এ আয়াতে দেশের প্রত্যেকটা নাগরিকের মানবীয় সহানুভূতির মর্যাদা রক্ষা করে চলতে বলা হয়েছে। তাদের দেখাশুনা করতে বলা হয়েছে। দেশের কোন একটি প্রাণীও যেন নিজেকে অসহায় মনে না করে, সেদিকে কড়া নজর রাখতে বলা হয়েছে। অর্থ-সম্পদ অপব্যয় করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর তা করতে হবে আল্লাহ্‌র দেয়া নির্ধারিত নিয়ম অনুসারে।

৪. অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ط وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا – وَ اِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُوْرًا

যারা বেহুদা খরচ করে তারা শয়তানের ভাই; আর শয়তান তার প্রভুর সঙ্গে বিদ্রোহকারী। তোমার প্রভুর নিকট থেকে তোমার কাছে রুজি আসা পর্যন্ত যদি তোমার অপেক্ষা করতে হয় তবে তাদের সঙ্গে অত্যন্ত বিনয়ীর ভাষায় কথা বল। (বনী ইসরাঈল ২৭-২৮)

ব্যাখ্যা ঃ ধন-সম্পদের নিরঙ্কুশ মালিকানা মানুষের নয়, আল্লাহ্‌র। কাজেই তা আল্লাহ্ যেভাবে খরচ করতে বলেছেন মানুষের তার ব্যতিক্রম করার অধিকার নেই। মানুষের আয়-ব্যয় সঞ্চয় সবই হবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা মুতাবিক। অর্থের অপচয় বন্ধ করতে হবে। নিজের আরাম-আয়েশের জন্য পাওনাদারের পাওনা বুঝে না দিয়ে নিজে আত্মসাৎ করতে পারবে না। গান-বাজনা, ফিসক ফুজুরি ও চরিত্র ধ্বংসকারী কাজে এক পয়সাও ব্যয় করার অধিকার নাই। অন্যায় অবৈধ ভোগ-বিলাস ত্যাগ করে হারাম আয়ের সমস্ত পথ বন্ধ করতে হবে। সমাজের

www.nagorikpathagar.org

প্রত্যেকটা লোকের জন্য হালাল উপার্জনের পথকে উন্মুক্ত করে দিতে হবে। চরিত্র বিধ্বংসী কাজে অর্থ ব্যয়ের প্রবণতা সমাজ থেকে নির্মূল করে দিতে হবে।

৫. অপব্যয় ও কৃপণতামুক্ত সমাজ

وَ لاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا –

তোমার হাতকে একেবারে ঘাড়ের সঙ্গে বেঁধে ফেলো না আবার একেবারে খুলে রেখ না। (অর্থাৎ) বখিলও হয়ো না অমিতব্যয়ীও হয়ো না। জেনে রেখ যারা অমিত ব্যয়কারী, তারা জীবনে একদিন পস্তাবে। (বনী ইসরাঈল ২৯)

ব্যখ্যা ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে কৃপণ হতে নিষেধ করেছেন। কারণ কৃপণের অর্থে মানবের কোন কল্যাণ হতে পারে না। তার নিজেরও কল্যাণ হয় না। বেহুদা খরচ করতেও নিষেধ করেছেন। কারণ এতে সমাজের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ধ্বংস হয়ে যায়। আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের সামঞ্জস্য বিধান করতে বলা হয়েছে, তা ব্যক্তিগত পর্যায়েই হোক আর রাষ্ট্রীয় পর্যায়েই হোক। অপব্যয়ের পথ একেবারেই বন্ধ করতে হবে। কারণ অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই। সৎভাবে উপার্জিত অর্থ সৎ ও কল্যাণজনক কাজে ব্যয় ও বিতরণের উৎসাহ প্রদান করে শোষণ মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার শিক্ষা প্রদান মি'রাজের অন্যতম অবদান।

৬. রিযিক প্রদানের নিরঙ্কুশ ইখতিয়ার আল্লাহ্র

اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَ يَقْدِرُ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا –

নিশ্চয়ই আপনার রব যার জন্যে ইচ্ছে রিয্ক বাড়িয়ে দেন, যার জন্যে ইচ্ছে কমিয়ে দেন। নিশ্চয় তিনি তার বান্দাদের ব্যাপারে খবর রাখেন ও দেখেন। (বনী ইসরাঈল ৩০)

ব্যাখ্যা ঃ রিয্ক বন্টনের ব্যাপারে আল্লাহ্ পাক যে স্বাভাবিক পার্থক্যের ব্যবস্থা করেছেন এটাকে অস্বাভাবিকভাবে সমান করা যাবে না। আল্লাহ্র বন্টন ব্যবস্থার মধ্যেই মানব জাতির সমূহ কল্যাণ নিহিত। বন্টনের যে রীতিনীতি দেওয়া হয়েছে তা মেনে চললে কেউ রাতারাতি অর্থের পাহাড় গড়তে পারবে না। আবার কেউ পথের ভিখারি হয়ে যাবে না। সকল প্রকার যুলুম ও বঞ্চনা থেকে মুক্ত থেকে ইনসাফ ভিত্তিক ও শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের ঘোষণা করাই মি'রাজের অন্যতম শিক্ষা।

www.nagorikpathagar.org

৭. মানব বংশ ধ্বংসের চেষ্টা করা জঘন্যতম পাপ

وَ لَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ط نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ اِيَّاكُمْ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا –

গরীব হয়ে যাবার ভয়ে তোমরা সন্তানদিগকে মেরে ফেলো না। আমি তোমাদেরকেও রুজি দিব তাদেরকেও রুজি দিব । নিশ্চয়ই সন্তান হত্যার কাজ খুবই গুরুতর অপরাধের কাজ। (বনী ইসরাঈল ৩১)

ব্যাখ্যা ঃ রিযকের মালিক একমাত্র আল্লাহ্, বংশ বৃদ্ধিতে কোন খাদ্য সমস্যার সৃষ্টি হয় না। এ ব্যাপারে আল্লাহ্র উপরে সম্পূর্ণ আস্থা রেখে রুজি কামানোর চেষ্টা চালাতে হবে। ইচ্ছা করলে আল্লাহ্ সমুদ্রের তলদেশ হতেও আহারের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। আল্লাহ্ যে পরিমাণ লোকের আহারের ব্যবস্থা করতে পারেন সেই পরিমাণ লোকই তিনি সৃষ্টি করবেন।

৮. নৈতিক অবক্ষয়মূলক সমাজ গঠন

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ط وَسَاءَ سَبِيْلًا –

যিনার নিকটেও যেয়ো না; অবশ্য তা অশ্লীল কাজ এবং ধ্বংসের পথ। (বনী ইসরাঈল ৩২)

ব্যাখ্যা ঃ যিনা বা ব্যভিচার অত্যন্ত জঘন্যতম অপরাধ। এ অপরাধে সমাজ অসভ্য হয়ে উঠে। কাজেই এ ধরনের পাপ যে পথের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় সেই সকল অশ্লীল পথগুলিকে বন্ধ করতেই হবে। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, অশ্লীল ছায়াছবি, নাচ-গান, সহশিক্ষা, সহগমন, নারী-পুরুষের একই কর্মক্ষেত্রে কাজ করা, মেয়েদের বেপর্দা চলাফেরা করা ইত্যাদি চরিত্র ধ্বংসকারী কাজ চিরতরে বন্ধ করতেই হবে।

৯. মানব জীবন ও সমাজের নিরাপত্তা ঘোষণা

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ط اِنَّهُ كَانَ مَنْصُوْرًا –

জাতিধর্ম নির্বিশেষে তোমরা এই আদেশ মেনে চলবে যে, কেউ কাউকেও হত্যা করবে না। কারণ মানুষের জীবন আল্লাহ্র নিকট অতি পবিত্র। তাই তিনি নর হত্যা হারাম করেছেন। কিন্তু কেউ বিচারে হত্যার উপযোগী হলে তাকে হত্যা করায় পাপ নেই বরং তাকে ছেড়ে দেয়াই পাপ। কারণ এতে

www.nagorikpathagar.org

নর হত্যার মত পাপ সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন যেন হত্যাকে অবলম্বন করে বাড়াবাড়ি না করে, কারণ আদালত তাদের পক্ষে রয়েছে। (বনী ইসরাঈল-৩৩)

ব্যাখ্যা ঃ এই আয়াতের দ্বারা নরহত্যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। গোপন হত্যা, বিনাবিচারে হত্যা বা বিচার নিজেদের হাতে তুলে নেয়ার পথকে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। একটা হত্যাকে মূলধন করে ভাল লোকদের আসামী করা অযথা লোক হয়রানির পথ। এখানে বলা হয়েছে—ন্যায় বিচার বাদী পক্ষেরই পাওনা। এবং বিচারকে উপেক্ষা করে প্রতিশোধের ছিলছিলা জারি যেন না থাকে।

১০. য়াতীমের দেখাশুনা

وَ لاَ تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلاَّ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ

কখনো য়াতীমের মাল স্পর্শ করো না কিন্তু যত সময় পর্যন্ত জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন হবার বয়সে না পড়ছে ততদিন পর্যন্ত তাদের সম্পত্তির দেখাশুনা উত্তম। (বনী ইসরাঈল-৩৪)

ব্যাখ্যা ঃ নিকট-আত্মীয়দের মধ্যে কেহ্ য়াতীম হলে তারা যতদিন বালেগ না হয়, যতদিন তারা নিজেরা দেখেশুনে সংসার চালাবার মত না হয় ততদিন পর্যন্ত তাদের ধন-সম্পত্তির এক কপর্দকও নিজে ভোগ করতে পারবে না।

১১. সর্বাবস্থায় ওয়াদা বরখেলাফ না করা

وَ اَوْفُوْا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلاً -

ওয়াদা, চুক্তি ও অঙ্গীকার পূরণ করবে। অবশ্যই চুক্তি সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে জিজ্ঞাসা করবেন। (বনী ইসরাঈল-৩৪)

ব্যাখ্যা ঃ ওয়াদা বা চুক্তি ব্যক্তিগতই হোক আর রাষ্ট্রীয় পর্যায়েরই হোক অবশ্যই তা মেনে চলতে হবে তত সময় পর্যন্ত, যত সময় অপর পক্ষ চুক্তি ভঙ্গ না করে। আর কখনো মুনাফিকীর নীতি অবলম্বন করা যাবে না।

১২. দুর্নীতিমুক্ত ব্যবসা-বাণিজ্য

وَ اَوْفُوْا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ط ذَالِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاوِيْلاً -

www.nagorikpathagar.org

যখন ওজন করবে তখন পুরা ওজন করবে ও সঠিক পাল্লায় উচিতভাবে ওজন করবে। এটাই সঠিক পদ্ধতি এবং অত্যন্ত ভাল কাজ। (বনী ইসরাঈল-৩৫)

ব্যাখ্যা ঃ ওজন করে নেয়ার সময় বেশি নেওয়া এবং দেয়ার সময় কম দেয়া কখনো উচিত নয়। এরূপ করলে উপার্জন হারাম হয়। এই অপরাধের কারণে হযরত শুয়ায়েব (আ)-এর কওম হালাক হয়েছিল।

১৩. সমাজ হতে সন্দেহ ও অমূলক ধারণা দূরীভূত করণ

وَ لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا –

যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই তার উপর অমূলক ধারণার বশবর্তী হয়ে হঠাৎ কোন কাজ করো না। নিশ্চয়ই তোমার শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টি শক্তি ও চিন্তা শক্তির ব্যবহারের ব্যাপারে তুমি আল্লাহ্‌র নিকট জিজ্ঞাসিত হবে। (বনী ইসরাঈল-৩৬)

ব্যাখ্যা ঃ অমূলক ধারণার বশবর্তী হয়ে কোন কাজ করে থাকলে তাতে কোন বিপর্যয় ঘটতে পারে। তা ছাড়া অনেক সময় শুধুমাত্র ধারণার বশবর্তী হয়ে ভাল লোকদের অযথা হয়রান করা হয়, কখনো বা শাস্তি দেয়া হয়। কখনো বা ধারণা সন্দেহকে প্রমাণ হিসাবে খাড়া করা হয়। এটা খুব দূষণীয় কাজ। মনে রাখা দরকার, এই ধরনের কাজের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। আর ওহীভিত্তিক জ্ঞান ছাড়া অন্য কোন জ্ঞানকে সঠিক বলে মনে করা যাবে না।

১৪. আত্মম্ভরিতা ও অহংকার বর্জন

وَ لَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَ لَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا –

যমীনের উপর দিয়ে কখনো গর্ব ভরে চলাফিরা করো না। তোমার গর্বে যমীন ফাটাতে পারবে না। এবং পাহাড়ের চাইতে উঁচু হতে পারবে না। (বনী ইসরাঈল-৩৭)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্‌র দুশমনদের মত দাম্ভিক হয়ো না। যমীনের উপর দিয়ে গর্বভরে চলাফেরা করা খুবই খারাপ কাজ। পূর্বে অন্যান্য জাতি যারা ধ্বংস হয়েছে তারা এই দোষেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তারা দাম্ভিক ছিল আর ছিল তাদের অন্তরে বক্রতা। তাদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্ পাক বলেছেন—তোমরা যতই দম্ভভরে চলাফেরা করো তোমাদের মাথা পাহাড়ের উপরে উঠতে পারবে

www.nagorikpathagar.org

না। এবার চিন্তা করুন যদি দুনিয়ার কোন রাষ্ট্রে এসব ধারাকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কার্যকরী করা হয় তাহলে সেই রাষ্ট্রে কোন পাপ ও অশান্তি থাকতে পারে কি?

হিজরত-পূর্ব কাজ ও মদীনায় ইসলাম প্রচার

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন কুরাইশদের সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে পড়লেন তখন আরবের অন্যান্য গোত্রের লোকদের নিকট ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলেন। হজ্জের সময় আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোক মক্কায় উপস্থিত হল, রাসূলে পাক (সা) তাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলেন। মদীনার বিখ্যাত দুই গোত্রের আবাদী ছিল, তাদের বলা হতো আউস ও খাযরাজ; তারা ইয়ামনের আদিম অধিবাসী ছিল। তারা ইয়ামনের বিখ্যাত প্লাবনের সময় ইয়ামন ছেড়ে মদীনায় চলে আসে এবং মদীনার আদিম অধিবাসী ইয়াহূদীদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের পরাজিত করে মদীনায়ই বাস করতে থাকে। তারা নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব রক্ষা করে চলত। ইয়াহূদীদের সঙ্গে মাঝে মাঝে যুদ্ধও হত। এরা মূর্তির পূজা করত। আর ইয়াহূদীরা ছিল আহলে কিতাব। তারা তওরাত কিতাব হতে রাসূলে পাক (সা)-এর আগমন সম্বন্ধে জানতে পেরেছিল। এই জন্য তারা আউস ও খাযরাজ গোত্রের লোকদের বলত, আখিরী যামানার নবীর আগমনের সময় আসন্ন। আমরা তাঁর সহায়তায় যুদ্ধ করে তোমাদের মদীনা হতে বিতাড়িত করে দিব।

আনসারদের ইসলাম গ্রহণ শুরু ঃ নবুওতের দশম বছর

এই বছর মদীনা হতে খাযরাজ গোত্রের কয়েকজন লোক হজ্জের উদ্দেশ্যে আগমন করেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের নিকট গমন করে ইসলামের দিকে আহ্বান করলেন। তারা মনে করলেন হয়ত ইনিই সেই নবী হতে পারেন যাঁর কথা ইয়াহূদীগণ বলে থাকে। এরূপ না হয়ে পড়ে ইয়াহূদীগণ আমাদের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে আমাদের পরাজিত করে মদীনা হতে বিতাড়িত করে দেয়। এই কথা চিন্তা করে মদীনা হতে আগত ছয়জন লোকই ইসলাম গ্রহণ করেন।

আকাবার প্রথম বায়'আত ঃ নবুওতের একাদশ বছর

যারা ইসলাম গ্রহণ করলেন তাঁরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে ইসলাম প্রচার করতে লাগলেন। পরবর্তী বছর আউস এবং খাযরাজ গোত্র হতে বারজন লোক মক্কায় আগমন করে ইসলাম গ্রহণ করলেন। যাকে বলা হয় বায়'আত। বায়'আতে যমরায়ে আকাবা যা মিনার নিকটে অবস্থিত ছিল সেই স্থানেই

www.nagorikpathagar.org

সংঘটিত হয়। এই জন্য এই বায়'আতকে বলা হয় আকাবার প্রথম বায়'আত। তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট আবেদন করলেন, আমাদের দেশে ইসলাম প্রচার এবং কুরআন শিক্ষা দেয়ার জন্য আমাদের সঙ্গে কাউকে মদীনায় প্রেরণ করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের আবেদন মঞ্জুর করে হযরত মাসয়াব বিন উমায়ের (রা)-কে তাঁদের সঙ্গে মদীনায় প্রেরণ করলেন। হযরত মাসয়াব (রা) মদীনায় পৌঁছে ইসলামের তবলীগ ও কুরআন শিক্ষা দিতে লাগলেন। হযরত মাসয়াবের প্রচার ও কুরআনের তালীমের দ্বারা দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলেন এবং ঘরে ঘরে আখিরী নবীর গুণ বর্ণনা হতে লাগল।

আকাবার দ্বিতীয় বায়'আত ঃ নবুওতের দ্বাদশ বছর

পরবর্তী বছর বহু সংখ্যক লোক মদীনায় আগমন করলেন। এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র সঙ্গে আকাবায় সাক্ষাত করলেন। ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাসে এই সাক্ষাতকারের অপরিসীম গুরুত্ব ছিল। এই ঘটনাই অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করে ইসলামকে বিজয়ের পথে ধাবিত করেছিল। এই ঘটনার পর বছর হজ্জ মৌসুমে মদীনা হতে মক্কায় আগত ৭৩ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

যিলহজ্জ চাঁদের দ্বাদশ তারিখ রাতে পূর্বের সেই আকাবা উপত্যকায় দ্বিতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। মদীনাবাসী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সঙ্গে করে মদীনায় নিয়ে যাবার প্রস্তাব করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সানন্দে তাদের প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে বললেন, আমি তোমাদের প্রস্তাবে সম্পূর্ণ প্রস্তুত, তবে তোমরা আমার একটি কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর। কথাটি এই ঃ তোমরা যেমন আমার হিত কামনা করছ, আমার সাহাবীদের কথা তদ্রূপ তোমাদের ভাবতে হবে। আমি সাহাবীদের শত্রুর কবলে ফেলে রেখে তোমাদের সাথে যেতে পারি না। তাদেরকেও তোমাদের আশ্রয় দিতে হবে। তাদেরকেও রক্ষা করতে হবে। তোমরা যেমন সত্যের সৈনিক সেজেছ তারাও তদ্রূপ সত্যের সৈনিক। সুতরাং তোমাদের মধ্যে আর তাদের মধ্যে কোন ব্যবধান নেই। আমার নিজের জন্য কিছুই চিন্তা করি না। সুতরাং এটুকু আশা করি, আমি যখন তোমাদের একজন হয়ে চলেছি, তখন তোমরা আমাকে তোমাদের পরিজনবর্গের একজন মনে করবে এবং তদ্রূপ ব্যবহার করবে। স্বগোত্র স্বপরিবারের কেউ যদি কোনরূপ বিপদাপন্ন হয় তবে তোমরা তাকে যেরূপ রক্ষা করার চেষ্টা করে থাক, আমার জন্যও ততটুকু করবে। আমিও তোমাদের সঙ্গে তদ্রূপই করব। তোমাদের বন্ধুকে আমি বন্ধু জানবো, তোমাদের শত্রুর শত্রু হব। সর্বোপরি তোমরা যে আল্লাহ্‌র বাণী গ্রহণ

www.nagorikpathagar.org

করলে তার মর্যাদা রক্ষা করতে সর্বদা প্রাণপণে চেষ্টা করবে এবং সেই মহাবাণী প্রচার করতে সর্বদা চেষ্টা করবে। তোমাদের কাছে এটাই আমার দাবি।

মদীনাবাসী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র কথায় উল্লসিত হয়ে একবাক্যে বলে উঠলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা প্রস্তুত আছি। জীবনে-মরণে আমরা আপনার চিরসঙ্গী হয়ে থাকব। যেকোন কঠিন প্রতিবন্ধকতা আমাদের সম্মুখে আসুক না কেন আমরা কোন অবস্থাতেই পশ্চাৎপদ হব না। আপনার জন্য, ইসলামের জন্য, আল্লাহ্র নির্দেশ পালনের জন্য আমাদের জীবন, ধন-সম্পদ সবকিছুই কুরবান করে দিব। মক্কায় আপনার যে সাহাবীবৃন্দ আছেন তাদেরও আমরা সাদরে গ্রহণ করব। ভ্রাতৃসদৃশ ভালবাসব। প্রয়োজন বোধে আমরা কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ করব। হে আল্লাহ্র নবী! আপনি আমাদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাহাবীবৃন্দের মদীনায় হিজরতের ভিত্তিমূল এভাবেই রচিত হল।

অতপর মদীনাবাসী প্রস্থান করলেন। রাসূলে মকবূল (সা) সাহাবীগণকে মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু কুরাইশগণ যখন জানতে পারল যে, মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে মদীনাবাসীর একটি গোপন চুক্তি হয়েছে এবং সেই চুক্তি অনুযায়ী তার সাহাবীগণ মক্কা ছেড়ে একে একে মদীনা যাচ্ছে, তখন তারা হিংসায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। তারা যাকে যেভাবে সম্ভব বাধা দিতে লাগল। কিন্তু ধর্মপ্রাণ মুসলিমগণ বিষয়-সম্পদ ভিটামাটি সবকিছুর মায়া পরিত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করতে লাগলেন। এমন কি রাসূলুল্লাহ্র নির্দেশে হযরত হামজা (রা), হযরত উমর (রা) প্রমুখ সাহাবীও মক্কা ছেড়ে মদীনা চলে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে মক্কায় থেকে গেলেন। তাঁর সঙ্গে থাকলেন কেবল হযরত আলী (রা) ও হযরত আবূবকর সিদ্দীক (রা)। সাহাবীগণকে সম্পূর্ণ নিরাপদ না করা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কাতেই অবস্থান করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে উল্লিখিত সাহাবীদ্বয় ব্যতীত আর কোন মুসলিম মক্কায় রইলেন না।

এ সময় মক্কার কুরাইশদের মনে একটি চিন্তার উদয় হলো—তারা এভাবে মুসলিমগণকে মক্কা ছেড়ে যেতে দিয়ে ভাল করে নাই। তাদের এই অবহেলা ও নির্বুদ্ধিতার কারণেই মদীনায় ইসলাম নব বলে বলীয়ান হয়ে দাঁড়াল। এ সময় তাদের কানে এ খবরও পৌঁছল যে, এক্ষণে মুহাম্মদ (সা)-ও মদীনায় প্রস্থানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এতে কুরাইশগণ একেবারে বিচলিত হয়ে পড়ল। যদি মুহাম্মদ (সা) মদীনায় গিয়ে তার শিষ্যবর্গের সাথে মিলিত হতে পারেন তবে যে নিশ্চয়ই সর্বনাশ!

www.nagorikpathagar.org

ইসলাম ধ্বংস করা তো গেল না, উপরন্তু মদীনায় গিয়ে মুহাম্মদ (সা) অধিক শক্তি অর্জন করবার সুযোগ লাভ করলেন। তা ছাড়া অহেতুক মদীনাবাসীও শত্রু হয়ে গেল। যার ফলে যুদ্ধ পর্যন্ত ঘটে যেতে পারে। এখন কর্তব্য স্থির করার জন্য কুরাইশগণ একটা পরামর্শ সভার আয়োজন করল। সভায় নানা ধরনের বিতর্ক চলল। কেউ কেউ বলল ঃ মুহাম্মদ (সা) মদীনায় চলে গেলেই ভাল তাহলে মক্কায় আর কোন ঝঞ্ঝাট রইল না। আবার কেউবা বলল ঃ মুহাম্মদকে যাবজ্জীবন বন্দী করে রাখা হোক। কিন্তু এসব প্রস্তাবে সবাই একমত হতে পারল না। অবশেষে কুরাইশ নেতা আবূ জেহেল দাঁড়িয়ে বলল ঃ আমি সকল দিক চিন্তা করে দেখলাম, মুহাম্মদকে হত্যা করা ব্যতীত গত্যন্তর নেই। কারণ মুহাম্মদকে হত্যা করলেই ইসলাম ধ্বংস হয়ে যাবে। ইসলামের প্রাণ শক্তির উৎসমুখ মুহাম্মদকে হত্যার মাধ্যমেই বন্ধ করা যাবে। সুতরাং আমাদের কল্যাণার্থে মুহাম্মদকে হত্যা করাই দরকার।

প্রস্তাবটি কুরাইশদের কাছে বাস্তবভিত্তিক হওয়ায় তা সকলেরই মনঃপূত হল। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল কে হত্যা করবে—এই ব্যাপার নিয়ে। ব্যক্তিগতভাবে কেউ হত্যা করলে বনু হাশিম ও বনূ আবদুল মুত্তালিবদের কাছে যে সে চিরদিন শত্রু হয়ে থাকবে, যখন তখন হয়তো তার বিপদ ঘটে যাবে। সুতরাং কেউই এই কাজের জিম্মা নিতে চাইল না। অবস্থা বুঝে আবূ জেহেল পুনরায় প্রস্তাব করল, প্রতিটি গোত্র হতে একজন করে লোক নির্বাচন করা হোক। নির্বাচিত ব্যক্তিগণ মিলিত হয়ে একযোগে কার্য সমাধা করবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র মদীনায় হিজরত

সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি গৃহীত হল। সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচন কার্যও সমাপ্ত হল। সাব্যস্ত হল গভীর রাতে তারা সকলে মুহাম্মদ (সা)-এর গৃহ ঘেরাও করে তাকে বন্দী করবে। কুরাইশদের এই গোপন ষড়যন্ত্র যাতে বাইরে প্রকাশ না হয় তজ্জন্য যথাসম্ভব গোপনীয়তা রক্ষা করা হল। কিন্তু গায়েবের মালিক আল্লাহ্ যাঁর সহায় আছেন তাঁর বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র কি করতে পারে ? আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হতে জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কাফিরদের সমস্ত সংবাদ অবগত করালেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুরাইশদের এই ভীষণ ষড়যন্ত্রের কথা অবগত হয়ে মক্কা ত্যাগ করতে প্রস্তুত হলেন। আলী (রা)-কে ডেকে এনে কর্তব্য সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়ে অতি সংগোপনে কাফিরদের চোখে ধুলা দিয়ে ঘর হতে বের হয়ে আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর গৃহে উপস্থিত হলেন।

www.nagorikpathagar.org

গভীর রাতে আবূ বকর (রা)-এর গৃহে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখে আয়িশা ও আসমা (রা) বিস্মিত হলেন। শব্দ শুনে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বের হয়ে আসলেন এবং তিনি বিস্মিত হলেন। আবূ বকর সিদ্দীক (রা) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আল্লাহ্‌র রাসূল এত গভীর রাতে আপনি এখানে, নিশ্চয়ই কিছু অঘটন ঘটেছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আল্লাহ্ আমাকে মক্কা ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর আপনি হবেন আমার সফর সঙ্গী। কিছু সময় পরেই তাঁরা বের হয়ে পড়লেন এবং রাতের অন্ধকারে তাঁরা যাত্রা করলেন মদীনার পানে। এদিকে আবূ জেহেল ও নির্বাচিত কুরাইশগণ অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নির্ধারিত সময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র গৃহ অবরোধ করে ফেলল। হযরত আলী (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নির্দেশে তাঁর বিছানো শয্যায় নিঃশঙ্কচিত্তে শয়ন করে রইলেন। মহানবী (সা) যে গৃহ মধ্যে নেই তা কুরাইশগণ মোটেই টের পেল না। শয়নাগার হতে মুহাম্মদ (সা)-কে বন্দী করে নিয়ে গিয়ে প্রত্যূষে সর্ব সমক্ষে হত্যা করবে এটাই ছিল তাদের সংকল্প।

আবূ জেহেল সবাইকে হুঁশিয়ার করে উৎসাহ যোগাতে ছিল ঃ খবরদার তোমরা চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করবে। দেখ যেন কোন প্রকারেই শিকার হাত ছাড়া হয়ে যেতে না পারে। আজ আমরা আরবের কন্টক চিরদিনের জন্য দূর করে ছাড়ব। হে কুরাইশ বীরগণ! আমি তোমাদের সম্মুখে লাত, ওজ্জা ও হুবলের শপথ করে বলছি, আমি আত্মীয় বলে আজ তাকে একটুও ক্ষমা করব না, অন্য কাকেও দয়া দেখাবার জন্য অনুরোধও করব না। তোমরাও তার প্রতি সামান্য অনুগ্রহ দেখাবার কথা অন্তরে স্থান দিও না। যাও সকলে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করে মুহাম্মদকে লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ কর। কেউ এই মুহূর্তে তাকে হত্যা করো না। প্রভাতে প্রকাশ্যে সর্বসমক্ষে তাকে হত্যা করব। তাতে কারও অন্তরে যদি মুহাম্মদ-এর ধর্মের প্রতি গোপনে কিছুটা আকর্ষণ সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে তার এই শোচনীয় পরিণতি দেখে তা তিরোহিত হবে।

আবূ জেহেলের উপদেশ অনুযায়ী কুরাইশ যুবকগণ সবদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে একে একে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করল। গৃহ মধ্যে প্রবেশ করে তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র শয্যার চতুস্পার্শ্ব ঘিরে দাঁড়াল। শয্যার উপরে হযরত আলী (রা) নির্বিকারভাবে চাদরাবৃত হয়ে শুয়ে রয়েছেন। আবূ জেহেল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে লক্ষ্য করে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে করতে শয্যাস্থানের নিকটস্থ হয়ে এক টানে আলী (রা)-র উপর হতে চাদরখানি সরিয়ে ফেলল। কিন্তু সরিয়ে ফেলে এত বেশি আশ্চর্যান্বিত হল, মানুষ সহসা ভূত দেখেও অতখানি আশ্চর্যান্বিত

www.nagorikpathagar.org

হয় না। চক্ষু রগড়িয়ে সে ভাল করে তাকিয়ে দেখল। ভয়ানক লজ্জার ব্যাপার। এযে মুহাম্মদ (সা)-এর শয্যায় হযরত আলী (রা) শুয়ে আছেন। কুরাইশদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। এত সতর্কতা ও সাবধানতা সত্ত্বেও মুহাম্মদ (সা) সকলের চক্ষে ধুলা দিয়ে নির্বিঘ্নে আত্মগোপন করেছে। সকলের ক্রোধ গিয়ে পড়ল হযরত আলী (রা)-র উপর। তারা তাকেই হত্যা করতে উদ্যত হল। কিন্তু আবূ জেহেল ভাবল তাতে একটা নতুন গোলমালের সৃষ্টি হবার আশংকা। সুতরাং সকলকে বাধা দিয়ে হযরত আলী (রা)-কে লক্ষ্য করে বলল, বল দুরাচার মুহাম্মদ কোথায় ?

হযরত আলী (রা) সামান্যমাত্র ভীত না হয়ে যেমন নির্বিকারভাবে শায়িত ছিলেন, তেমনি নিঃশঙ্ক চিত্তে উত্তর দিলেন, তা আমি কি জানি! তিনি আল্লাহ্র নবী, আল্লাহ্ তাঁকে যখন যেরূপ নির্দেশ দেন, তিনি তদ্রূপ কাজ করেন। তাঁর আদেশ অনুসারেই আমি তাঁর শয্যায় শায়িত হয়েছি। এই বলে আলী (রা) বিনাদ্বিধায় গৃহ হতে বের হয়ে গেলেন।

আবূ জেহেল দেখল, আলীর নিকট হতে কোন সন্ধান মিলবে না। অনর্থক তার সাথে কথা কাটিকাটি করে কোন লাভ নেই। বরং মুহূর্ত বিলম্ব না করে মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসন্ধান করাই বেশি প্রয়োজন। কুরাইশগণ তৎক্ষণাৎ গৃহ হতে বের হয়ে গেল।

তারা মুহাম্মদ (সা)-এর গৃহ হতে বের হয়ে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর বাসভবনের দরজায় গিয়ে করাঘাত করল। আয়িশা ও আসমা (রা) দরজা খুলে দিলেন। হুড়মুড় করে কুরাইশ ঘাতক দল গৃহে প্রবেশ করল। তারা বাসভবনের চতুর্দিকে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোথাও রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং হযরত আবূ বকরের সন্ধান পেল না। তারা আয়িশা ও আসমার নিকট জিজ্ঞাসা করল, মুহাম্মদ (সা) ও আবূ বকর (রা) কোথায় ? দুজনই জবাব দিলেন তাঁরা বাড়িতে নেই। আবূ জেহেল আসমার ঘাড় ধরে গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, তোমার আব্বা কোথায় ? আসমা নির্ভীকভাবে জবাব দিলেন, আমি জানি না।

মক্কার পথে পথে অলিতে গলিতে নকীবগণ ঘোষণা করে দিল ঃ আমাদের প্রধান দুশমন মুহাম্মদ ও আবূ বকর পালিয়েছে। তাদেরকে যে বা যারা ধরে দিতে পারবে—জীবিত অথবা মৃত তাকে বা তাদেরকে কা'বা গৃহে রক্ষিত দেব-দেবীর পক্ষ হতে এক শত উট পুরস্কার দেয়া হবে। আরবের প্রত্যেক সাহসী পুরুষকে এই পুরস্কার লাভের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবার আহবান জানানো হচ্ছে।

আরব ভূখণ্ডের সর্বত্রই প্রচারিত হল এই লোভনীয় পুরস্কারের সংবাদ। চতুর্দিকে ঘাতকদল বের হয়ে পড়ল সত্যপন্থী দুইজন নিরস্ত্র মানুষের সন্ধানে।

www.nagorikpathagar.org

সওর পর্বতের এক গুহায় আশ্রয় নিয়েছেন মহানবী (সা) ও আবূ বকর সিদ্দীক (রা)। জনমানবহীন গুহায় তাঁদের রাতদিন কেটে যেতে লাগল। আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর পুত্র আবদুল্লাহ্ তাদের গুপ্তচর হয়ে কাজ করছেন। তিনি চোখের অন্তরালে রাতে গুহায় এসে জানিয়ে যান বাইরের জগতের খবরাখবর, কুরাইশদের তৎপরতার কথা।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ক্রীতদাস আমর ইবনে ফুহায়রা ইসলাম গ্রহণের পর এখন আযাদ মানুষ। আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ছাগল ও মেষ চরাবার কাজ নিয়েছেন তিনি। ছাগল ও মেষ চরাতে চরাতে রাতের দিকে গুহার নিকটে আসেন, ছাগল ও মেষের দুধ দিয়ে যান গুহায় আশ্রিত রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে। দুধ পান করেই তাঁদের ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়, তা ছাড়া সঙ্গে করে তিন দিনের খাবারও এনেছিলেন।

উমাইয়া বের হয়েছে তাঁদের সন্ধানে। পায়ের চিহ্ন ধরে সে তার দলবল নিয়ে উপস্থিত হয় সওর পর্বতের সেই নির্জন গুহার কাছে। সে ধারণা করল এই নির্জন গুহায়ই আশ্রয় নিচ্ছেন ইয়াসরিবগামী দু'জন পথিক। পায়ের চিহ্ন ধরে সে গুহায় প্রবেশ পথও আবিষ্কার করে ফেলল। এই গুহাতে কেউ লুকিয়ে থাকতে পারে কিনা তা নিয়ে তাদের মধ্যে তর্কবিতর্ক শুরু হল।

গুহার বাইরে শত্রুদের আগমনের শব্দ শুনে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ভীত হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন ঃ শত্রুরা আমাদের দেখে ফেলেছে, আমি তাদের সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ ভীত হবেন না, আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন। মহানবী (সা) আবৃত্তি করেন, "এবং স্মরণ কর যখন কাফিররা তোমাকে বন্দী করার অথবা নির্বাসন দেয়ার ষড়যন্ত্র করছিল, তারা প্রতারণা করছিল, আল্লাহ্ও কৌশল করছিলেন এবং আল্লাহ্ই শ্রেষ্ঠতম কৌশলী।

যে গুহার মধ্যে প্রবেশ করছিল সে আতংকে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল ঃ সাপ সাপ। উমাইয়া বার হতে বলল ঃ সাবধান গুহার মধ্যে বিষধর সর্প থাকতে পারে। সে বলল, এমন বিপজ্জনক স্থানে তাঁরা থাকতে পারে না। লুকাবার ইচ্ছা থাকলে মক্কায় তার লুকাবার জায়গার অভাব ছিল না। মরার জন্য এমন বিপজ্জনক গুহায় কেউ আসতে পারে না। উমাইয়া গুহার প্রবেশদ্বার পরীক্ষা করে দেখল, গুহার মুখেই মাকড়সার জাল। মাঝখানে ঝোপ, তার উপরে কবুতরের বাসা ও তার মধ্যে ডিম। উমাইয়া বিরক্তি ভরে বলল, মাকড়সার জাল, কবুতরের বাসা ও ডিম দেখেও কি বুঝতে পার না যে এর মধ্যে কোন লোক থাকতে পারে না। চল অন্যত্র খুঁজে দেখি। কুরাইশগণ অন্যত্র চলে গেল।

www.nagorikpathagar.org

সোমবার সকাল। তাঁরা গুহা হতে বের হয়ে আসলেন। তাঁরা জানতে পেরেছেন কুরাইশগণ এ পথে অনুসন্ধানের কাজ বন্ধ করেছে। তিনদিন তিন রাত গুহায় অবস্থানের পর এই প্রথম তাঁরা মুক্ত আকাশের নিচে এসে দাঁড়ালেন। সঙ্গে তাঁর তিনজন সফর সঙ্গী আবূ বকর, আমর, আবদুল্লাহ ইবনে উরিকাত। হযরত আবু বকর (রা)-এর কন্যারা খাবার পাঠিয়ে দিয়েছেন। তিনটি উষ্ট্র দাঁড়িয়ে আছে। এর মধ্যে দু'টি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) দূরের পথ অতিক্রম করবার জন্য পূর্ব হতেই খরিদ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এ উষ্ট্র কার? আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বললেন ঃ আমি কিনেছি। এর একটির উপর আপনি আরোহণ করুন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঃ দান হিসেবে আপনি আমাকে দিতে চান?

আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ঃ তাই মনে করুন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঃ না তা হয় না। দানের উষ্ট্রে আমি আরোহণ করতে পারি না।

আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ঃ আল্লাহ্‌র রাসূল! বর্তমান পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে আপনি এটা গ্রহণ করুন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঃ তা হয় না, আমি আপনাদের নেতা ও পরিচালক। সর্ব প্রকার লোভ-লালসা থেকে আমাকে থাকতে হবে মুক্ত। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় এটার আমার খুবই প্রয়োজন, এজন্য আমি প্রস্তাব করছি এই উষ্ট্র আপনি আমার নিকট বিক্রয় করুন।

আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ঃ আল্লাহ্‌র নবী আপনি যা ভাল মনে করেন তাই করুন। মহানবী (সা) উষ্ট্রের পৃষ্ঠে আরোহণ করলেন। তিনি তাকালেন তাঁর জন্মভূমির দিকে। বেদনা জড়িত কণ্ঠে বললেন ঃ হে আমার জন্মভূমি মক্কা, পৃথিবীতে আমার সব চাইতে প্রিয় স্থান। তুমি, তোমার সন্তানেরা আমাকে থাকতে দিল না, তাই আমি তোমাকে ছেড়ে চললাম। তোমার অধিবাসীরা আমাকে বিতাড়িত না করলে আমি কখনোই তোমাকে ত্যাগ করতাম না। অতঃপর তিনি আবৃত্তি করলেন ঃ যিনি আপনার উপর কুরআন অবতীর্ণ করেছেন তিনি আপনাকে আবার মক্কায় ফিরিয়ে আনবেন।

অতপর মহানবী (সা) সওর পর্বতের গুহা হতে বের হয়ে প্রিয় সহচর আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করেছেন ইয়াসরিবের পানে—নতুন পৃথিবীর উদ্দেশে। এদিকে কুরাইশগণের ঘোষিত পুরস্কারের লোভে দলে দলে লোক বের হয়ে পড়ল মহানবী (সা) ও আবূ বকর (রা)-এর সন্ধানে ইয়াসরিবের পথে। সত্যপন্থীদের এই কাফেলা যখন সকালে রাবিই নামক স্থান হতে বিদায়

www.nagorikpathagar.org

নিয়ে সমুদ্র উপকূল ধরে চলছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে সুরাকা বিন মালিক জা'শান দূর হতে তাঁদেরকে দেখতে পেয়ে ঘোড়া সেদিকে ছুটালো। তার ঘোড়া পাথরে হোঁচট খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

সে তীর নিক্ষেপ করে ভাগ্য পরীক্ষা করল এই পুরস্কার সে লাভ করতে পারবে কি না। জবাব পেল ঃ না। কিন্তু তবুও সে পিছু না হটে আবার ঘোড়া ছুটাল, নিকটে গিয়ে শুনতে পেল রাসূলুল্লাহ্ (সা) একাগ্রচিত্তে কুরআন আবৃত্তি করে চলেছেন, কোন দিকে তাঁর খেয়াল নেই। সে যখন তার হস্তস্থিত বর্শা উত্তোলন করল, তখন তার ঘোড়ার সম্মুখের পা দুটি বালিতে প্রোথিত হয়ে গেল। সে পুনরায় তীর নিক্ষেপ করে পরীক্ষা করল এবং পূর্বের ন্যায়ই না জবাব পেল। ভয়ে তার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল, সে ভীত বিহ্বল হয়ে পড়ল, তার আর সংশয় রইল না যে মহানবী (সা)-র জয় সুনিশ্চিত। সে চিৎকার করে ডাকল ঃ হে মদীনার অভিযাত্রীদল, একটু থামুন, আমি সুরাকা। আমার কিছু বক্তব্য আছে আপনাদের কোন ভয় নেই। সে মহানবী (সা)-র নিকট কুরাইশদের ঘোষণার কথা বলে তার অপরাধ স্বীকার করল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তার খাবার ও অস্ত্র দিতে চাইল, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা গ্রহণ করলেন না। সে মহানবী (সা)-কে প্রতিশ্রুতি দিল—আমি কাউকেও আপনার অনিষ্ট করতে দিব না, পথে কারও সঙ্গে সাক্ষাত হলে তাকে ফিরিয়ে দিব। মহানবী (সা)-র এই ক্ষুদ্র কাফেলাটি দিগন্ত প্রসারিত মরুপথ ধরে ইয়াসরিবের পানে অগ্রসর হতে লাগল।

উম্মে মা'বাদের তাঁবুতে অবস্থান

মদীনা গমনের পথে বনি খুজাআ গোত্রের এক মহিলা উম্মে মা'বাদ তাঁবুতে বাস করতেন। মেহমানদারীতে তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। মহানবী (সা) কাফেলাসহ তার তাঁবুতে উপস্থিত হয়ে তার কাছে খাবার চাইলেন। এই সময়ে তার নিকটে কোন খাবারই ছিল না। একটা দুর্বল বকরি দেখে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ সে দুধ দেয় কিনা ? উম্মে মা'বাদ বললেন ঃ সে আর এখন দুধ দেয় না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বকরিটি দোহন করবার অনুমতি চাইলেন। উম্মে মা'বাদ তাজ্জব হয়ে বললেন, ওর তো এখন আর দুধ নেই। মহানবী (সা) বিসমিল্লাহ বলে বকরির শুষ্ক বাটে হাত দিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য, বকরিটি দুগ্ধবতী হয়ে গেল। বকরির দুধে তার গৃহের সমস্ত পাত্র ভর্তি হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সঙ্গীদের নিয়ে পরিতৃপ্তি সহকারে দুধ পান করলেন। এরপর গন্তব্য স্থানের দিকে যাত্রা করলেন। উম্মে মা'বাদের স্বামী বাড়ি আসলে

www.nagorikpathagar.org

আগন্তুকের চেহারার বর্ণনা দিয়ে এই আশ্চর্য ঘটনার কথা শুনালেন। স্বামী তার সমস্ত ঘটনা শুনে বললেন ঃ মক্কার যে লোকটির আবির্ভাবের কথা লোকে বলে থাকে এবং যিনি নিজেকে আল্লাহ্‌র নবী বলে দাবি করেন, এই লোকটি নিশ্চয়ই সেই লোক। আমি যদি তাঁর সাক্ষাত পেতাম তবে নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গে যাত্রা করতাম।

এদিকে আসলাম গোত্রের নেতা বারিদা আসলামী কুরাইশদের ঘোষিত পুরস্কারের আশায় তার সত্তরজন অনুচর নিয়ে মহানবী (সা)-র সন্ধানে ফিরছিল। সে কাফেলা দেখতে পেয়ে তার সত্তরজন সঙ্গী নিয়ে নিকটে গেল। কাছে গিয়ে দেখতে পেল রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পূর্ণ নির্ভীক চিত্তে এবং সুললিত কণ্ঠে কুরআন আবৃত্তি করছেন। সে ভীত ও লজ্জিত হল এবং তার সত্তরজন সঙ্গীসহ মহানবী (সা)-র প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মধুর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ পথিক তুমি কে? কি চাও? পথিক বলল ঃ আমি বারিদা, আসলাম গোত্রের গোত্রপতি। পথিক জিজ্ঞাসা করল ঃ 'আপনি কে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আমি মক্কার অধিবাসী, আবদুল্লাহ্‌র পুত্র মুহাম্মদ, আল্লাহ্‌র নবী। তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র মুবারক মুখের দিকে তাকিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ল। পাষাণ হৃদয় দস্যুর পাষাণ-প্রাণ গলে গেল। মুবারক হস্তে হস্ত স্থাপন করে সত্তরজন দস্যু মুখে উচ্চারণ করল, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)।" এবার তারা মুহাম্মদ (সা)-এর সফরসঙ্গী অগ্রগামী বাহিনীর ন্যায় নিষ্কোষিত তরবারি উঁচু করে পথপ্রদর্শকরূপে অগ্রে অগ্রে গমন করতে লাগলেন। এবং ঘোষণা করতে লাগলেন ঃ শান্তির রাজা আসছেন, মুক্তির দিশারী আসছেন, মর্ত্যের বুকে ন্যায় ও ইনসাফের প্রতিষ্ঠাতা ও স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠাকারী আগমন করছেন।

মদীনাবাসীর সংবর্ধনা

মদীনার আনসারগণ পূর্ব হতেই জানতে পেরেছিলেন যে, মহানবী (সা) মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় যাত্রা করেছেন। এজন্য তারা প্রতিদিন প্রত্যূষে শহর ছেড়ে সূর্য কিরণ প্রখর না হওয়া পর্যন্ত পথের মাঝে অপেক্ষা করতেন। এভাবে বারই রবিউল আউয়াল সোমবার সূর্যকিরণ প্রখর হবার পর তারা ঘরে ফিরছিলেন, ঠিক এই মুহূর্তে একজন ইয়াহূদী দেখতে পেল মহানবী (সা)-র কাফেলা মদীনার দিকে আগমন করছে। তখন সে চিৎকার করে বলে উঠল, হে মুসলমানেরা! তোমাদের বাঞ্ছিত ব্যক্তি আগমন করছেন। তোমরা যাঁর জন্য অপেক্ষা করে থাক। সঙ্গে সঙ্গে আমর ইবনে আওফ

www.nagorikpathagar.org

তকবীর ধ্বনি দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সমবেত মুসলমানের তকবীর ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত ও কম্পিত হয়ে উঠল। সমগ্র মদীনা শহরে খুশীর বন্যা বয়ে গেল।

হযরত আলী (রা)-র হিজরত

যখন শত্রুগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র গৃহ হতে বের হয়ে গেল, তখন হযরত আলী (রা) খুবই চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হলেন। কারণ শত্রুগণ যদি কোন প্রকারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র সন্ধান পায় তবে যে সর্বনাশ ঘটবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই নিদারুণ আশঙ্কা এবং উদ্বেগে হযরত আলী (রা)-র চোখে আর নিদ্রা এল না। তিনি গৃহমধ্যে জেগে জেগে শুধু আল্লাহ্কে ডাকতে লাগলেন। প্রায় অর্ধরাত এভাবে গভীর উদ্বেগাকুল চিত্তে কাটিয়ে অতি প্রত্যূষে উঠে ওযূ করত নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। হৃদয় মধ্যে তাঁর হাহাকার জেগে উঠল। নবীর শূন্যতা তার বক্ষে শেলের মত বিদ্ধ হতে লাগল। প্রতিদিন নবীর পিছনে জামায়াতে নামায আদায় করতেন। কিন্তু আজ তিনি একাকী নামাযে দাঁড়িয়েছেন। তিনি জানেন না, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এখন কোথায় কি অবস্থায় আছেন। আল্লাহ্র দরবারে আকুল ক্রন্দন এবং নবীর জন্য নিরাপত্তা কামনায় শত-সহস্র মুনাজাত দ্বারা নামায সমাপ্ত করলেন। তাঁর মন কিছুতেই ধৈর্য মানছিল না। না জানি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র কোন বিপদ ঘটেছে ? তিনি নিরাপদে আছেন কিনা ? এই চিন্তা আলী (রা)-কে অস্থির করে তুলল। মক্কায় তার আর এক মুহূর্তও অবস্থান করতে মন চাচ্ছিল না।

তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নির্দেশিত কর্তব্যগুলি সম্পাদন করতে তিনি তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হলেন। কর্তব্যগুলির মধ্যে একটি বিশেষ কর্তব্য ছিল এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র ধর্মের প্রতি আস্থা স্থাপন না করলেও মক্কার কাফির মুশরিকরা তাঁর বিশ্বস্ততা ও নির্ভরশীলতার উপর সীমাহীন আস্থা পোষণ করত। এজন্য অনেকেই তাদের ধন ও সম্পদ, মূল্যবান দ্রব্যসম্ভার তাঁর নিকট আমানত রেখেছিল। এ সকল দ্রব্য যার যার কাছে ফেরত দেয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আলী (রা)-কে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। চিন্তা করার কথাই বটে, যাদের ভয়ে প্রাণ নিয়ে মাতৃভূমির মায়া কাটিয়ে অতি সংগোপনে বিদেশে পালিয়ে যাচ্ছেন তাদের আমানতী দ্রব্য ফেরত দেয়ার জন্য স্বীয় প্রিয়তম সহচরকে নির্দেশ দিয়ে গেলেন। ধন্য মহানবীর বিশ্বস্ততা। এমন নজীর দুনিয়ার ইতিহাসে আর কোথাও মিলবে কি ?

www.nagorikpathagar.org

যা হোক, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নির্দেশ মত হযরত আলী (রা) স্বীয় কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করলেন। যার যা আমানত ছিল সঠিকভাবে প্রত্যর্পণ করত হযরত আলী (রা) অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র সন্ধানে বের হলেন। এদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সরাসরি মদীনায় না গিয়ে মদীনার উপকণ্ঠ কুবায় অবস্থান করছিলেন।

হযরত আলী (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র সান্নিধ্য হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাগলপারা হয়ে পড়েছিলেন। উদ্ভ্রান্তের মত এদিকে সেদিকে খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও তাঁর সন্ধান না পেয়ে অবশেষে মদীনার পথে যাত্রা করলেন। অনেকে তাঁকে ধৈর্যধারণ করার জন্য নানাভাবে প্রবোধ দিল এবং মক্কায় অবস্থান করবার জন্য অনুরোধ-উপরোধও করতে লাগল। কিন্তু কারও কথায় কর্ণপাত না করে রাসূলপ্রিয় হযরত আলী (রা) দ্রুত মদীনা অভিমুখে ধাবিত হলেন। পথে কোথাও না থেমে শ্রান্তি-ক্লান্তির দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে দিবারাত্রি একইভাবে চলে অতি কষ্টে কুবায় উপস্থিত হলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র সঙ্গে সাক্ষাত করে প্রাণ জুড়ালেন।

হিজরতের পর প্রথম কাজ

পূর্বেই বলা হয়েছে রাসূলে পাক (সা) মক্কা হতে হিজরত করে সোজা মদীনায় না পৌছে প্রথমে তিনি কুবায় পৌছেন এবং সেখানে তিনি কয়েকদিন অবস্থান করলেন। মদীনা হতে মাত্র তিন মাইল দক্ষিণে কুবা পল্লীতে অবস্থিত এটা একটি পার্বত্য উপত্যকা। পল্লীটির প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম ও মনোমুগ্ধকর। আসলে এই স্থানটি মদীনাবাসীর স্বাস্থ্য নিবাস। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছয় শত বাইশ খৃস্টাব্দের উনত্রিশে সেপ্টেম্বর মক্কা ত্যাগ করে এই পল্লীতে উপস্থিত হন। এখানে তিনি বার দিন অবস্থান করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র কুবায় পৌছার তিনদিন পর আলী (রা) কুবায় এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র সঙ্গে মিলিত হলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রিয় আলীকে কাছে পেয়ে যারপরনাই আনন্দিত হলেন। কারণ তিনি আলী (রা)-কে যে ভীষণ আশঙ্কাজনক পরিস্থিতি ও বিপদের মধ্যে রেখে গিয়েছিলেন, তা পাঠকবর্গের অবশ্যই স্মরণ আছে। সেই বিপদ অতিক্রম করে নির্বিঘ্নে কুবায় উপস্থিতি সত্যই খুশির কারণ। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র মনে খুশির বন্যা বয়ে গেল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুবায় অবস্থানকালে জামায়াতে নামায পড়ার জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করলেন। এর নির্মাণ কার্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বয়ং

www.nagorikpathagar.org

অংশগ্রহণ করেছিলেন। স্বীয় স্কন্ধে পাথর বহন করে এনে যে শ্রমের মর্যাদা প্রদর্শন করেছিলেন তা আজকার শ্রমবিমুখ সৌখিন ও অলস নেতাদের জন্য সত্যই এক শিক্ষণীয় আদর্শ হয়ে রয়েছে। এ থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করবেন কি ?

অতপর মুসলমানগণ এই মসজিদে নিয়মিত নামায আদায় ও নিয়মিত ইবাদত-বন্দেগী করতে লাগলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র মদীনায় প্রবেশ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) কূবায় বারদিন অবস্থান করার পর মদীনায় প্রবেশের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ঐ দিনটি জুমার দিন ছিল। পথে বনি সালেম মহল্লায় জুমার নামায আদায় করলেন। হিজরতের পরে এটাই প্রথম জুমার নামায। নামাযের প্রথমে খুতবা দিলেন। খুতবা এত চিত্তাকর্ষক ছিল, যে শুনল সে-ই ইসলামের এবং আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলের মহব্বতে ডুবে গেল। নামায সমাপনান্তে আবার যাত্রা করলেন। মহানবী (সা)-কে সংবর্ধনা জানাবার জন্য মদীনাবাসী প্রত্যেকেই নিজ নিজ গৃহ ছেড়ে রাস্তায় এসে পথের দুই পার্শ্বে দাঁড়িয়ে সালাম করছিলেন এবং বলছিলেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! এই বাড়ি এই ঘর সবই আপনার। আর আমরাও আপনার। মহানবী (সা) সন্তুষ্ট চিত্তে আল্লাহ্র শোকর আদায় করছিলেন এবং সকলের জন্য দুয়া-খায়ের করতে করতে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। মদীনাবাসীর প্রত্যেকের ইচ্ছা আল্লাহ্র রাসলূকে তার নিজের গৃহে নিয়ে যায়। তাই তারা উষ্ট্রীর রশি ধরে টানতে লাগলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এমতাবস্থায় এক মহাসঙ্কটে পড়লেন। কারণ একজনকে সন্তুষ্ট করলে আর দশজন হয় অসন্তুষ্ট। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তোমরা উষ্ট্রীর রশি ছেড়ে দাও তাকে চলতে দাও যেখানে আল্লাহ্র মঞ্জুর হবে সে সেখানেই থেমে যাবে। উষ্ট্রী বনু নাজ্জার মহল্লার আবূ আইয়ুবের বাড়ির সম্মুখে পৌঁছে থেমে গেল। আবূ আইয়ূব বিখ্যাত ইয়াহূদী পণ্ডিত শামুয়েলের একবিংশ অধস্তন পুরুষ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ আইয়ূবের গৃহে পদার্পণ করার পর হযরত আবূ আইয়ুব রাজা তিব্বার চর্ম লিপিখানি মহানবী (সা)-র হস্তে অর্পণ করলেন।

রাজা তিব্বা মহানবী (সা)-র নিমিত্ত মদীনায় যে সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করে পণ্ডিতপ্রধান শামুয়েলের নিকট গচ্ছিত রাখেন হযরত আবূ আইয়ূব সপরিবারে সেই প্রাসাদেই বাস করছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

মদীনার পূর্ব নাম

মদীনার প্রথম নাম ছিল ইয়াসরিব। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র আগমনের পর ইয়াসরিবের নাম হয় মদীনাতুন্নবী অর্থাৎ নবীর শহর। এই তারিখের পর হতেই ইয়াসরিব মদীনা নামেই প্রসিদ্ধ হয়।

আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন

মক্কা হতে যে সমস্ত মুসলিম মদীনায় হিজরত করে আসলেন তারা প্রায় সকলেই কপর্দকশূন্য নিঃস্ব অবস্থায়ই এসেছিলেন। কারণ কতকতো মক্কায়ই দরিদ্র জীবন যাপন করতেন আর যারা সচ্ছল ও বিত্তবান ছিলেন তারাও কিছুই সঙ্গে করে আনতে পারেন নি। ধন-দৌলত, দ্রব্যসামগ্রী ফেলে এসেছেন। সুতরাং মদীনায় আসার পরে তাদের ভরণ-পোষণ কিভাবে চলবে তা একটি প্রধান বিষয়রূপে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র সম্মুখে দেখা দিল। অতএব তিনি মদীনায় পৌঁছেই এই বাস্তব সমস্যাটির সমাধানে মনোনিবেশ করলেন। প্রথমেই আনসারদের কথা উল্লেখ করতে হয়। আনসার অর্থাৎ সাহায্যকারী। এরা সত্যিকারভাবেই সাহায্য করেছিলেন। আশ্রয় লাভের আশায় মক্কা হতে আগত রিক্ত মুসলিমগণকে মদীনার আনসারগণ সেদিন যে সহৃদয়তা প্রদর্শন করেছিলেন, মানব জাতির ইতিহাসে তার তুলনা পাওয়া দুষ্কর।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) পরিষ্কার উপলব্ধি করলেন যে, মুহাজিরদের খাওয়া-পরা থাকার ব্যাপারে স্বাবলম্বী হতে কিছুটা সময়ের প্রয়োজন। এই অন্তর্বর্তীকালীন সময়টিতে তাদের আনসারদের সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হবে। সুতরাং মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে এমন একটি সম্পর্ক স্থাপন করা প্রয়োজন যার ফলে আনসারগণ যেন মুহাজিরগণকে আপন ভেবে নিসংকোচে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাহায্য করে। অপর পক্ষে মুহাজিরগণও যেন আনসারগণকে আপন ভেবে তাদের সাহায্য গ্রহণ করতে সক্ষম হয়।

এরূপ ব্যবস্থা করার জন্য একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) আনসার মুহাজির উভয়কে একত্র করত ঘোষণা করলেন ঃ তোমরা জেনো, মুসলমানগণ একে অপরের ভাই। সুতরাং আমি চাই প্রত্যেক আনসার একজন মুহাজিরকে ভাই হিসাবে গ্রহণ করুক।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নির্দেশ পালনে আর বিলম্ব হল না। তাঁর ঘোষণা শুনামাত্র আনসারগণ মুহাজিরদের মধ্য হতে একেকজন করে ভাই বেছে নিতে লাগলেন। তবে শিক্ষাদীক্ষা, রুচি, আচরণ ও বয়স প্রভৃতি ব্যাপারে সামঞ্জস্য বিধান করতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বয়ং তাদের সাহায্য করলেন। এই ঘটনার

www.nagorikpathagar.org

মধ্য দিয়ে আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে কোনরূপ স্বতন্ত্র ব্যবধান রইল না। এখন তাদের সকলেরই একমাত্র পরিচয় হল তারা সকলেই আল্লাহ্‌র অনুগত; আল্লাহ্‌র দীন ও রাসূলের অনুসারী। অতপর আনসারগণ তাদের নিজ নিজ ভাইকে তাদের জমি-জমা, ঘর-বাড়ি, সম্পদ সবকিছু বন্টন করে দিলেন। এভাবে প্রাথমিক যুগের মদীনার মুসলিমগণ দুনিয়ার ইতিহাসে এক অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।

এই ভ্রাতৃত্ববন্ধন এমন সুদৃঢ় ছিল যে, মুহাজিরগণ নিজেদের প্রাপ্ত ক্ষেত্রে কৃষিকাজ করবেন তেমন অবস্থা ছিল না। একে তো তারা কৃষি কাজে অভ্যস্ত ছিলেন না, দ্বিতীয়ত তাদের পশু, অর্থ এবং কৃষির উপযোগী সরঞ্জামাদিরও ব্যবস্থা ছিল না। সুতরাং আনসারগণ তাদের জমি-জমাও চাষবাস করে দিতেন।

যা হোক, ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপনকালে মুহাজিরদের মধ্যে একজন বাদ পড়ে গেলেন—তিনি হযরত আলী (রা)। এই বাদ যাওয়াটা যেন আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রাসূলের ইচ্ছা ছিল। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র চাচা আবূ তালিবের দরিদ্রতার সময় হযরত আলী (রা)-র ভরণ-পোষণের দায়িত্ব রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) নিজ স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি তাকে নিজ পরিবারভুক্তই করে নিয়েছিলেন। মদীনায় আসার পরও সেই ব্যবস্থা অব্যাহত ছিল। সুতরাং সকল মুহাজিরই যখন কোন না কোন আনসারেরই হয়ে গেলেন, তখন আলী (রা) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র নিকট নিবেদন করলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) সকলের জন্যতো ভাই মিলে গেল কিন্তু আমার জন্য তো কেউ রইল না। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন, আজ হতে তুমি আমারই ভাই হলে। এতে কি তুমি খুশি নও ?

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র কথায় হযরত আলী (রা) যে কত আনন্দিত হয়েছিলেন তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। হযরত আলী (রা) মদীনায়ও রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র পরিবারভুক্ত থেকে গেলেন। হযরত আলী (রা)-র বিবাহের পরে পৃথক বসবাসের ব্যবস্থা করেন।

মসজিদে নববী নির্মাণ

এ পর্যন্ত মদীনায় কোন মসজিদ নির্মাণ হয় নাই। যেখানেই সুযোগ হত সেখানেই নামায আদায় করা হত। মসজিদের জন্য জায়গার প্রয়োজন। যে স্থানে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র উষ্ট্রী থেমে গিয়েছিল সে জায়গাটাই মসজিদের জন্য মনোনীত করে খরিদ করা হল। কাঁচা ইটের দ্বারা মসজিদের দেওয়াল তৈরি করে

www.nagorikpathagar.org

খেজুর পাতা দ্বারা ছাদ করা হল। মসজিদের ভিতরে কোন বিছানা ছিল না, ছাদ ফাঁকা ছিল। একারণে বৃষ্টি হলে পানি জমে কাদা হয়ে যেত।

উম্মুল মু'মিনীনদের বাসগৃহ নির্মাণ

মসজিদ সংলগ্ন করে আযওয়াজে মুতাহিরাতের (পবিত্র বিবিগণ) জন্য বাসগৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা করা হয়। সেই সকল বাসগৃহও কাঁচা ইটের দ্বারা তৈরি করা হয়। মসজিদ ও বাসগৃহ নির্মাণ করতে সমস্ত সাহাবী মজুরের মত কাজ করেছিলেন, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীদের সঙ্গে শরীক হয়েছিলেন।

ইয়াহূদীদের সঙ্গে চুক্তি

মদীনা ইয়াহূদীদের কেন্দ্র ছিল। এদিকে মদীনার মুসলমানদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল। একারণে অমুসলমানগণ শঙ্কিত ও বিচলিত হয়ে পড়ল এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। কিন্তু রহমতে দো আলম (সা) তাদের সঙ্গে একটি শান্তি চুক্তি স্থাপন করলেন, যাতে প্রত্যেকে নিষ্ঠার সঙ্গে নিজ নিজ ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করতে পারে। এবং শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে মিলে-মিশে একত্রে বাস করতে পারে, কেউ কারো ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করতে না পারে। তারা ব্যবসা-বাণিজ্য ও কাজ-কারবার এক সঙ্গে মিলেমিশে করবে। মুসলমান অমুসলমান সবাই নিজদিগকে একই সম্প্রদায়ভুক্ত মনে করবে। এই চুক্তিপত্রের শর্তসমূহ নিম্নে বর্ণিত হল।

১. কেউ কোন বিশৃঙ্খলা বা যাতে শান্তি ভঙ্গ হয়ে অশান্তি সৃষ্টি হয় এমন কাজ কখনও করবে না।

২. এই চুক্তিপত্র নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র পক্ষ হতে মদীনার মুসলমান অমুসলমানদের সঙ্গে হয়েছে। কেউ কারও ক্ষতির চেষ্টা করবে না, প্রত্যেকে প্রত্যেকের উপকার করতে চেষ্টা করবে।

৩. এই চুক্তিতে আবদ্ধ জাতিসমূহ এই চুক্তি সর্বতোভাবে মেনে চলবে এবং চুক্তি ভঙ্গ করবে না; তারা নির্যাতিত মানুষের সাহায্য করবে।

৪. যখন বাইরের দুশমন মদীনা আক্রমণ করবে তখন এই শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ জাতিসমূহ একযোগে বহিরাক্রমণ প্রতিহত করবে।

৪. এই চুক্তিতে আবদ্ধ প্রতিটি লোকের জন্য মদীনার ভিতরে বিশৃঙ্খলা এবং বিভেদ সৃষ্টি করা হারাম।

www.nagorikpathagar.org

৫. এই শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ জাতিসমূহের মধ্যে যদি কোন প্রকার অশান্তির কারণ ঘটে যায় বা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তবে তার মীমাংসার দায়িত্ব আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর উপর ন্যস্ত রইল। তিনি যে মীমাংসা করে দিবেন অবনত মস্তকে সবাই তা মেনে নিতে বাধ্য থাকবে।

এই চুক্তিপত্রে মদীনার সকল অধিবাসীর স্বাক্ষর নেওয়া হল।

জিহাদ এবং কিতালের হুকুম

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যতদিন মক্কায় ছিলেন ততদিন শুধু এই হুকুমই ছিল আপনি কুরআনের দলিল পেশ করে লোকদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে আহবান করতে থাকুন এবং মূর্তি পূজা নিষেধ করতে থাকুন আর কাফিরদের যুলুম-অত্যাচারকে ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করতে থাকুন। তাহলে সত্য এবং মিথ্যা, হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য হয়ে যাবে। যুদ্ধের হুকুম ছিল না—যে কারণে সাহাবীদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালাতো, যে নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে স্বদেশ ভূমি, ঘর-বাড়ি, আত্মীয়-স্বজন সবকিছুর মায়া বিসর্জন দিয়ে ইসলামের জন্য আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের মহব্বতে হিজরত করতে হয়েছিল।

হিজরতের পরেও যুলুমের অবসান হয় নাই। সমগ্র আরব জাহানের অমুসলমান মিলিত হয়ে মুষ্টিমেয় আল্লাহ্‌র বান্দার নাম-নিশানা মুছে দেয়ার জন্য সংঘবদ্ধ হয়ে প্রচেষ্টা চালাল। পরিস্থিতি যখন নাজুক অবস্থায় পৌছল, তখন রাব্বুল আলামীনও তাঁর রাসূলের উপর হুকুম অবতীর্ণ করলেন। "যারা আপনাকে আক্রমণ করে আপনিও তাদের আক্রমণ করবেন। যারা আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করে আপনিও তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে জানিয়ে দিলেন মুসলমানরা তাদের নিজেদের এবং দীনের হিফাজতের জন্য সংগ্রাম করে যাবেন, আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দান করলেন।"

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ - نِ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ - اِلاَّ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ

ঐ সমস্ত লোকদের যুদ্ধের হুকুম দেয়া হল যাদের সঙ্গে কাফিররা যুদ্ধ করছে, কেননা তাদের উপরে যুলুম করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তাদের সাহায্য করতে সম্যকরূপে সক্ষম। এরা ঐ সমস্ত লোক যাদের অন্যায় করে বাড়ি হতে বহিষ্কার করা হয়েছে।

তাদের অপরাধ শুধু তারা এক আল্লাহ্‌কে রব বলে স্বীকার করে।

www.nagorikpathagar.org

ইসলামী শরীয়তে এ ধরনের যুদ্ধকে জিহাদ বলে। কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মুসলমানের উপর এ জিহাদ ফরয করা হয়েছে। প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হকের প্রতিষ্ঠায় নিজের জানমাল দ্বারা চরম পর্যায়ের চেষ্টা করা।

গাযওয়াহ্ ও সারিয়াহ্

আল্লাহ্র এই হুকুমের পরে মুসলমানদের মধ্যে এবং কাফিরদের মধ্যে বহু যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। কোন যুদ্ধে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) উপস্থিত থাকতেন। কখনও বা উপযুক্ত সাহাবীর উপর নেতৃত্বের ভার অর্পণ করে যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রেরণ করতেন। যে সমস্ত যুদ্ধে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) উপস্থিত থাকতেন ঐ যুদ্ধগুলিকে বলা হয় গাযওয়াহ্ আর যে সকল যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা) উপস্থিত থাকতেন না ঐগুলিকে বলা হয় সারিয়াহ।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র মুবারক জীবনে গাযওয়ার সংখ্যা তেইশ, সারিয়াহ তেতাল্লিশ। হিজরতের পরে নবম হিজরী পর্যন্ত মোট ৫৬টা যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং প্রতিটি যুদ্ধেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ওয়াদা অনুযায়ী মুসলমানদেরকে জয়যুক্ত করেছিলেন। শুধু উহুদ ও হুনায়ন যুদ্ধে মুসলমানদের কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়।

ইসলামের প্রথম যুদ্ধ বদরে কুবরা

সত্য বলতে গেলে বদর যুদ্ধে ইতিহাসে নবযুগের সূচনা ঘটেছিল। বদর যুদ্ধে বিজয় লাভের ফলেই ইসলামের অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল। এই যুদ্ধে জয়-লাভ না ঘটে মুসলমান পরাজিত হলে হয়ত শিশু ইসলাম সেখানেই দুনিয়ার বুক হতে বিদায় গ্রহণ করত।

কিন্তু করুণাময় আল্লাহ্র তা ইচ্ছা ছিল না। যে ইসলামকে বিশ্বের সত্য-ভ্রষ্ট মানবদলকে সত্য ও শান্তির কোলে টেনে নিয়ে পার্থিব জীবনে শান্তি ও পারলৌকিক জীবনে মুক্তি দেয়ার জন্য অবতীর্ণ করেছিলেন, তা ভূপৃষ্ঠ হতে বিলুপ্ত হবে কেন, তাকে যে মহান আল্লাহ্ সগৌরবে কিয়ামত পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখবেন, এই জন্যই সেদিন বদরের প্রান্তরে নামমাত্র অস্ত্রধারী তিন শত তেরজন মুসলিম সৈনিক অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত সহস্রাধিক শত্রু যোদ্ধাকে চরমভাবে পরাজিত করে ইসলামের বিজয় ঝাণ্ডাকে উচ্চে তুলে ধরেছিলেন। ফলে শিশু ইসলাম সম্মুখস্থ মহাবিপদ কাটিয়ে বেঁচে গিয়েছিল। এই যুদ্ধটি ছিল ইসলাম এবং কুফরির মধ্যে প্রথম যুদ্ধ।

দ্বিতীয় জিহরীর সতরই রমযান এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

www.nagorikpathagar.org

যুদ্ধের পটভূমি ও বিস্তারিত ঘটনা

সংবাদ রটে গেল, কুরাইশ নেতা আবূ জেহেল, আবূ সুফিয়ান প্রমুখ সহস্রাধিক সৈন্য নিয়ে মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হচ্ছে। এই সংবাদে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তব্য নির্ধারণের জন্য মুহাজির ও আনসারদের ডেকে পরামর্শে বসলেন। ইতিপূর্বে মদীনায় পৌঁছেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনার পৌত্তলিক ও ইয়াহূদীদের সাথে যে শান্তি চুক্তি করেছিলেন, মক্কার কাফিরদের আগমনের সংবাদ পেয়ে সন্ধি পালনে অস্বীকার করে বসল। তারা দেখল মক্কার কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তারা মুহাম্মদ (সা) ও তার অনুসারীদের রক্ষা করবে কেন? আর মূলত ইয়াহূদীরাও মনে মনে মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর অনুসারীদের ধ্বংসই কামনা করছিল। মক্কার কাফিরগণ তাই করতে আসছে দেখে মনে মনে তারা আনন্দিত হল। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র বুঝতে বাকি রইল না যে, মক্কার কুরাইশদের বাধা দেয়ার দায়িত্ব শুধু মুসলমানদেরই পালন করতে হবে। এ ব্যাপার সাহাবীগণও উপলব্ধি করতে পারলেন। এখন প্রশ্ন উঠল, শত্রু বাহিনীকে মদীনার ভিতর থেকে বাধা দান করা হবে না সম্মুখে অগ্রসর হয়ে মদীনার বাইরে গিয়ে প্রতিরোধ করা হবে? এ ব্যাপারে সাহাবীগণের মধ্যে দু'টি দলের উদ্ভব হল।

একদল মদীনায় থেকেই যুদ্ধ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। অন্যদল মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করবার পক্ষপাতী। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও হযরত আলী (রা) মত প্রকাশ করলেন যে, আর বিলম্ব না করে মদীনার বাইরে গিয়ে কুরাইশদের বাধাদান করা উচিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আনসারদের পরামর্শ চাইলেন। আনসার নেতা সাদ বিন মায়াজ (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আনসারদের সম্পর্কে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তারা সর্বদাই আপনার নির্দেশ পালনে প্রস্তুত। আপনি যেরূপ নির্দেশ করবেন তারা তাই মেনে নেবে।

যারা মদীনায় থেকে যুদ্ধ করার অভিলাষী ছিলেন তাদের যুক্তি ছিল— মদীনার ভিতরে এখন পৌত্তলিক ও ইয়াহূদীরা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত কাজেই এক সঙ্গে সমস্ত মুসলমানের নগর ছেড়ে বাইরে যাওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। আল্লাহ্ না করুন তাতে বিপদ ঘটতে পারে। আর যারা বাইরে গিয়ে শত্রুর প্রতিরোধ করার পক্ষপাতী তাঁরা বললেন, নগরের অভ্যন্তরে শত্রু বাহিনীকে বিনা বাধায় প্রবেশ করতে দেয়া উচিত নয়। এতে শত্রুর স্পর্ধা যেমন বেড়ে যাবে তেমনি মদীনা নগরী রণক্ষেত্রে পরিণত হবে, তা যথেষ্ট ক্ষতির কারণ। উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ভেবে দেখলেন কোন পক্ষের বক্তব্যই অযৌক্তিক নয়। তখন

www.nagorikpathagar.org

তিনি ঘোষণা করলেন তোমাদের সকলের কথাই যুক্তিভিত্তিক। দু'টি পন্থার যেটাই আমরা গ্রহণ করিনা কেন একদিকে যেমন কল্যাণকর অন্যদিকে অকল্যাণেরও আশংকা আছে। তবে আমি বলছি তোমরা যারা বাইরে যাবার পক্ষপাতী তারা প্রস্তুত হও আর যারা বাইরে যাবার পক্ষপাতী নও তারা ভিতরে থেকে নগর রক্ষা কর।

ঘোষণা অনুযায়ী বাইরে যাবার জন্য তিনশত তেরজন প্রস্তুত হলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের নিয়েই সৈন্য বাহিনী গঠন করলেন। আল্লাহ্র নবী এই সর্বপ্রথম ইসলামের শত্রু কাফিরের সহিত শক্তির মুকাবিলায় সেনাধ্যক্ষের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। ইসলামের এই প্রথম সেনাদলের জন্য দু'টি কাল বর্ণের পতাকা তৈরি করা হল। তার একটি সোপর্দ করা হল আলী (রা)-র হস্তে। অন্যটি হযরত সাদ্ বিন মায়াজের হস্তে।

জাননিসারদের এই ক্ষুদ্র বাহিনীটি নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) অগ্রসর হতে লাগলেন। দু'দিন চলার পর তৃতীয় দিন অপরাহ্নে তিনি সৈন্যবাহিনীসহ বদর প্রান্তরে উপস্থিত হলেন। ইতিপূর্বে বদরের নিকটবর্তী হয়েই তিনি হযরত আলী (রা)-কে শত্রু বাহিনীর গতিবিধি অবগত হবার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। হযরত আলী (রা) অতি বিচক্ষণতার সাথে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করে এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রয়োজনীয় সংবাদ অবহিত করলেন। তদনুযায়ী মুসলিম বাহিনী দ্রুত গতিতে বদরে পৌছে সামরিক দিক দিয়ে অনুকূল স্থান দখল করে নিলেন।

মদীনা হতে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ৮০ মাইল দূরে অবস্থিত বদর প্রান্তর। প্রান্তরের তিন দিক ঘিরে রয়েছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় শ্রেণী। পূর্বদিকের পাহাড় হতে ক্ষুদ্র একটি ঝরনা ধারা সমতল ভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেই ঝরনার উৎস স্থল অধিকার করে তথায় নিজেদের ঘাঁটি স্থাপন করলেন।

মুসলিমগণ নামায এবং প্রার্থনার মধ্য দিয়েই রাত অতিবাহিত করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর জন্য নির্মিত একটি খেজুর পাতার ক্ষুদ্র ছাউনিতে সমস্ত রাত ইবাদতে নিমগ্ন রইলেন।

অপর পক্ষে আবু জেহেলও সদলবলে বদর প্রান্তরে এসে উপস্থিত হল। তার সঙ্গে ছিল সহস্রাধিক সুসজ্জিত সাহসী সৈনিক। ওদের মধ্যে অন্যূন দুইশ ছিল অশ্বারোহী। সতেরই রমযান শুক্রবার ফজরের নামাযের বাদে রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় সৈনিকদের শ্রেণীবদ্ধ করতে মনোনিবেশ করলেন। অতপর সকলকে লক্ষ্য করত যুদ্ধ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় উপদেশ দান করলেন। তৎপর আল্লাহ্র দরবারে হাত তুলে মনের আবেগে প্রার্থনা করতে লাগলেন ঃ

www.nagorikpathagar.org

ওহে সর্বশক্তিমান প্রভু! যে মুষ্টিমেয় সত্যের সৈনিক আজ সত্যের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়েছে তাদেরকে তুমি বিজয় মাল্যে ভূষিত কর। হে পরওয়ারদিগার! প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুর মুখে তোমার কৃপা ব্যতীত আমাদের আর কোন ভরসা নাই! হে মহা কৃপাময়! আজ এই মুষ্টিমেয় তৌহিদ পূজারী যদি পরাজয় বরণ করে তা হলে দুনিয়ার বুকে তোমাকে আর কেউ আল্লাহ্ বলে ডাকবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এমনভাবে মুনাজাতে তন্ময় হয়েছিলেন যে, তাঁর আর কোন খেয়াল রইল না।

এমন সময় আল্লাহ্র তরফ থেকে তাঁর রাসূল (সা)-কে আশ্বাস বাণী শুনান হল—"ঈমানদারদেরকে সুসংবাদ প্রদান করুন। নিশ্চয়ই আপনার প্রভু ঈমানদারদের নিকট হতে শত্রুদেরকে দূরে রাখবেন, কেননা আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদেরকে ভালবাসেন না।"

আল্লাহ্র এই আশ্বাস বাণী শ্রবণ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) পরম আনন্দে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে ডেকে বললেন, আমাদের জন্য রাব্বুল আলামীনের তরফ থেকে মহা সুসংবাদ এসেছে। আল্লাহ্ আমাদিগকে সাহায্য করবেন, আমাদের ভয় নাই। যুদ্ধে আমরা নিশ্চয়ই ইনশা আল্লাহ্ জয়যুক্ত হব।

এতক্ষণে কুরাইশ নেতা আবূ জেহেল মুসলমানদের সংখ্যা স্বল্পতার কথা জেনে নিয়েছিল। কাজেই তার আর বিলম্ব সহ্য হচ্ছিল না। সে একরূপ অবশ্যম্ভাবী বিজয়ের আশায় চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। সুতরাং সে তার সৈন্যগণকে যুদ্ধ আরম্ভের নির্দেশ দিল।

বদর প্রান্তরে এক অদ্ভুত যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে এক অপূর্ব যুদ্ধ। দুই পক্ষের শক্তির এত ব্যবধান অসামঞ্জস্যপূর্ণ যুদ্ধ মানবজাতির ইতিহাসে আর কোন দিন হয়েছে কিনা তা বলা যায় না। তখনকার যুদ্ধরীতি অনুসারে কুরাইশ পক্ষ হতে বীর ওৎবা ও তার ভ্রাতা শায়বা ও পুত্র অলীদ যুদ্ধের প্রাঙ্গণে এসে সদম্ভে বিপক্ষকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করতে লাগল। এটা দেখে আনসার বীর আবদুল্লাহ্, আইয়ুব এবং অন্য আর একজন আনসার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে গিয়ে মুকাবিলা করবার অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) অনুমতি দিলে তারা শত্রুর সম্মুখীন হলেন।

ওৎবা তার সম্মুখে আবদুল্লাহ্কে দেখে উচ্চৈঃস্বরে বলল ঃ হে সৈনিক তোমার পরিচয় দাও। অতপর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। আবদুল্লাহ্ বীরদর্পে বললেন, রে কাফির! যুদ্ধ ক্ষেত্রে কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে আসিনি, পরিচয় দানে প্রয়োজন কিসের? যোদ্ধার পরিচয় যুদ্ধের মাধ্যমে পাওয়া যায়। তবে যদি পরিচয় জানবার একান্তই

www.nagorikpathagar.org

বাসনা হয়ে থাকে, তবে জেনে রাখ আমি মদীনার আনসার মুসলমান, আমার নাম আবদুল্লাহ্।

এবার ওৎবা গম্ভীর স্বরে বলল ঃ হে মদীনাবাসী আনসার! আমাদের আত্মীয় কুরাইশ ব্যতীত অন্য কারও সাথে যুদ্ধ করবার নির্দেশ নাই। নতুবা এতক্ষণে তোমার উন্নত শির ভূ-লুণ্ঠিত হয়ে পড়ত। তুমি যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে প্রস্থান করে কুরাইশদের কাউকে পাঠিয়ে দাও।

ওৎবার এইরূপ স্পর্ধা দেখে আবদুল্লাহ্ (রা) গর্জে উঠলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওৎবার এই গর্বিত বাক্যে আবদুল্লাহ্সহ আনসার ত্রয়কে ডেকে নিয়ে তৎপরিবর্তে তাঁর নিজ বংশের আবূ ওবায়দা (রা), হামজা (রা) এবং আলী (রা)-কে যুদ্ধে যেতে নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ পাওয়া মাত্র বীর ত্রয় ময়দানে উপস্থিত হলেন। হযরত আলী (রা)–র সাথে অলীদের, ওবায়দা (রা)–র সাথে শায়বার, হযরত হামজা (রা)-র সাথে ওৎবার যুদ্ধ শুরু হল।

অলীদ হযরত আলী (রা)-র সম্মুখীন হয়ে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, যুদ্ধক্ষেত্রে পরিচয়ের কি প্রয়োজন। সাহস থাকলে অস্ত্র ধারণ কর। যুদ্ধেই বীরের প্রকৃত পরিচয় মিলে। তবে জানতে যখন তোমার বাসনা জেগেছে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র বাল্য সহচর আবূ তালিব তনয় আলী। মক্কাবাসীর কাছে আমি শেরে খোদা নামে পরিচিত। যদি জীবনের মায়া থাকে তবে যুদ্ধ- ক্ষেত্র পরিত্যাগ করত জীবন বাঁচাতে পার।

অলীদ হযরত আলী (রা)-র বাক্যে উত্তেজিত হয়ে বলল ঃ আমাকে তুমি যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করতে বলছ! আমি তোমার জীবনের সাধ না মিটিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করছি না। আমি কুরাইশ বীরকুল চূড়ামণি ওৎবা তনয় অলীদ। সাবধান আমি এই বর্শাঘাতেই তোমার জীবন লীলা সাঙ্গ করছি। এ কথা বলেই অতর্কিতে হযরত আলীর উপরে বর্শা নিক্ষেপ করল। হযরত আলী (রা) বিদ্যুৎগতিতে নিক্ষিপ্ত বর্শা বাম হস্তে ধারণ করে ডান হাতে তরবারির এক আঘাতেই অলীদের এক হাত দ্বিখণ্ডিত করে ফেললেন। অলীদ অপর হাতে তরবারি ধারণ করতে উদ্যত হওয়া মাত্র পলকের মধ্যে হযরত আলী (রা)-র দ্বিতীয় আঘাতে অলীদের মস্তক দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে ধুলায় লুণ্ঠিত হল।

অলীদকে সংহার করে আলী (রা) এক মুহূর্তের জন্য অন্য মনস্ক হয়ে কি যেন দেখছিলেন। ঠিক এই মুহূর্তে দারাব নামক জনৈক কাফির সৈনিক দ্রুত এসে হযরত আলীর মস্তক লক্ষ্য করে অসির আঘাত করল। কিন্তু তিনি ক্ষিপ্রতার সাথে একদিকে সরে মস্তক বাঁচিয়ে নিয়ে প্রচণ্ড রোষে উন্মত্ত সিংহ সদৃশ উত্তেজিত

www.nagorikpathagar.org

হয়ে উঠলেন এবং দারাবকে এমন এক পদাঘাত করলেন যে, তাতেই তার প্রাণ বায়ু দেহ পিঞ্জর ত্যাগ করে শূন্যে উড়ে গেল।

ঠিক এই মূহূর্তে হযরত আলী (রা) দেখতে পেলেন দুর্ধর্ষ কাফির বীর শায়বার আঘাতে বৃদ্ধ মুসলিম বীর আবূ ওবায়দা (রা) অনেকটা পেরেশান হয়ে পড়েছেন। তৎক্ষণাৎ তিনি ওবায়দা (রা)-র সাহায্যের জন্য ছুটে গেলেন এবং ভীষণ বিক্রমে আঘাত করে শায়বার পাপ জীবনের অবসান ঘটালেন। কিন্তু শায়বার আঘাতে ওবায়দা (রা) এমন মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন যে, শিবিরে প্রত্যাবর্তন করার অল্পক্ষণ পরই শাহাদত বরণ করলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রের অন্যদিকে হযরত হামজা (রা) এবং ওৎবার মধ্যে যুদ্ধ চলছিল। পুত্র অলীদের জীবন সাঙ্গ হতে দেখে প্রচণ্ড রোষে ক্ষিপ্ত হয়ে হামজা (রা)-কে লক্ষ্য করে আঘাত হানল। কিন্তু হামজা (রা) সে আঘাত অবলীলাক্রমে উড়িয়ে দিয়ে পাল্টা আঘাতে ওৎবার জীবন প্রদীপ নির্বাপণ করে দিলেন। মক্কার কাফিররা ক্ষণকাল মধ্যে তাদের প্রধান তিনজন বীরের জীবন শেষ হতে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল। দ্বৈরথ যুদ্ধে তাদের আর ভরসা হলো না। সুতরাং তারা সমবেতভাবে মুসলিম সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এদিকে মুসলিম সৈন্যগণও হযরত আলী (রা) ও হযরত হামজা (রা)-র কৃতিত্বে নববলে বলীয়ান হয়ে নারায়ে তকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করত প্রচণ্ড বেগে কাফিরকুলের উপরে পাল্টা আক্রমণ করলেন।

মহাবীর আলী (রা) বীর-বিক্রমে বিপক্ষ ব্যূহ পর্যুদস্ত করে বহু সংখ্যক কাফির সৈন্য শমন সদনে প্রেরণ করলেন। তাঁর উলঙ্গ অসি বিদ্যুতের মত চমকাতে লাগল। তিনি যাকে সম্মুখে পাচ্ছিলেন তারই ভবলীলা সাঙ্গ করছিলেন। তাঁর এই প্রচণ্ড বিক্রম দেখে বিপক্ষীয়রা ত্রাহি ত্রাহি করতে লাগল। কিন্তু মুসলিম সৈন্যগণের হৃদয়ে শত্রুবধের উন্মাদনা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেল। তাদের তীব্র আক্রমণের মুখে শত্রু সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়তে লাগল।

ইতিমধ্যে দুইজন আনসার যুবক অপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন করে আবূ জেহেলকে নিহত করায় ক্ষণকাল মধ্যেই কুরাইশ সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত হল। মুসলিম বাহিনী শত্রু সৈন্য তাড়িয়ে নিয়ে চললেন। তাদের অনেকে নিহত ও অনেকে বন্দী হল। মুসলিমগণ কাফিরদেরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করতে উদ্যত হলেন। এমন সময় করুণার মূর্তি রসূলে পাক (সা) ঘোষণা করলেন—ওদেরকে আর হত্যা কর না। হতভাগাদের অনেকেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও চাপে পড়ে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছে। মুসলিমরা বিনাবাক্য ব্যয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র কথা মেনে নিলেন।

www.nagorikpathagar.org

এই যুদ্ধে শত্রুপক্ষের সত্তরজন নিহত হয়েছিল এবং সত্তরজন হয়েছিল বন্দী। আর মুসলিম সৈনিকদের তেরজন শহীদ হয়েছিলেন। তন্মধ্যে সাতজন আনসার ছয়জন মুহাজির। মুসলমানরা প্রচুর মালে গনীমাত লাভ করেছিলেন। এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে ইসলাম সমগ্র আরব তথা বিশ্বের 'পরে এক নতুন শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করল। এই যুদ্ধ হতেই শুরু হল ইসলামের বিজয় অভিযান।

হযরত ফাতিমা জোহরা খাতুনে জান্নাত (রা)

নবী নন্দিনী হযরত ফাতিমা (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রথমা পত্নী উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা (রা)-র সর্ব কনিষ্ঠ কন্যা। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র সন্তান-সন্ততির মধ্যে ইনিই সর্বদিক দিয়ে শ্রেষ্ঠা ছিলেন। কেবল তাই নয়, ইনি ছিলেন বহু দুর্লভ ও বিশিষ্ট গুণের অধিকারী। তাঁর এই শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্যের আভাসসমূহ তাঁর জন্মলগ্নেই প্রকাশ পেয়েছিল।

হযরত ফাতিমা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র সর্বাধিক প্রিয় পাত্রী ছিলেন। ইনিও পিতাকে সর্বাপেক্ষা ভালবাসতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায়, ফাতিমা (রা) দুনিয়ার নারী জাতির মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাশালিনী এবং জান্নাতের নারীদের সরদার হবেন। এই জন্যই তাঁকে বলা হয়েছে খাতুনে জান্নাত। ফাতিমা (রা) জ্ঞানে-গুণে নারী জগতের অতুলনীয়া ছিলেন। তাঁর সুযোগ্য ও বিদুষী জননী খাদীজা (রা) এবং জ্ঞানের রাজ্যের প্রকৃত অধিকারী স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে হাতে-কলমে শিক্ষায়-দীক্ষায় পরিপূর্ণ করে তুলেছিলেন। দুনিয়াতে এরূপ ভাগ্য একমাত্র ফাতিমা (রা) ব্যতীত অন্য কারও হয় নাই।

রাসূল পত্নী হযরত খাদীজা (রা) যখন ইন্তিকাল করেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র উপর দিয়ে দুর্যোগের স্রোত বয়ে যাচ্ছিল। একই বছর তিনি প্রাণপ্রিয় চাচা আবূ তালিবকে হারিয়েছিলেন। আর প্রকৃতপক্ষে ইসলামের প্রথমাবস্থায় এই দুইজনই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র আশ্রয়স্থল ও সহায়-সম্বল ছিলেন। সহসা এই দু'জনের মৃত্যু বরণের সাথে সাথেই কাফিরদের উৎপীড়নের মাত্রাও বৃদ্ধি পেয়ে যায়, যার কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দিশাহারা করার উপক্রম করেছিল। কিন্তু এই দুর্যোগকালে মাতৃহারা বালিকা ফাতিমা (রা) যেভাবে পিতার খেদমত ও তত্ত্বাবধানে আত্মনিয়োগ করেছিলেন ও তাঁর ভগ্নমনে সান্ত্বনা ও সাহসদানে ব্যাপৃত ছিলেন, সত্যই তার নযীর কোথাও পাওয়া যাবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র সূরাত-সীরাত ও গুণাবলীর সাথে ফাতিমা (রা)-র এত অধিক সামঞ্জস্য ছিল যা সচরাচর দেখা যায় না।

www.nagorikpathagar.org

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র মুবারক দেহে যে সুঘ্রাণ ছিল হযরত ফাতিমা (রা)-র দেহ হতেও ঠিক তদ্রূপ সুঘ্রাণ পাওয়া যেত।

হযরত আয়িশা (রা) বলতেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র ইন্তিকালের পরে যখন তাঁর অদর্শনজনিত কারণে ব্যাকুল হয়ে পড়তাম তখন ফাতিমাকে দেখতাম, দেখে প্রাণ জুড়াতাম। তিনি আরও বলেছেন, দুনিয়াতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বেশি ভালবাসতেন হযরত ফাতিমা (রা)-কে। হযরত আয়িশা (রা) ফাতিমার বিমাতা হলেও উভয়ে প্রায় এক বয়সের ছিলেন। এজন্য তাদের মধ্যে সমবয়স্কা সুলভ মধুর সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। একদা তাঁরা বসে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপরত ছিলেন। তখন তাঁদের মধ্যে কথায় কথায় একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ হয়, তাঁদের উভয়ের মধ্যে কার মর্যাদা অধিক, কে শ্রেষ্ঠা ? ফাতিমা (রা) বললেন ঃ আমি শ্রেষ্ঠা। আয়িশা (রা) বললেন ঃ আমি শ্রেষ্ঠা। তখন আয়িশা (রা) তাঁর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র এক হাদীসের উল্লেখ করলেন। হাদীসখানা হযরত আয়িশারও জানা ছিল। তাই ফাতিমার দাবি মেনে নিয়েও তিনি বললেন, দেখ ফাতিমা তুমি আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা হলেও একদিক দিয়ে আমার মর্যাদা তোমার উপরে। কেননা পরকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন বেহেশতে অবস্থান করবেন তখন তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে কেবল আমি থাকব। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র এই সাহচর্যের দিক দিয়া কি আমার মর্যাদা বেশি নয় ? সহসা আয়িশা (রা)-র এ কথার জবাব খুঁজে না পেয়ে ফাতিমা (রা) নীরব রইলেন। আয়িশা (রা) ফাতিমার মুখপানে তাকিয়ে তাঁকে স্বীয় বক্ষে টেনে নিয়ে বললেন, মা তুমি ব্যথা পেয়েছ কি ? সত্যি বলতে গেলে তোমার আমার মাঝে শ্রেষ্ঠত্বের কোন তুলনা চলে না, কোথায় তুমি আর কোথায় আমি! আমি যদি তোমার মাথার এক গাছি চুল হয়েও জন্মগ্রহণ করতাম তাও আমার জন্য সার্থক ছিল!

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! ফাতিমা (রা)-র মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আর কিছু বলার আবশ্যক রাখে না। আশা করি এবার আপনারা তা সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

যা হউক রসূল তনয়া এই মহা রত্নকে লাভ করবার আকাঙ্ক্ষা অনেকেরই জেগেছিল। হিজরতের পূর্বে মক্কাতেই তিনি বিবাহ-যোগ্যা হয়েছিলেন। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই বহু স্থান হতে তাঁর বিবাহের প্রস্তাব এসেছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন যে সমস্ত সমস্যা ও দুর্যোগের মধ্য দিয়ে কাল কাটাচ্ছিলেন, হযরত খাদীজা (রা)-র ইন্তিকালে তাঁর উপর আরও যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল তাতে ফাতিমা (রা)-র বিবাহ সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি মনোযোগ দিতে পারেন নি। তারপর মদীনায় এসেও দু'টি বছর বিভিন্ন কাজে-কর্মে অতিবাহিত হল।

www.nagorikpathagar.org

ইতিমধ্যে মক্কার কুরাইশদের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী বদর যুদ্ধও সংঘটিত হয়ে গেল। এবার রসূল পাক (সা) যেন একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

হযরত ফাতিমা (রা)-র বিবাহ

হযরত ফাতিমা (রা)-র বিবাহের প্রস্তাব মক্কায় যেমন আসছিল মদীনায় হিজরতের পর সেখানেও তেমন আসছিল। এমন রমণী-রত্ন পত্নীরূপে লাভ করতে কার না বাসনা হয়। মদীনার বড় বড় জ্ঞানী-গুণী ধনবান একে একে বহুজনেই পয়গাম পাঠাতে লাগলেন। এমনকি হযরত আবূ বকর (রা)-এর মত মহামান্য ব্যক্তিও একদা এসে রাসূলুল্লাহ (সা)-র কাছে স্বীয় আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশ করলেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সা) অতি সংক্ষেপে একটি কথায় জবাব দিলেন, 'আল্লাহ্‌র মর্জির অপেক্ষা করুন।' জবাব শুনে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বিদায় হলেন। একদা হযরত উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট গিয়ে নিজের জন্য প্রস্তাব পেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকেও হযরত আবূ বকর (রা)-এর মত জবাব দিলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র এরূপ জবাব দেয়ার অবশ্যই কারণ ছিল, প্রকৃতপক্ষে তিনি আল্লাহ্ পাকের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ইঙ্গিত ব্যতীত কোন কাজ করতেন না বা কোন প্রতিশ্রুতিও দিতেন না। যেখানে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ, ফাতিমা (রা)-কে তিনি শেরে খোদা হযরত আলী (রা)-র জন্য নির্ধারিত করে রেখেছিলেন, সেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিভাবে ফাতিমা (রা)-কে অন্যত্র বিবাহ দেয়ার স্বীকৃতি জানাতে পারেন?

বলাবাহুল্য, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র এরূপ জবাব দ্বারা বিচক্ষণ হযরত আবূ বকর (রা) এবং হযরত উমর (রা) উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন ফাতিমাকে লাভ করবার মত ভাগ্যবান তাঁরা নন। অতপর তাঁরা দুজনই মনে মনে চিন্তা করে দেখলেন, ফাতিমার জন্য যোগ্য পাত্র মক্কা-মদীনা তথা সমগ্র আরব জাহানের মধ্যে কেবলমাত্র একজনই হতে পারেন। তিনি হচ্ছেন শেরে খোদা হযরত আলী (রা)। তিনি শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞানে-গুণে, সাহসে-বীরত্বে, বংশ মর্যাদায় সর্বগুণে গুণান্বিতা, সুতরাং ফাতিমার মত রত্ন লাভ করবার এবং তাঁর স্বামী হবার যোগ্যতা শুধু তাঁরই আছে। যা হউক, উল্লিখিত সাহাবীদ্বয় বিষয়টি নিয়ে একদা হযরত আলী (রা)-র নিকট গমন করলেন। হযরত আলী (রা) সম্মানিত সাহাবীদ্বয়কে যথাযোগ্য আদর-যত্ন করলেন। পরে তাদের মধ্যে আলাপ আলোচনা শুরু হল। কথার মধ্য দিয়ে হযরত উমর (রা) মূল বিষয়টি বলে ফেললেন। তিনি হযরত আলী (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন, ভাই আপনি

www.nagorikpathagar.org

ফাতিমার জন্য আপনার তরফ হতে প্রস্তাব পেশ করুন। আপনার তো জানাই আছে আমরা দু'জনই প্রস্তাব দিয়ে ব্যর্থ হয়েছি। কিন্তু আমাদের ধারণা, আপনি প্রস্তাব দিলে বিফল হবেন না। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র দরবারে মঞ্জুর হবে।

ফাতিমার মত রমণী-রত্ন পত্নীরূপে পাবার আশা হযরত আলী (রা)-র ছিল না তা নয়। তবে তা থাকলেও তিনি নিজেকে অনুপযুক্ত ভেবে এই বাসনাকে অসম্ভব মনে করে হৃদয় মাঝে চেপেই রেখেছিলেন। প্রকাশ করবার মত সাহস হয় নাই। তিনি উমরের কথায় বললেন ঃ ভাই আপনি এবং আবূ বকর (রা)-এর মত লোক যেখানে বিফল হয়েছেন সেখানে আমি কি করে আশা করতে পারি ?

হযরত উমর (রা) বললেন ঃ আপনার মধ্যে যে গুণ ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তাতে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে ফাতিমা (রা)-র জন্য একমাত্র উপযুক্ত পাত্র আপনিই। তজ্জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি প্রস্তাব পেশ করুন। আমাদের কথার সত্য-মিথ্যা যাচাই করুন।

যা হোক, তিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত উমর (রা)-এর কথা অনুসারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট গমন করলেন কিন্তু নিজের বিবাহের জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করলেন না। শেষ পর্যন্ত মদীনার কতিপয় আনসার সাহাবীও হযরত আলী (রা)-র নিকট উপস্থিত হয়ে এ বিষয়ে পরামর্শ দিলেন। যাহোক, হযরত আলী (রা) যে অন্যের কথা মত উৎসাহিত হয়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নাই। নতুবা তিনি যে লাজুক ব্যক্তি ছিলেন তাতে নিজে ইচ্ছা করে নিজের বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করা তাঁর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব ছিল না। বিশেষত আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে নিজেকে অতিশয় অযোগ্য মনে করতেন। হিতাকাঙ্ক্ষীদের পরামর্শ এবং উৎসাহে এবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে বিষয়টি উল্লেখ করবার জন্য একদিন দরবারে আগমন করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সে সময় সাহাবীদের উপদেশ দান করছিলেন। হযরত আলী (রা) এক পার্শ্বে গিয়ে চুপ করে বসে রইলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর আগমন লক্ষ্য করেছিলেন। বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হল। ইতিমধ্যে হযরত আলী (রা) কয়েকবারই প্রস্তাব পেশ করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সক্ষম হলেন না। সত্যিই তিনি লজ্জার প্রতীক ছিলেন, আর তার নিজের বিবাহের প্রস্তাব তাও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র আদরের দুলালী হযরত ফাতিমা (রা)-র সাথে, একথা মুখ দিয়ে বের করতে লজ্জাবোধ করছিলেন।

কিন্তু জ্ঞানের আধার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র চোখ এড়াতে পারলেন না। তিনি আলী (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন, প্রিয় আলী তুমি কি কিছু বলতে ইচ্ছা কর ? তজ্জন্য লজ্জা কিসের ? নিঃসঙ্কোচে বলে ফেল। হযরত আলী (রা) যেন হাফ

www.nagorikpathagar.org

ছেড়ে বাঁচলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ই তাকে সুযোগ করে দিলেন। এবার নিঃসঙ্কোচে আস্তে আস্তে বললেন ঃ আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আমার পক্ষ হতে ফাতিমার বিবাহের প্রস্তাব পেশ করছি। হযরত আলী (রা)-র মুখে এই কথা শোনামাত্র রাসূলুল্লাহ্ (সা) অত্যন্ত খুশীর সাথে বলে উঠলেন ঃ মারহাবা আহলান অর্থাৎ স্বাগতম। সংক্ষিপ্তভাবে এই কথা কয়টি বলে চুপ হয়ে গেলেন। আর অধিক কিছু বললেন না। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত কথায় হযরত আলী (রা) কিছুই বুঝতে পারলেন না। সুতরাং সভাশেষে চিন্তিত মনেই ফিরে আসলেন। কিন্তু যে সমস্ত বুদ্ধিমান লোক দরবারে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা বললেন, আপনার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে চিন্তা করার কিছুই নাই।

হযরত আলী (রা) যে ফাতিমা (রা)-র জন্য উপযুক্ত পাত্র এ ধারণা রাসূলুল্লাহ্ (সা) পূর্ব হতেই করেছিলেন। বিশেষত হিজরতের কালেই হযরত আলী (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিরাপত্তার জন্য নিজেকে মৃত্যুর মুখে সোপর্দ করতে মোটেই দ্বিধাবোধ করেন নি। বদর যুদ্ধে নিজের জীবনের মায়া বিসর্জন দিয়ে কাফিরদেরকে সংহার করে বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। তাতে ফাতিমাকে হযরত আলীর হাতে সোপর্দ করা যেন এক অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে পড়েছিলো। সর্বোপরি রাসূলের কন্যা বিবাহ দানের ব্যাপারে আলী (রা)-র প্রতি রাব্বুল আলামীনের তরফ হতে সমর্থন লাভও করেছিলেন।

আসল কথা, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আলী (রা)-কেই ফাতিমার জন্য উপযুক্ত পাত্র হিসেবে মনোনীত করেছিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কন্যার মতামত জানারও প্রয়োজন মনে করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফাতিমা (রা)-র তরফ হতে তাও জেনে নিলেন।

হযরত ফাতিমা (রা) ও হযরত আলী (রা] আশৈশব একই সঙ্গে প্রতিপালিত হয়েছিলেন। সুতরাং ঘনিষ্ঠতার কারণে হযরত আলী (রা) সম্পর্কে হযরত ফাতিমা (রা)-র কিছুই অজানা ছিল না। হযরত আলী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রিয়পাত্র ছিলেন। তা ছাড়াও তাঁর অন্যান্য গুণগরিমা হযরত ফাতিমা (রা) নিজের চক্ষেই দেখছিলেন। কাজেই এমন সর্বগুণ সম্পন্ন ব্যক্তি হযরত ফাতিমার মনঃপূত না হওয়ার কোন কারণই থাকতে পারে না। হযরত আলী (রা) ছিলেন বড় দরিদ্র। ধনদৌলত অর্থ-সম্পদ বলতে তার কিছুই ছিল না। হযরত ফাতিমা (রা) নবীর কন্যা, দরিদ্রতা ছিল রাসূল (সা)-এর গৌরবের বিষয়। তিনি ইচ্ছা করেই দারিদ্র জীবন যাপন করতেন। ধন-ঐশ্বর্য তাঁর চরণতলে লুটিয়ে পড়ত কিন্তু তিনি তা ভ্রূক্ষেপ করতেন না।

www.nagorikpathagar.org

ধন-দৌলত লোকদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে নিজে থাকতেন উপবাস। হযরত ফাতিমা (রা) সেই পিতারই সন্তান এবং এমন পরিবেশেই লালিত পালিত। সুতরাং হযরত আলী (রা)-র দরিদ্রতাকে তিনি অবজ্ঞা করবেন তা হতেই পারে না। ইসলামের ইতিহাসে দরিদ্রতার উল্লেখ আছে, নবী পরিবারে মাঝে মাঝে কয়েকদিনই উপোস চলত। সেই ঘরের যেকোন ব্যক্তি দরিদ্রতাকে বরণ করতে পশ্চাৎপদ হবেন এটা কি চিন্তা করা যায় ? বিশেষত হযরত ফাতিমা (রা)-র মত সর্ব গুণবতী বুদ্ধিমতী মহিলা সম্পর্কে এমন চিন্তাও করা যায় না।

যা হোক, হযরত আলী (রা) কর্তৃক হযরত ফাতিমা (রা)-কে বিবাহের প্রস্তাব দানের পর কয়েক দিন নীরবে কেটে গেল। একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আলী (রা)-কে ডেকে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন, বিবাহের মোহর আদায় করবার মত তোমার নিকট কিছু আছে কি ?

হযরত আলী (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমার কোন বিষয়ই তো আপনার নিকট গোপন নাই। বদরের যুদ্ধে গনিমত হিসাবে প্রাপ্ত একটি অশ্ব, একটি বর্ম ও একখানি তরবারি আমার নিকট আছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, অশ্ব ও তরবারির বেশি প্রয়োজন তবে বর্মটি বিক্রয় করে যা পাও নিয়ে আস।

আলী (রা) রাসূল (সা)-এর নির্দেশ মত বর্মটি নিয়ে বাজারে বিক্রয় করতে গেলেন, সহজে কোন খরিদ্দার মিলল না। অবশেষে হযরত উসমান (রা)-এর কাছে নিয়ে গেলে তিনি তা খরিদ করতে রাযী হলেন। চার শ আশি দিরহাম মূল্যে হযরত আলী (রা) তা খরিদ করতে রাযী হলেন। আলী (রা) চার শ আশি দিরহাম মূল্যে বিক্রয় করলেন। হযরত উসমান (রা) বর্ম কেনার পর হযরত আলী (রা)-কে বললেন, ভাই আলী (রা) এখন এই বর্মের প্রকৃত মালিক আমি তো ?

হযরত আলী (রা) বললেন ঃ নিশ্চয়ই। আমিতো তা আপনার নিকট বিক্রয় করে দিয়েছি। এবার হযরত উসমান (রা) বললেন, এবার আপনাকে আমার একটি অনুরোধ রক্ষা করতে হবে। করবেন কি? হযরত আলী (রা) বললেন, ধর্মত কোন বাধা না থাকলে আমি আপনার অনুরোধ রক্ষা করব।

হযরত উসমান (রা) বললেন, আমি বর্মটিকে আপনাকে ভাই হিসাবে উপহার দিলাম। আপনি এটা গ্রহণ করুন। কেননা এমন বর্ম শুধু আপনার দেহেই শোভা পায়। হযরত আলী দেখলেন ভ্রাতৃত্বের দান গ্রহণ না করলে হযরত উসমান (রা) অসন্তুষ্ট হবেন। তাই বললেন ঃ ভাই আমি গ্রহণ করলাম। এতে হযরত উসমান (রা) অত্যন্ত খুশি হলেন। অতপর হযরত আলী (রা) যথাসময়ে

www.nagorikpathagar.org

বর্মের মূল্য ও বর্মটি নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হলেন। দিরহামগুলি তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র হাতে দিলেন এবং হযরত উসমান (রা) কর্তৃক তাকে বর্ম উপহার দানের কথা বিবৃত করলেন। শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যারপরনাই খুশি হলেন এবং হযরত উসমান (রা)-এর জন্য প্রাণ খুলে দোয়া করলেন। বর্মের মূল্য হতে কয়েকটি দিরহাম হযরত আলী (রা)-র হাতে দিয়ে বললেন ঃ যাও বাজার হতে কিছু আতর ও সুগন্ধি কিনে আন। হযরত আলী (রা) বাজারে চলে গেলেন। অতপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাকী দিরহামগুলি উম্মুল মু'মিনিন হযরত উম্মে সালমা (রা)-র হাতে দিয়ে বললেন ঃ এগুলি দ্বারা বিবাহের সামানের যোগাড় কর।

কিছু সময় পরই হযরত আলী (রা) আতর ও সুগন্ধি নিয়ে ফিরে আসলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে এবং অন্য একজন সাহাবীকে বললেন, বিশিষ্ট আনসার এবং মুহাজির সাহাবীদের দাওয়াত করতে। দাওয়াতী সাহাবীবৃন্দ উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিবাহ মজলিসে সর্ব প্রথম বিবাহের খুৎবা পাঠ করলেন। খুৎবা পাঠ শেষ করে উপস্থিত সাহাবীবৃন্দকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ তোমরা শুনে রাখ আমি চারশ দিরহামের পরিবর্তে আলীর সাথে ফাতিমার বিবাহ দিলাম। বিবাহ কার্য সমাধার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সমবেত সাহাবীগণকে নিয়ে হযরত আলী (রা) এবং ফাতিমা (রা)-র বৈবাহিক ও পারিবারিক জীবনের সুখ-শান্তি ও সফলতা কামনা করে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে মুনাজাত করলেন। মুনাজাত শেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নির্দেশে বিবাহ মজলিসে কিছু খেজুর আনা হল। অতপর তিনি তা সকলকে বন্টন করে দিলেন।

এরূপ অনাড়ম্বর ও অতি সাধারণভাবে দীন দুনিয়ার মানব সম্রাট আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আদরের দুলালী হযরত ফাতিমা (রা)-র সঙ্গে হযরত আলী (রা)-র বিবাহ কার্য সুসম্পন্ন হল। আধুনিক জগতের শানশওকত প্রিয় ভোগবিলাসী জনগণ এ হতে শিক্ষা গ্রহণ করবেন কি ?

যখন আলী (রা)-র বিবাহ হল তখনও তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র এক পরিবার ভুক্ত লোক হিসাবে তাঁর গৃহেই বাস করছিলেন। সুতরাং আলী (রা)-র কোন পৃথক গৃহ ছিল না। বিবাহের পরে একমাস মতান্তরে দশ-এগার মাস অতীত হবার পর একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আলী (রা)-কে ডেকে বললেন (যেভাবে হোক) একখানা গৃহের বন্দোবস্ত করতে। কিন্তু অভাব জর্জরিত আলী (রা)-র পক্ষে গৃহ নির্মাণ করা সম্ভব ছিল না। বহু চেষ্টা করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র ভক্ত সাহাবী ইবনে নুমানের কাছ থেকে ভাড়ায় একখানা গৃহের ব্যবস্থা করলেন।

www.nagorikpathagar.org

গৃহের ব্যবস্থা করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট এসে জানালেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফাতিমা (রা)-কে স্বামীগৃহে পাঠাবার একটি তারিখ নির্দিষ্ট করলেন। অবশ্য এ সম্পর্কে আলী (রা)-র সঙ্গে পরামর্শ করে নিয়েছিলেন।

হযরত আলী (রা) হযরত ফাতিমা (রা)-কে পিতৃ আলয় হতে নিজের গৃহে নিয়ে যাবার তারিখে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নির্দেশে সম্মানিত সাহাবী এবং আত্মীয়-স্বজনগণকে দাওয়াত করত অলিমার ব্যবস্থা করলেন। এই অনুষ্ঠানে দরিদ্র আলী (রা) সামান্যতম বস্তু দ্বারা অলিমা ভোজের ব্যবস্থা করেছিলেন, তা শুনলে বর্তমান সময়ের ধনী শ্রেণীর লোকেরা তো দূরের কথা সমাজের নিম্ন শ্রেণীর ও বিত্তহীন লোকগণও নেহায়েত হাস্যকর ও অসামাজিক বলে মন্তব্য করবে। কিন্তু তারা যাই মন্তব্য করুক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না। মানবকুল শ্রেষ্ঠ দোজাহানের বাদশা নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র আদরের দুলালী ফাতিমা (রা)-র মর্যাদা দুনিয়ার যে কোন সম্রাট তনয়া অপেক্ষা বহুগুণ উর্ধে। শেরে খোদা হযরত আলী (রা)-র মর্যাদাও যেকোন যুগের যেকোন রাজা-বাদশা অপেক্ষা অনেক উচ্চে।

অথচ তারা ছিলেন দরিদ্র এবং তাদের সেই দারিদ্র মূলত সামর্থ্যানুযায়ী অলিমা খানার ব্যবস্থা করেছিলেন, একেকটি খেজুর, রুটির ছিন্ন টুকরা, সামান্য পনির, একটু ঝোল দ্বারা। এই সহজ-সরল প্রাণখোলা ভোজ অনুষ্ঠানে একদিকে মেজবানদের যেমন কোন সঙ্কোচ ছিল না, অন্যদিকে মেহমানদেরও পরিবেশিত ভোজ্য বস্তুর প্রতি কোনরূপ অবজ্ঞা বা তাচ্ছিল্যও ছিল না। পূর্ণ পরিতোষ ও তৃপ্তি সহকারে সকলেই ভক্ষণ করেছিলেন।

হযরত আলী (রা)-র অলিমা অনুষ্ঠানের খাবারের ব্যবস্থা যাই হোক না কেন মেজবান ও মেহমান উভয় পক্ষ হতে এত আন্তরিকতাপূর্ণ ছিল যে, তার কোন তুলনা হয় না। এ সম্পর্কে পরে কোন কোন লোক কি মন্তব্য করেছিলেন তাই লক্ষণীয় বিষয়, সমসাময়িককালে এ অপেক্ষা উত্তম অলিমা অনুষ্ঠান আর হয় না।

অলিমা শেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নির্দেশ অনুযায়ী উম্মে আয়মন ফাতিমা (রা)-কে হযরত আলী (রা)-র গৃহে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসলেন। হযরত আলী (রা) জীবনে এই সর্বপ্রথম সংসার পাতলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র দুহিতা হযরত ফাতিমা (রা)-কে নিয়ে তিনি যে সংসার রচনা করলেন তা ঐকান্তিকতায়, সারল্যে ও পবিত্রতায় পারিবারিক জীবনের এক অনুপম আদর্শ ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইশার নামায শেষ করে জামাতার বাড়িতে গিয়ে দেখেন তারা শয্যা পেতে

www.nagorikpathagar.org

শয়নের উদ্যোগ করছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখে তাঁরা উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তিনি ইশারা করে বসতে বললেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) দু'জনের মধ্যস্থলে উপবেশন করলেন। অতপর তিনি কালামে পাকের কয়েকটি আয়াত পাঠ করে কন্যা ও জামাতার জন্য রাব্বুল আলামীনের দরবারে মুনাজাত করলেন। মুনাজাত শেষ করে ফাতিমা (রা)-কে দুই পিয়ালা পানি আনতে বললেন। এবং উভয়কে ওযূ করে আসতে বললেন। তারা ওযূ করে আসলে পানিতে দম দিয়ে পানিটুকু উভয়কে পান করালেন।

এবার তিনি প্রিয় কন্যা ও জামাতাকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দান করতে শুরু করলেন। প্রথমেই ফাতিমা (রা)-কে বললেন ঃ মা এবার তোমাদের জীবনের প্রথম অধ্যায় শুরু হল। এতদিন তুমি একরূপ স্বাধীন ছিলে, এবার তুমি তোমার স্বামীর পূর্ণ অধীন হলে। এখন হতে তোমার জীবনের প্রতি পদক্ষেপে স্বামীর হুকুম মেনে চলতে হবে। তাকে সন্তুষ্ট রাখতে হবে। মনোযোগ সহকারে স্বামীর খিদমত করবে। কখনো এমন কাজ করবে না যাতে সে অন্তরে ব্যথা পেতে পারে। তুমি নবীর কন্যা মনে করে কখনো স্বামীর সাথে অবজ্ঞামূলক ব্যবহার করবে না। সংসারে সমস্ত কাজ নিজের হাতে করবে। তোমার স্বামী গরীব বলে তাকে অবজ্ঞা করবে না বা অযোগ্য মনে করবে না। জেনো, আমি তোমাকে অযোগ্য বা অপাত্রে সমর্পণ করিনি। বরং জ্ঞানে-গরিমায়, শিক্ষা-দীক্ষায়, চরিত্রে, আদর্শে, বংশে, বীরত্বে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির হাতে তোমাকে সমর্পণ করেছি। সে অত্যন্ত সরল, নিরহঙ্কার, তাঁর চরিত্র মধুর, জ্ঞানে সে সাগর তুল্য। কাজেই তাঁকে স্বামীরূপে পেয়ে তোমার দুঃখ করবার কোন কারণই নেই বরং তুমি গর্ববোধ করতে পার।

অতপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আলী (রা)-কেও উপদেশ দান করলেন। স্নেহের আলী! ফাতিমার আদর-যত্নে ত্রুটি করো না। তাঁর সাথে উত্তম ব্যবহার করো, তাকে স্নেহ করো, মনে রেখ সেই পুরুষই উত্তম যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম। কখনো তার সাধ্যের অতীত কার্যভার তার উপরে চাপিয়ে দিও না। তোমরা উভয়ে মিলেমিশে সদ্ভাবে জীবন যাপন করো। আমি আল্লাহ্র দরবারে মুনাজাত করছি তিনি তোমাদের সহায় হোন।

এভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কন্যা ও জামাতাকে উপদেশ দান করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। হযরত আলী (রা) হযরত ফাতিমা (রা)-কে নিয়ে সংসার যাত্রা আরম্ভ করলেন সত্য কিন্তু মানুষের দৈনন্দিন জীবনে সংসারে যে সকল জিনিসের একান্ত প্রয়োজন যা না হলে চলতে পারে না হযরত আলী (রা)-র গৃহে তাও ছিল না। গৃহের

www.nagorikpathagar.org

আসবাবপত্রের মধ্যে কয়েকটা মাটির পাত্র, একটি মিসরীয় শয্যা এবং একটি পর্দা তাও রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিবাহকালে কন্যাকে উপহারস্বরূপ দিয়েছিলেন।

জঙ্গে উহুদ বা উহুদ যুদ্ধ

বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে প্রায় এক বছর পূর্বে। কিন্তু এরই মধ্যে আবার কাফিরদের সঙ্গে মুসলমানদের দ্বিতীয় যুদ্ধ—উহুদের যুদ্ধের ঘনঘটা আরবের আকাশে দেখা দিল।

পূর্ব বছর বদর যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মক্কার কুরাইশগণ দমে না গিয়ে সেই পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল। বদর যুদ্ধে যদিও তাদের খ্যাতনামা নেতাদের অধিকাংশই নিহত হয়েছিল তবুও তাদের মধ্যে সাহসী সেনাপতির অভাব ছিল না। এ সময় কুরাইশ দলের মূল নেতৃত্বের ভারবাহী ছিল খ্যাতনামা আবূ সুফিয়ান। তার স্ত্রী হিন্দা ছিল এক ভীষণ চরিত্রের নারী। তারা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই কুরাইশদের মনে প্রতিহিংসার অনল প্রজ্বলিত করে মাত্র একটি বছরের মধ্যেই বিপর্যস্ত কুরাইশদেরকে সংগঠিত করে ইসলাম এবং মুসলমানদেরকে দুনিয়ার বুক হতে নিশ্চিহ্ন করার জন্য পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করল।

পূর্ববর্তী নেতাগণ বদর যুদ্ধের খরচ বাবদ মক্কার কুরাইশদের নিকট হতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা চাঁদা সংগ্রহ করেছিল। বদরে তার একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র খরচ হয়েছিল। অবশিষ্ট মুদ্রাগুলি সম্পূর্ণ আবূ সুফিয়ানের নিকট গচ্ছিত ছিল। এবার সেই মুদ্রা দ্বারা যুদ্ধাস্ত্র ও সরঞ্জামাদি খরিদ করে তিন সহস্র কুরাইশ সৈন্য সুসজ্জিত করল। এই বাহিনীতে লৌহ বর্মধারী দুই শত ছিল অশ্বারোহী অবশিষ্ট উষ্ট্রারোহী এবং পদাতিক সৈনিক।

বিশ্ব বিখ্যাত মহাবীর খালিদ ইবনে অলিদ, আবূ জেহেলের পুত্র আকরামা প্রমুখ বীর এই বাহিনীর পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করল। প্রস্তুতি পর্ব সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত করে আবূ সুফিয়ান বাহিনী নিয়ে মদীনা অভিমুখে যাত্রা করল। বাহিনীর সঙ্গে বহু রণরঙ্গিনী কুরাইশ নারীও যাত্রা করল। এরা অপূর্ব সুরে যুদ্ধ প্রেরণামূলক সঙ্গীত গেয়ে সৈন্যগণকে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করে চলছিল।

একদিকে মুসলমানদিগকে নিধন ও ইসলামের মূলোৎপাটনের এমন বিরাট আয়োজন অভিযান চলেছে অন্যদিকে মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও অন্যান্য মুসলমান কিন্তু এর কিছুই জানতে পারেন নি। তাঁরা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায় দৈনন্দিন কাজকর্মে রত। মক্কায় কুরাইশদের ভীষণ কাণ্ডের খবর তাঁদের নিকট কিছুই পৌঁছল না।

www.nagorikpathagar.org

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র চাচা আব্বাস (রা), তিনি তখনও মুসলমান হন নি এবং মক্কায়ই বাস করতেন। ইসলাম গ্রহণ না করলেও ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ (সা)-এর একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। এমন কি আবূ তালিবের মৃত্যুর পর তিনিই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তিনি কুরাইশদের সমর অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত সংগোপনে বনু গফফার গোত্রের জনৈক বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে এই গুরুতর সংবাদের পত্র দিয়ে মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট প্রেরণ করলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ সময় কার্যোপলক্ষে মদীনা হতে কুবায় এসেছিলেন। পত্রবাহী দূত যথাসময়ে কুবায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট এসে উপস্থিত হলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) দূত মারফত এই ভীষণ মারাত্মক সংবাদ শ্রবণ করে দূতকে এ সংবাদ অন্য কারও নিকট প্রকাশ করতে নিষেধ করলেন। সন্ধ্যার পর তিনি সাহাবী সা'দ বিন রবিকে নির্জনে ডেকে নিয়ে কুরাইশদের যুদ্ধাভিযানের কথা জানালেন। তবে তাকেও তিনি এ কথা কারও নিকট প্রকাশ করতে নিষেধ করে দিলেন।

পরদিন প্রত্যূষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সা'দকে সঙ্গে নিয়ে মদীনায় চলে এলেন। এদিকে সংবাদটি গোপন রইল না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন নির্জনে সাহাবী সা'দকে শুনাচ্ছিলেন সে সময়ে সাদের স্ত্রী আড়াল থেকে তা শুনে ফেলেছিল। পরদিন ভোরে সে তা সকলের নিকট প্রকাশ করে দিল। মদীনায় পৌত্তলিক, ইয়াহূদী ও মুশরিক প্রভৃতি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র শত্রুর অভাব ছিল না। তারা এ খবর শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। তাদের অবস্থা দর্শনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যারপরনাই চিন্তান্বিত হয়ে পড়লেন। তাড়াতাড়ি তিনি সাহাবীদেরকে নিয়ে কর্তব্য নির্ধারণের বৈঠকে বসলেন। সাহাবীগণের নিকটে এবারকার যুদ্ধের পন্থাবলম্বন সম্পর্কে মতামত চাইলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে নগর রক্ষার কথা চিন্তা করে বললেন, এবারে আমাদের বেশি দূরে গিয়ে হয়ত যুদ্ধ করা ঠিক হবে না, তাতে বিপদ ঘটতে পারে; সুতরাং এবার নগর প্রাচীরের মধ্যে থেকেই যুদ্ধ করা ভাল মনে করছি। তোমাদের মধ্যে কার কি মত প্রকাশ করতে পার। মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র মত সমর্থন করে বলল, আপনি যথার্থই বলেছেন। আমরা এবার নগর অভ্যন্তরে থেকেই যুদ্ধ করব। ইতোপূর্বে কেউ মদীনা নগরীকে আক্রমণ করে সফল হতে পারেনি। সুতরাং আমাদের মহিলা ও শিশু সন্তানদের নগর দুর্গে রেখে আমরা নগরের ভিতরে থেকেই শত্রুর প্রতিরোধ করব। আরও কিছু সংখ্যক সাহাবী এই মত সমর্থন করলেন। কিন্তু যে

www.nagorikpathagar.org

সকল সাহাবী বদর যুদ্ধে যোগদান করতে পারেননি নগর রক্ষার কাজে মদীনায় থেকে গিয়েছিলেন তারা এ প্রস্তাব সমর্থন না করে ভিন্ন মত প্রকাশ করলেন।

তারা মদীনার বাইরে গিয়েই শক্রবাহিনীকে বাধা দেয়ার প্রস্তাব দিলেন। বিশেষ করে হামজা (রা), সা'দ বিন আবি ওক্কাস (রা), নু'মান বিন মালিক (রা) প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি এই শেষোক্ত মতেরই সমর্থন করলেন। তাদের যুক্তি এই যে, যদি তারা মদীনার ভিতরে থেকে যুদ্ধ করেন তবে কাফিররা মুসলমানদের কাপুরুষ বলে বিদ্রূপ করবে। হযরত হামজা (রা) এ ব্যাপারে এতদূর অগ্রসর হলেন যে, তিনি প্রতিজ্ঞা করে বসলেন, যতদিন কুরাইশদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে উন্মুক্ত প্রান্তরে যুদ্ধ করতে না পারব ততদিন আমি রোযা রাখবো।

হযরত হামজা (রা)-র এই কঠোর মনোভাব অন্যান্য সাহাবীর উপরও প্রভাব বিস্তার করল। ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত আলী (রা) চাচার এ মতকে রক্ষা করবার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট অনুরোধ করলেন এবং নিজেও তাঁর সমর্থনে মত দান করলেন। হযরত আলী (রা)-র দেখাদেখি ক্রমে আনসার, মুহাজির সকলেই এ মতের দিকে ঝুঁকে পড়লেন।

রাসূলে পাক (সা) দেখলেন সাহাবীদের সকলেই নগরীর বাইরে উন্মুক্ত প্রান্তরে শক্রর মুকাবিলা করবার পক্ষপাতী। অতএব তিনিও তাদের মতে মত দিয়ে মদীনার বাইরে গিয়েই যুদ্ধ করা সাব্যস্ত করলেন। ঘোষণা করে দেওয়া হল ঃ আমরা মদীনার বাইরে গিয়েই শক্র বাহিনীর প্রতিরোধ করব। সকলে প্রস্তুত হও। ঘোষণা অনুযায়ী সাহাবীগণ যুদ্ধের প্রস্তুতি আরম্ভ করলেন। পরদিন শুক্রবার জুম'আর নামায আদায় করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক উদ্দীপনাময়ী ভাষণ দান করলেন। ভাষণ শেষে বললেন ঃ যারা আল্লাহ্ তা'আলার আজ্ঞানুবর্তী কর্তব্যনিষ্ঠ জয় তাদের সুনিশ্চিত।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) নির্দেশ দিলেন ঃ সকলে যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হও। আদেশ মাত্র তা প্রতিপালিত হলো। সাহাবীবৃন্দ অল্প সময়ের মধ্যে যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে মসজিদে নববীর প্রাঙ্গণে সমবেত হলেন। আসরের নামায পড়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজেও যুদ্ধসাজে সজ্জিত হলেন। তিনটি জিহাদী পতাকা প্রস্তুত হলো। এর মধ্যে দু'টি পতাকা আউস ও খাযরাজ গোত্রের দুই দলপতির হাতে প্রদান করলেন। আর একটি পতাকা মাসয়াব বিন উমায়ের (রা)-এর হাতে দিয়ে মুসলিম বাহিনীকে কাতারবন্দী করে যাত্রা করতে নির্দেশ দিলেন।

এই বাহিনীতে এক হাজার সৈন্য ছিল। এতে সত্তরজন ছিল বর্মধারী, দুইজন অশ্বারোহী, পঞ্চাশজন তীরন্দাজ ও বাকি সমস্ত ছিল পদাতিক। বিপক্ষ বাহিনীর সাজসজ্জা, অস্ত্র ও সরঞ্জামাদির কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের

www.nagorikpathagar.org

তুলনায় মুসলিম বাহিনী কত সামান্য তা পাঠকবৃন্দ নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু মুসলিম বাহিনী বাহ্যিক দিক দিয়ে নগণ্য হলেও তাঁরা ছিলেন ঈমানী বলে বলীয়ান। কাজেই তাঁরা নিজেদের বাহ্যিক দুর্বলতার কথা একটুও চিন্তা না করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নির্দেশ অনুযায়ী মদীনা হতে বের হয়ে পড়লেন।

কিন্তু মদীনা হতে বের হবার পরই হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটে গেল। মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ্ বিন উবাই তার তিন শত অনুচর নিয়ে বাহিনী ছেড়ে চলে গেল। মদীনার ভিতরে থেকে যুদ্ধ করতে পারলে তার ষড়যন্ত্রে সুবিধা হবে ভেবে এই প্রস্তাবে জোর সমর্থন দিয়েছিল। এখন সে দেখল তার কথা রক্ষা হলো না। কারণ দেখিয়ে বাহিনী হতে সে সরে পড়ল, তার সরে পড়াতে মুসলিম বাহিনীতে মাত্র সাত শত সৈন্য অবশিষ্ট রইল।

কিন্তু আল্লাহ্র নবী মুহাম্মদ (সা) এতে মোটেই বিচলিত হলেন না বরং আল্লাহ্র দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করলেন। কারণ তিনি ভাবলেন, দুরাচার যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবার পর এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করলে বিশেষ ক্ষতির কারণ ছিল। আল্লাহ্ সে বিপদ হতে রক্ষা করেছেন। এখন তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারলেন।

যাহোক, তৃতীয় হিজরীর ৬ই শাওয়াল তারিখ রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহুদের নিকটবর্তী শুখায়েন নামক স্থানে উপস্থিত হলেন। শনিবার প্রত্যূষে মুসলিম বাহিনীসহ তিনি উহুদ প্রান্তরে উপস্থিত হলেন। বলাবাহুল্য, কুরাইশ নেতা আবূ সুফিয়ান তার বিরাট বাহিনীসহ উহুদ প্রান্তরে উপনীত হয়েছিল। মুসলিম বাহিনী এসে পৌঁছার সাথে সাথেই তারা চঞ্চল হয়ে উঠল।

মদীনা নগরী হতে তিন মাইল ব্যবধানে উহুদ পর্বত অবস্থিত। এই পর্বতের পাদদেশেই উহুদ প্রান্তর। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহুদ প্রান্তর পিছনে রেখে স্বীয় বাহিনী দণ্ডায়মান করালেন। মুসলিম বাহিনীর বামদিকে পর্বত গাত্রে একটা সরু গিরিপথ ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই গিরিপথে পাহারা দেয়ার জন্য পঞ্চাশজন তীরন্দাজ মোতায়েন করলেন। তাদের নেতৃত্বের ভার দিলেন আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা)-এর উপর। তাদের প্রতি কঠোর নির্দেশ দিলেন যুদ্ধে মুসলমানদের জয়-পরাজয় যাই হোক না কেন তারা যেন নির্দেশ ব্যতীত কোনক্রমেই ঐ গিরিপথ পরিত্যাগ না করেন। ইতিমধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। প্রথমেই কুরাইশ পক্ষ হতে বিখ্যাত বীর তালহা ময়দানে এসে সদর্পে নর্তন কুর্দন করত মুসলমানদেরকে মুকাবিলা করবার জন্য আহ্বান করল এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপজনিত কবিতা পাঠ করতে লাগল। বীর কেশরী হযরত আলী (রা) আর সহ্য করতে পারছিলেন না। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট অনুমতি চাইলেন তার মুকাবিলায় যাবার জন্য। রাসূলুল্লাহ্ (সা)

www.nagorikpathagar.org

অনুমতি দিলে তিনি যুদ্ধের ময়দানে চলে গেলেন। যাওয়া মাত্র তালহা আলী (রা)-কে প্রচণ্ড আঘাত করল; কিন্তু সে আঘাত প্রতিহত করে এক আঘাতেই তালহাকে যমালয়ে প্রেরণ করলেন। হযরত আলী (রা)-র হাতে কুরাইশদের একজন শ্রেষ্ঠ বীর এত তাড়াতাড়ি প্রাণ হারালো দেখে তার ভ্রাতা উসমান উন্মত্ত হয়ে হযরত আলী (রা)-র দিকে ছুটে এলো। কিন্তু তাকে আর আলী (রা)-র নিকটে আসতে হলো না। পথিমধ্যে হযরত হামজা (রা) তাকে দিখণ্ডিত করে ফেললেন।

মুহূর্তের মধ্যে দুইজন কুরাইশ বীরের এভাবে নিপাত ঘটায় কুরাইশগণ আর দ্বৈরথ যুদ্ধে সাহসী হলো না। এবার তারা সকলে মিলে একযোগে আক্রমণ করল। তাদের রণরঙ্গিনী মহিলাগণ কুরাইশদের নামোচ্চারণ করত উদ্দীপনাময়ী সঙ্গীত গেয়ে সৈন্যদেরকে উৎসাহিত করতে লাগল। সঙ্গীতের তালে তালে কুরাইশ সৈন্যদের শিরা উপশিরাগুলি নেচে উঠল। তারা বিপুল বিক্রমে মুসলিম সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

কিন্তু মুসলিম বাহিনী এই আক্রমণে একটুও বিচলিত হলেন না। তাঁরা আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করে কাফিরদের প্রতি পাল্টা আঘাত হানতে লাগলেন। বিশেষত শেরে খোদা হযরত আলী (রা), মহাবীর হামজা (রা), হযরত আবূ দাজালা (রা), যিয়াদ (রা), হযরত যুবায়ের (রা) প্রমুখ সাহাবী তাওহীদ বলে বলীয়ান হয়ে কাফির ধ্বংস করে চললেন। তাদের এক একজন বহু কুরাইশ সৈন্য সংহার করলেন। এভাবে কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলার পর কুরাইশ সৈন্য আর টিকে থাকতে পারলো না। তারা মুসলিম সৈন্যদের প্রচণ্ড আক্রমণের বেগ সামলাতে না পেরে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল এবং যে যেদিকে পারল পালাতে লাগল। মুসলিম সৈন্য পলায়নপর শত্রু সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছা মুসলমানদের এই সফলতাই তাদের বিপর্যয়ের কারণ হয়ে পড়ল।

মুসলিম বাহিনীর অনেকেই পলায়নপর সৈন্যদের পরিত্যক্ত রসদ সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক গিরিপথ পাহারায় নিযুক্ত তীরন্দাজ সৈন্যগণ যখন দেখলেন, শত্রু সৈন্য পলায়ন করছে, তখন তারা আর ঐ স্থানে অবস্থান করা প্রয়োজন মনে করলেন না। বরং তারা স্থান ত্যাগ করে রসদ সংগ্রহকারীদের সঙ্গে শরীক হলেন। মাত্র কতিপয় সৈন্য কোথাও না গিয়ে যথাস্থানে দণ্ডায়মান রইলেন।

দূর হতে খালিদ বিন অলীদ মুসলমানদের এই অবস্থা লক্ষ্য করেছিল। পূর্বে সে দুইবার এই গিরিপথ অতিক্রম করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু এবার সে সুযোগ পেয়ে তার অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলো। যে

www.nagorikpathagar.org

সামান্য মুসলিম সৈন্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা প্রাণপণে বাধা দিলেন, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের পরাজিত করে প্রচণ্ড বেগে মুসলিম বাহিনীর পশ্চাৎদিক হতে আক্রমণ করে বসল। এ সময় তারা লাত, ওজ্জা, হুবলের জয় ধ্বনি দিতে লাগল। ধ্বনি শুনে পলায়নপর কুরাইশ সৈন্যরাও ফিরে দাঁড়াল এবং মুসলমানদের উপরে হামলা চালাল। এবার মুসলিম বাহিনী সম্মুখ এবং পিছন দু'দিক হতে আক্রান্ত হয়ে মহাদুর্যোগে পতিত হল। মুসলমানরা এই অতর্কিত আক্রমণের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। কাজেই তাদের সুশৃঙখলভাবে আক্রমণ করা সম্ভব হল না। অতএব তারা যে যেখানে ছিলেন সেখান থেকেই যুদ্ধ করতে লাগলেন। কাজেই তাঁদের আক্রমণে বিশেষ কাজ হল না। এই আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ চলাকালে সহসা পশ্চাৎদিক হতে আক্রান্ত হয়ে হযরত হামজা (রা) শাহাদাত বরণ করলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুসলমানদের এই চরম দুর্যোগ লক্ষ্য করে একত্রিত হবার আহবান করলেন। কিন্তু তাঁরা এদিক-সেদিক বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন। কুরাইশদের আক্রমণে কেউ কেউ ব্যতিব্যস্ত হয়ে পর্বতারোহণ করেও জান বাঁচাবার চেষ্টা করলেন।

এই মূহূর্তে কতিপয় কুরাইশ সৈন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হত্যা করবার মানসে তাঁর পিছন দিক থেকে অগ্রসর হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র জীবন বিপন্ন দেখে কয়েকজন ভক্ত সাহাবা (রা) সবেগে ছুটে এসে তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালেন। কুরাইশ সৈন্যগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হত্যা করতে বদ্ধপরিকর হয়ে সর্বশক্তি নিয়োগ করল। চতুর্দিক হতে তীর, তরবারি, বর্শা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র দিকে নিক্ষিপ্ত হতে লাগল। যাঁরা তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিলেন ঢালের মত অস্ত্র বৃষ্টি সহ্য করে তাঁকে রক্ষা করতে লাগলেন। প্রত্যেকের অঙ্গ বয়ে রক্তের স্রোত প্রবাহিত হল। তবুও তাঁরা এক পাও হটলেন না। কিন্তু এমতাবস্থায় কতক্ষণ আর প্রাণ টিকিয়ে রাখা যায়! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে রক্ষা করতে গিয়ে একে একে কয়েকজন সাহাবী প্রাণ উৎসর্গ করলেন—এভাবে কয়েকজন সাহাবী (রা) শহীদ হলেন। হযরত যিয়াদ বিন হারিস (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে রক্ষা করার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করছিলেন। এমনকি তিনি আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তাঁকে আমার নিকট নিয়ে এস। তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট উপস্থিত করা হল। তিনি হুযূরে পাক (সা)-এর মুবারক কদমে মাথা রেখে চির জনমের মত চক্ষু বন্ধ করলেন। হযরত তালহা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হিফাজত করছিলেন এবং কাফিরদের তীর এসে পৃষ্ঠে বিদ্ধ হচ্ছিল। যুদ্ধ শেষে দেখা গেল সত্তরটিরও বেশি তীর তাঁর শরীরে বিদ্ধ হয়েছিল।

www.nagorikpathagar.org

প্রাণপণ চেষ্টা করেও আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)-কে অক্ষত রাখা সম্ভব হলো না। শত্রুদের তীর এবং প্রস্তর নিক্ষেপে তাঁর মুবারক দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল। অঙ্গের বসন রক্তে ভেসে গেল। এক পাষণ্ড কাফিরের প্রস্তরের আঘাতে দুটো মুবারক দন্ত ভেঙ্গে গেল। সহসা এক দুরাচার এসে রাসূলে পাক (সা)-এর পবিত্র মস্তক লক্ষ্য করে প্রচণ্ড বেগে তরবারির আঘাত হানল। হযরত তালহা (রা) খালি হাতে সে আঘাত প্রতিরোধ করলেন। আঘাতে তাঁর আঙ্গুলগুলি কেটে পড়ে গেল। আঘাতের বেগ এমনি প্রচণ্ড ছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র শিরস্ত্রাণ কেটে গিয়ে তার লৌহ কড়া ললাটদেশে ঢুকে গেল। তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। মুসলমানদের এই সংকটকালে পতাকাবাহী হযরত মাস'আব ইবনে উমায়ের (রা) যখন ধুলায় লুটিয়ে পড়ে শাহাদত বরণ করলেন, তখন বীর সিংহ হযরত আলী (রা) ছুটে এসে তার হস্তস্থিত পতাকা নিজের হাতে তুলে নিলেন এবং হায়দারী হাকে মেদিনী কাঁপিয়ে ক্রুদ্ধ শার্দূলের মত কুরাইশ সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁর তখন নিজের জীবনের মায়ামমতা ছিল না। তিনি বিজয় গর্বিত কুরাইশদের ছত্রভঙ্গ করে তাদের পতাকাবাহী বীর আবূ সা'দ ইবনে আবূ তালহার দিকে ধাবিত হলেন। আলী (রা)-কে এভাবে ধাবিত হতে দেখে সেও সদর্পে তার দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। কিন্তু সে আলী (রা)-র নিকটে আসা মাত্রই তাকে এমন প্রচণ্ড জোরে এক চপেটাঘাত করলেন যে, সে সংজ্ঞা হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। এবং তার পরিধানের বস্ত্র খসে পড়ে গেল। হযরত আলী (রা) তার এই দুর্দশা দেখে তাকে কিছু না বলে দ্রুত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট চলে আসলেন। এদিকে তালহা (রা) নিজে সাংঘাকিতরূপে আহত হয়েও অচৈতন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ধরে তুলে নিয়েছিলেন।

উহুদে মুসলমানদের বিপর্যয়ের খবর মদীনায় পৌছলে শোকাভিভূত বহু কুলবালা ক্রন্দনরত অবস্থায় যুদ্ধস্থলে ছুটে উপস্থিত হলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র মারাত্মক আঘাতের কথা শুনে হযরত ফাতিমা (রা) আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ উহুদ প্রান্তরে ছুটে এলেন। আহত পিতার নিকট গিয়ে তাঁর মাথা নিজের ক্রোড়ে তুলে নিলেন। হযরত আলী (রা) ঢাল ভরে ঝরনা হতে পানি এনে দিলেন এবং ফাতিমা (রা) ধুইয়ে পরিষ্কার করে দিতে লাগলেন। কিন্তু কিছুতেই রক্ত বন্ধ হচ্ছিল না দেখে হযরত আলী (রা) চাটাই পুড়িয়ে সেই ভস্ম জখমের উপর লেপে দিলেন। এতে রক্তধারা কিছুটা বন্ধ হলো।

এদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র উপর তরবারি নিক্ষেপকারী কাফির তাঁকে মাটিতে পড়ে যেতে দেখে ভেবেছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা) শহীদ হয়েছেন। সে মনের আনন্দে জোরেশোরে কুরাইশদের মধ্যে এই কথা প্রচার করে দিল। কুরাইশদের

www.nagorikpathagar.org

প্রধান লক্ষ্য ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হত্যা করে ঝামেলা মিটিয়ে ফেলা। তারা ভাবল, তাই যখন সমাধা হলো তখন আর যুদ্ধের প্রয়োজন কি? সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই কুরাইশদের আক্রমণের তীব্রতা কমে গেল। তারা মনে করল একমাত্র মুহাম্মদ (সা)-এর কারণেই তো যুদ্ধ-বিগ্রহ, এখন সে-ই যখন শেষ হয়ে গেল তখন আবার যুদ্ধ কিসের ? এই চিন্তা করে তারা শিবিরে ফিরে গেল।

এ সময় সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নিয়ে পর্বত শীর্ষে শুশ্রূষায় ব্যস্ত। এদিকে যুদ্ধ বিরত কুরাইশগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র মুবারক মৃতদেহ বের করবার জন্য বিক্ষিপ্ত মুসলিম শহীদানগণের মৃতদেহ পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। খুঁজতে খুঁজতে হযরত হামজা (রা)-র মৃতদেহ বের হয়ে পড়ল। আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা ভীষণ প্রতিহিংসাপরায়ণা নির্দয়া রমণী ছিল। সে উল্লসিত হয়ে উঠল। হযরত হামজা (রা)-র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন করে তা দ্বারা মালা বানিয়ে গলায় পরিধান করল। বক্ষ চিরে হৃৎপিণ্ড বের করে পিশাচিনী নারী তা চিবাতে লাগল। অদূরে পর্বত শীর্ষ হতে এই দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র হৃদয় কেঁপে উঠল। তিনি শোকাভিভূত হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে বলতে লাগলেন, আমার প্রভু যার অমিত বিক্রমে প্রসিদ্ধ কুরাইশ বীরেরা থর থর করে কাঁপত তাঁর দেহের একি দুর্দশা। জানি না প্রভু এর মধ্যে তোমার কি উদ্দেশ্য নিহিত, দয়াময় প্রভু দীনের সেবককে জান্নাতবাসী কর।

হযরত হামজা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র অত্যন্ত প্রিয় পিতৃব্য ছিলেন। ইসলামের ও মুসলমানদের খিদমতে তিনি স্বীয় দেহ-মন প্রতি মুহূর্তের জন্য নিয়োজিত রেখেছিলেন। আরবের পরাক্রমশালী কাফিররা রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুসলমানদের সাথে চরম শত্রুতায় অবতীর্ণ হয়ে যখন হামজা (রা)-কে তাদের মাঝে দেখতে পেত তখন আপনা হতেই তাদের পা পিছনের দিকে ধাবিত হত।

বস্তুত তার ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত আলী (রা) ব্যতীত তৎকালে আরবে তাঁর সমকক্ষ বীর আর কেউ ছিল না। দুর্ধর্ষ উমর (রা) যেদিন ইসলাম গ্রহণের পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র শিরশ্ছেদ করার জন্যে সদর্পে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র পানে উলঙ্গ তরবারি নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন, উমরের ভীষণ মূর্তি দেখে অনেকেরই হৃদয় কাঁপছিল। কিন্তু হযরত হামজা (রা) উমর (রা)-এর কোন গুরুত্বই দেননি, বরং গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিলেন, উমর! কোন সদুদ্দেশ্য নিয়ে আসলে নির্বিঘ্নে চলে এস, কিন্তু যদি কোন অসৎ উদ্দেশ্য থাকে তবে হাজমার হাতে উপযুক্ত শিক্ষা পেতে হবে। এরূপ বহু ঘটনাই হামজার জীবনকে ঘিরে ছিল। তা একে একে মনে হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র পবিত্র হৃদয়খানা শোকে দুঃখে একেবারে ব্যাকুল হয়ে পড়ল। তখন জিবরাঈল (আ) আল্লাহ্‌র তরফ হতে সান্ত্বনার বাণীসহ অবতীর্ণ হয়ে

www.nagorikpathagar.org

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সুসংবাদ প্রদান করলেন। হে আল্লাহ্র নবী! আপনি ব্যাকুল হবেন না। আপনার পিতৃব্য হামজা (রা) আল্লাহর ইচ্ছায় বেহেশ্তবাসী হয়েছেন। আল্লাহ্র দরবারে তাকে ইসলাম প্রচারক সিংহ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। জিবরাঈল (আ)-এর নিকট এই সান্ত্বনার বাণী শ্রবণ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) শান্তি লাভ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে এই সংবাদ সাহাবীগণকেও শুনিয়ে দিলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রাথমিক পরিচর্যার পর কিছু সুস্থ হলে মুসলিম মুজাহিদগণ কাফিরদেরকে পুনরায় আক্রমণ করতে পর্বত শৃঙ্গ হতে অবতরণ করলেন। কিন্তু কাফিররা যুদ্ধের ময়দান পরিত্যাগ করে বহু দূরে চলে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে শহীদ হন নাই সে সংবাদ তারা জানতে পেরেছিল। সুতরাং মুসলমানেরা সমবেত হয়ে আবার তাদের আক্রমণ করতে পারে তাদের মনে এই আশংকা ছিল। আবার যদি যুদ্ধ আরম্ভ হয় তবে মুসলমানদের সঙ্গে পেরে উঠা কঠিন ব্যাপার। কেননা প্রাথমিক পর্যায়ে যুদ্ধে জয়লাভ করেছে, দ্বিতীয় পর্যায়ে যুদ্ধে হয়ত জয়লাভ নাও করতে পারে এই চিন্তা-ভাবনা করে তারা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে মক্কাভিমুখে ফিরে চলল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের উদ্দেশ্য অনুধাবন করে কতিপয় সাহাবীকে তাদের পশ্চাতে প্রেরণ করলেন। তাদের বলে দিলেন, যদি দেখ কুরাইশগণ উষ্ট্রারোহণে গমন করছে তবে বুঝবে যে তারা মক্কায় ফিরে চলেছে। আর যদি দেখ তারা অশ্বারোহণে গমন করছে তবে বুঝবে তারা মদীনা আক্রমণ করতে চলেছে। তবে আমাদের তার ব্যবস্থা করতে হবে। বস্তুতঃপক্ষে কুরাইশগণ উষ্ট্রারোহণে মক্কায় ফিরে চলেছিল। এই সংবাদ প্রাপ্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিশ্চিন্ত হলেন। অতপর তিনি পর্বত হতে নিচে অবতরণ করলেন। যুদ্ধের ময়দান ঘুরে মুসলমান শহীদদের সংখ্যা নিরূপণ করা হল। সত্তরজন মুসলমান এই যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন।

শহীদদের যথারীতি দাফন করত রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন। উহুদের যুদ্ধ কয়েকটা কারণে মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

(ক) নেতার নির্দেশ মানার প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। নতুবা বিপদ ঘটতে পারে। এই যুদ্ধে মুসলমানরা সাফল্যের স্বর্ণদ্বারে পৌছেও কিন্তু শেষ পর্যন্ত নেতার নির্দেশ পালনে অবহেলা করায় তাদের সাফল্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য হয়।

(খ) ক্ষুদ্র স্বার্থের আশায় কর্তব্যচ্যুত হওয়া ভুল পদক্ষেপ। যুদ্ধে জয়লাভ করে মুসলিম বাহিনী যখন শত্রুদের পরিত্যক্ত মালামাল লুণ্ঠনে ব্যাপৃত হলেন, তা দেখে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পাহারারত মুজাহিদগণ যদি তাদের স্থান ত্যাগ না করতেন তা হলে মুসলিম বাহিনী পরে এরূপ বিপর্যস্ত হতেন না।

www.nagorikpathagar.org

(গ) পক্ষান্তরে কঠিন দুর্যোগের মধ্যেও মুসলমানগণ ঈমানের কঠিন অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। যারা ভুল করেন নাই তাদের তো কথাই নাই, কিন্তু যারা এক পর্যায়ে ভুল করেছিলেন তারাও শেষ পর্যন্ত জীবনের মায়া বিসর্জন দিয়েও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র জীবন রক্ষা করতে ইসলামের দুশমনদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে একই স্থানে সমবেত হয়ে সাধ্যানুযায়ী সংগ্রাম করেছিলেন।

(ঘ) এই যুদ্ধে প্রধান ভূমিকা ছিল হযরত আলী (রা)-র। প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত তিনি যে ধরনের বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন তার নযীর মেলা কঠিন। বিশেষ করে যুদ্ধে মুসলমানদের যখন চরম বিপর্যয়, কুরাইশ সৈন্যের মারাত্মক আক্রমণে মুসলিম সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ দিশাহারা, ইসলামের পতাকাবাহী হযরত মাস্‌আব (রা) শহীদ হওয়ায় পতাকা ভূলুণ্ঠিত হবার উপক্রম হয়, তখন হযরত আলী (রা) ক্ষিপ্রগতিতে ছুটে এসে পতাকা তুলে ধরে ইসলামের মর্যাদা রক্ষা করলেন। অতপর বজ্রের মত আওয়াজ তুলে শত্রু সৈন্য সংহার করে যে অপূর্ব কীর্তি স্থাপন করেছিলেন তা ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

জঙ্গে হামরাউল আসাদ ঃ উহুদের পরবর্তী ঘটনা

উহুদ প্রান্তর হতে মক্কা প্রত্যাবর্তনের পথে কুরাইশগণ মদীনা থেকে আট মাইল দূরে হামরাউল আসাদ নামক স্থানে পৌঁছে বিশ্রাম উপলক্ষে যাত্রা স্থগিত রেখে সেখানে বসে বিশ্রামকালে তাদের মনে একটি ভাবনার উদয় হলো যে, তারা মক্কা হতে কি জন্যই বা এসেছিল আর কি করেই বা প্রত্যাবর্তন করছে। তারা অভিযান করেছিল মদীনা আক্রমণ করতে এবং মুহাম্মদ (সা)-কে নিহত করতে। কিন্তু তার কোনটাইতো হলো না। এ অভিযান তো তাদের ব্যর্থই হয়েছে, কে বলে তারা সাফল্য লাভ করেছে! এরূপ চিন্তা করে একদল কুরাইশ সহসা উত্তেজিত হয়ে উঠল। আমাদের আর মক্কায় ফিরে কাজ নেই। চল আমরা মদীনা আক্রমণ করি। ধীরস্থির বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা বলল ঃ না মদীনা আক্রমণে বিপদ ঘটতে পারে। কারণ মদীনা আক্রমণ করলে মুহাম্মদ (সা)-এর সঙ্গে যারা উহুদে না এসে মদীনায় অবস্থান করেছে তারাও একযোগে আমাদের বিপক্ষে অবতীর্ণ হলে আমাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে।

উগ্রপন্থীদল তাদের কথায় কর্ণপাত করলো না। বিশেষত কুরাইশ নেতা আবূ সুফিয়ান, আবূ জেহেলের পুত্র আকরামা অধিকাংশ সৈন্যকেই মদীনা আক্রমণের ব্যাপারে উত্তেজিত করে ফেলল। আক্রমণে অনিচ্ছুকদের কথায় কোন দাম দিল না। পুনরায় আবূ সুফিয়ানের নেতৃত্বে কুরাইশগণ তাদের গতিপথ পরিবর্তন করে মদীনার দিকে ধাবিত হল।

www.nagorikpathagar.org

এদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক নিযুক্ত কুরাইশদের গতিবিধি তদন্তকারী চরগণ দ্রুত এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট পৌছালেন। তিনি কতিপয় শীর্ষ স্থানীয় সাহাবীর সাথে পরামর্শ করত পথিমধ্যেই কুরাইশদের প্রতিরোধ করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। রাত্রি অতিবাহিত হয়ে গেল। পরদিন ভোরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফজরের নামায সমাপ্ত করে পরক্ষণেই সাহাবীগণকে পুনরায় যুদ্ধগমনের নির্দেশ দিলেন। যদিও সাহাবীগণ অনেকেই আহত, শ্রান্ত, ক্লান্ত ও অবসন্ন ছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র আদেশ মাত্র কালবিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ যাত্রা করতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। হযরত আলী (রা) যুদ্ধ পতাকা গ্রহণ করলেন। মুসলিম বাহিনী আবার যুদ্ধ যাত্রা করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের এই অভিযানের সংবাদ কুরাইশ ও আবূ সুফিয়ানের কর্ণগোচর হলো। সে সংবাদ শুনে ভীত হয়ে পড়ল। তার ধারণা হলো মুসলিম বাহিনী মোটেই দুর্বল হয় নাই এবং তজ্জন্যই তারা আবার তাড়াতাড়ি মুকাবিলায় অবতীর্ণ হতে পেরেছে। কুরাইশ বাহিনী মদীনা আক্রমণের আশা পরিত্যাগ করত আবার মক্কার পথে যাত্রা শুরু করল।

ওদিকে মুসলিম বাহিনী অগ্রসর হয়ে হামরাউল আসাদ পৌছে শিবির স্থাপন করলেন এবং শত্রু সৈন্যের আগমন অপেক্ষায় কয়েকদিন অতিবাহিত করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের নাম-নিশানা না দেখে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

উহুদ যুদ্ধের পর দুই মাস পর্যন্ত একরূপ শান্তিতেই কাটলো। তারপর বনী নাজির নাম করে একটি ইয়াহূদী গোত্র জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা করে বেশ কয়েকজন নিরপরাধ মুসলমানকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। এই বিশ্বাসঘাতকতা ও সন্ধি ভংগের অপরাধের জন্য মুসলমানগণ এদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। এই মুহূর্তে নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করেন হযরত আলী (রা)। তিন সপ্তাহ পর্যন্ত ইয়াহূদীদের দুর্গ অবরোধ করে রাখা হয়। অবশেষে তারা মুসলমানদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের মদীনা হতে বিতাড়িত করে দেন।

দ্বিতীয় বদর অভিযান

উহুদ প্রান্তর হতে প্রত্যাবর্তন কালে কুরাইশ নেতা আবূ সুফিয়ান বিজয় লাভ করতে না পেরে মুসলমানদের লক্ষ্য করে বলে গিয়েছিল আগামী বছর বদরে তোমাদের সঙ্গে আবার শক্তি পরীক্ষা হবে। এর জবাবে হযরত উমর (রা) বলেছিলেন ঃ ভবিষ্যতের ব্যাপার তো শুধু আল্লাহ্র হাতে, তাঁর মর্জিতেই সবকিছু ঘটে। তবে তাঁর উপর ভরসা রেখে বলছি। তোমরা প্রস্তুত থাকলে ইনশা আল্লাহ্ আমরাও প্রস্তুত আছি।

www.nagorikpathagar.org

পিছিয়ে দিতে পারলেই সবদিক রক্ষা হয়। একদিকে যেমন যুদ্ধ করার প্রয়োজন হয় না, অন্যদিকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের দোষও তার উপর আসে না।

এই বুদ্ধি কাজে লাগাবার একটা সুযোগও মিলে গেল। নঈম বিন মাসউদ নামক জনৈক অমুসলিম ব্যক্তি কার্যোপলক্ষে মদীনা হতে মক্কায় আগমন করল। আবূ সুফিয়ান তার নিকট জানতে পারল এই বছর মুসলমানরা বহু যুদ্ধাস্ত্র লাভ করেছে। এই সংবাদে আবূ সুফিয়ান আরও ভীত হয়ে পড়ল। বদর ও উহুদে আমাদের তুলনায় অস্ত্র ছাড়াই মুসলিমগণ যেভাবে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তাতে তারা যদি অস্ত্র পেয়ে থাকে এবং অস্ত্র নিয়ে যদি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তাহলে তাদের সম্মুখে দাঁড়াবে এমন শক্তি কার আছে ? অতএব তাদের বিরুদ্ধে আপাতত যুদ্ধের আশা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে আবূ সুফিয়ান তার পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে আরও বেশি চেষ্টিত হলো। সে নঈম দ্বারাই এই কার্য উদ্ধারের চেষ্টা করল। মুসলমানদের শত্রু হিসাবে মক্কার লোক ও মদীনার লোকের মধ্যে মৈত্রী বিদ্যমান। সুতরাং নঈমের কাছে আপন সন্ধির কথা খুলে বলতে তার কোন অসুবিধা নেই। আবূ সুফিয়ান নঈমকে বলল, এই বছর আমরা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করবার ইচ্ছা করেছিলাম কিন্তু আমাদের এলাকায় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে এ কারণে আমরা মদীনা আক্রমণ করতে পারব না। কিন্তু তুমি মুসলমানগণকে বলবে, কুরাইশগণ অসংখ্য সৈন্য এবং বিপুল পরিমাণে অস্ত্রসম্ভারসহ তোমাদের আক্রমণ করতে আসছে। এই সংবাদ শুনে যদি তারা যুদ্ধ করতে বের না হয় তা হলে আমরা অঙ্গীকার ভঙ্গের দোষ হতে বেঁচে যেতে পারি। আর এ কাজটি যদি তুমি উত্তমরূপে সম্পন্ন করতে পার তা হলে আমরা তোমাকে বিশটি উষ্ট্র পুরস্কার দিব।

নঈম এই লোভনীয় পুরস্কারের আশায় তাড়াতাড়ি মক্কা হতে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করল। এই লোকটিও ধুরন্ধর কম ছিল না, সে প্রতারণার উদ্দেশ্যে মস্তক মুণ্ডন করল, যেন মুসলমানগণ দেখে মনে করে সে মক্কায় ওমরা ব্রত পালন করতে গিয়েছিল। মাথা মুড়িয়ে সে মুসলমানদের নিকট গিয়ে বলল, আমি ওমরা আদায় করতে মক্কায় গিয়েছিলাম। সেখানে দেখে আসলাম কুরাইশগণ তোমাদের ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে বিপুল রণসম্ভারে সজ্জিত হয়ে বিরাট বাহিনী নিয়ে মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

নঈমের প্রতারণা কার্যকরী হলো না। কারণ কতিপয় মুসলমান ভীতসন্ত্রস্ত হলেও হযরত আবূ বকর ও উমর (রা) প্রমুখ সাহাবী বললেন, আমরাও এ বছর কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব বলে পূর্ব হতেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে আছি। যদি আমরা তা না করি তবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের দোষে দোষী হব।

www.nagorikpathagar.org

রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুরাইশদের রণসজ্জার সংবাদে মোটেই বিচলিত হলেন না। তবে সাহাবীদের মনোভাব জানবার জন্যই স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করতে বিরত রইলেন। যখন দেখলেন সাহাবীগণ যুদ্ধ করতে প্রস্তুত রয়েছেন তখন তিনি তাদের যুদ্ধ সজ্জার জন্য নির্দেশ দিলেন। অনতিবিলম্বে যুদ্ধ সজ্জা সম্পন্ন করে সাহাবীগণ বদর অভিমুখে যাত্রা করলেন। এই অভিযানেও শেরে খোদা হযরত আলী (রা)-র হাতে যুদ্ধের পতাকা অর্পিত হলো। দেড় হাজার মুসলিম সৈনিক মদীনা হতে বের হয়ে বদর প্রান্তরের দিকে অভিযান শুরু করলেন। পতাকা হস্তে হযরত আলী (রা) বাহিনীর অগ্রে অগ্রে চললেন। বদর প্রান্তরে উপনীত হয়ে মুসলিম বাহিনী আট দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। কিন্তু কুরাইশদের কোন চিহ্নই পাওয়া গেল না। অবশেষে তারা বিনা যুদ্ধেই মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

ওদিকে আবূ সুফিয়ান তার দুরভিসন্ধিমূলক পরিকল্পনা অনুযায়ী শুধু মুসলমানদের ভয় দেখাবার জন্য দুই হাজার সৈন্য ও পঞ্চাশটি অশ্ব নিয়ে মক্কা হতে বের হলো। কিন্তু মক্কা হতে মাত্র আট মাইল দূরে এসেই শুনতে পেল মুসলমানগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে বদর প্রান্তরে অবস্থান করছেন। আবূ সুফিয়ান ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে মক্কা অভিমুখে প্রস্থান করল।

মক্কায় ফিরে গিয়ে সে দুর্নাম হতে বাঁচার জন্য এরূপ মিথ্যা রটনা প্রচার করল যে, প্রচণ্ড সূর্যের তাপে পথ-প্রান্তর এমন শুষ্ক হয়ে গেছে যার কারণে পশুর আহার উপযোগী তৃণলতার পর্যন্ত অস্তিত্ব নেই। এমতাবস্থায় সেই দুর্গম মরুপথ অতিক্রম করত মদীনা আক্রমণ করতে গেলে হয়ত পথিমধ্যেই উষ্ট্র ও সৈন্য সকলেরই বিয়োগ ঘটবে। এ কারণেই এবারকার মত মদীনা আক্রমণ করা হতে বিরত রইলাম।

আবূ সুফিয়ানের এই প্রচারণা মক্কার সকল মানুষের নিকট বিশ্বাসযোগ্য হল না। কেউ কেউ তার সমালোচনাও করল। উমাইয়া বিন সুফিয়ান আবূ সুফিয়ানকে বলল, এই বছর মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন বলে আপনি কুরাইশদের পক্ষ হতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু তা পালন করতে সক্ষম হলেন না। এতে মুসলমানগণ নিশ্চয়ই আমাদের দুর্বল মনে করবে। তারা এখন নিজদেরকে আমাদের অপেক্ষা প্রবল ভাবতে থাকবে। এমতাবস্থায় তাদের এ মনোভাব বিনষ্ট করতে তৎপর হওয়া আমাদের জন্য আশু প্রয়োজন। একথা আবূ সুফিয়ানও ভালরূপেই বুঝেছিল। তাই সে তখন হতেই সৈন্য ও অস্ত্র সবদিক দিয়ে শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টায় লেগে গেল।

www.nagorikpathagar.org

বনী মুস্তালিকের যুদ্ধ

পঞ্চম হিজরীর ২রা শাবান সোমবার বনী মুস্তালিকের সাথে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তারা ছিল ইসলাম এবং মুসলমানের বড় রকমের শত্রু। এ কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের দমন করার প্রয়োজন অনুভব করলেন। তাদের প্রস্তুত হবার সুযোগ না দিয়ে অতর্কিতভাবে হঠাৎ হামলা করে বসেন এবং মুসলমানগণ যুদ্ধে জয়লাভ করেন। যুদ্ধে বনী মুস্তালিক নেতা হারেসসহ আরও দশজন নিহত হয়। এছাড়া আরও দুইশ শত্রু সৈন্য মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। মালে গনিমত স্বরূপ মুসলমানগণ বনী মুস্তালিকদের পাঁচ শ মেষ, পাঁচ শ উষ্ট্র লাভ করেন।

চতুর্থ হিজরীতে আল্লাহ্ তা'আলা পর্দা ফরয করেন। পঞ্চম হিজরীতে বনী মুস্তালিক যুদ্ধাভিযানকালে হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা) একটি পৃথক উষ্ট্রে আরোহণ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র সহগামিনী হন। অবশ্য ইসলামের বিধান অনুসারে সম্পূর্ণরূপে পর্দা রক্ষা করে তিনি প্রবাস যাপন করেছিলেন। এবারের যুদ্ধের পূর্বে মুনাফিকগণ বুঝতে পেরেছিল যে, এটা তেমন ঘোরতর যুদ্ধ যাত্রা নয়, কাজেই আহত-নিহতের আশংকাও কম। মালে গনিমত প্রচুর মিলবার সম্ভাবনা ছিল। এ কারণে মুনাফিকদের একটি বিরাট দল এবার মুসলমানদের সাথে অভিযানে শরীক হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র সহগামিনী উম্মুল মু'মিনিন হযরত আয়িশা (রা) এ সময় মাত্র সপ্তদশ বছরের বালিকা, শরীর তখন তাঁর ছিল অত্যন্ত তন্বী ধরনের। প্রবাসে তিনি ভিন্ন উটে নিজের হাওদায় আরোহণ করতেন। তার হাওদায় আরোহণের পর উষ্ট্রের পৃষ্ঠে তুলে দেয়া হত। এই সময় তাঁর দেহ এমন হালকা-পাতলা ছিল যে, তাকেসহ হাওদা তুলে দিতে একটি সবল লোকের পক্ষে মোটেই কষ্ট হত না।

যা হোক, যুদ্ধশেষে মদীনায় প্রত্যাবর্তনকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র সৈন্য বাহিনী ৫ই শাবান বৃহস্পতিবার পথিমধ্যে কোন এক স্থানে রাত্রি যাপন করার মত শিবির স্থাপন করলেন। পরদিন অতি প্রত্যূষে উঠে কাফেলা পুনঃযাত্রা করার জন্য যখন প্রস্তুতি আরম্ভ করল, তখন হযরত আয়িশা (রা) হাজতে ইনছানির জন্য বাইরে গমন করেছিলেন। এ উপলক্ষেই তার পুণ্য পূতপবিত্র চরিত্রের উপরে কলঙ্কারোপিত হল।

অল্পবয়স্কা বালিকাসুলভ প্রবৃত্তির বশে তিনি প্রবাস যাত্রাকালে ভগ্নি আসমার নিকট হতে একছড়া হার নিজে পরবার জন্য চেয়ে নিয়েছিলেন। হাজত সেরে ফিরবার পথে হার ছড়া দেখতে পেলেন না। অথচ হাজতে যাবার সময় হার ছড়া গলায় ছিল। তখন তিনি যে স্থানে হাজতে গিয়েছিলেন, সে স্থানে হার খুঁজবার জন্য গমন করলেন।

www.nagorikpathagar.org

এদিকে কাফেলার যাত্রার প্রস্তুতি শেষ হয়ে গেল। হযরত আয়িশা (রা) হাওদার থেকে বের হবার সময় হাওদার পর্দা তুলে রাখতেন। কিন্তু ঐ সময় দুর্ভাগ্যবশত পর্দা পড়ে গিয়েছিল। উষ্ট্রের চালক মনে করলেন তিনি হাওদার ভিতরেই আছেন। একটু পরেই কাফেলা যাত্রা করল।

এদিকে প্রবাস চলাফেরায় অনভিজ্ঞা আয়িশা (রা) হার অন্বেষণে বিলম্ব করে ফেললেন। দেরি হবার কথাও বটে, একেতো অনভিজ্ঞা, প্রবাসের বিপদাপদ সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না, দ্বিতীয়ত হারের আকর্ষণে তিনি অস্থির ছিলেন। তৃতীয়ত হার ছড়া ছিল অন্যের কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া। বিশেষত এ কারণেই তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। এই উদ্বিগ্নতার কথা তিনি যে কারো নিকট বলে যেতে পারেন নি এজন্য কাফেলা তাকে ফেলে যেতে পারে, এ বিপদের কথাটি একবারের জন্যও খেয়াল হল না।

কিছু সময় খোঁজাখুঁজির পরে হার পাওয়া গেল। হার নিয়ে যথাসময়ে তিনি চলে এলেন। কিন্তু এসে দেখেন কাফেলা চলে গিয়েছে। অবলা বালিকা, বিদেশ বিভুঁই, অজানা-অচেনা পথ, এখন তিনি একা একেলা কোন্ দিকে কোথায় যাবেন ভেবে অস্থির হয়ে পড়লেন। ভাবতে ভাবতে সহসা তাঁর মাথায় একটা বুদ্ধি আসলো। তিনি স্থির করলেন এই স্থানেই থাকা শ্রেয়। কারণ যখন তাঁর হাওদা শূন্য ধরা পড়বে, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই স্থানেই তাঁর সন্ধানে আসবেন। এরূপ চিন্তা করে আয়িশা সিদ্দীকা (রা) একখানা চাদরাবৃতা হয়ে সেখানেই শুয়ে পড়লেন। প্রবাসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র ব্যবস্থা ছিল শিবির তুলে কাফেলা যাবার পর একটি লোক কাফেলার কোন জিনিসপত্র পড়ে রইল কিনা দেখে, পড়ে থাকলে তা কুড়িয়ে নিয়ে পরে সে কাফেলার সঙ্গে মিশত। ঐ সময় সাহাবী সাফওয়ান ইবনে মুকাততিল (রা) এই কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাফেলা চলে যাবার পরও তিনি থেকে গিয়েছিলেন।

প্রভাতের আলো তখনো ভালরূপে প্রকাশিত হয় নাই। চারদিক কেবল ফর্সা হয়ে উঠেছে। তারই আলোকে তিনি দূর হতে দেখতে পেলেন যেন ভূমির উপরে কালো রংয়ের কি যেন একটা জিনিস পড়ে রয়েছে। কাফেলার কোন জিনিস ভেবে তিনি তাড়াতাড়ি তার নিকট চলে আসলেন। আয়িশা (রা)-কে তিনি পর্দার আয়াত নাজিল হওয়ার পূর্বে দেখেছিলেন। সুতরাং দেখামাত্র চিনে ফেললেন। এবং বলে উঠলেন, 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।' আয়িশা সিদ্দীকা (রা) চক্ষু বন্ধ করে পড়েছিলেন। আওয়াজ শুনে চোখ খুললেন।

www.nagorikpathagar.org

সাফওয়ান (রা) হযরত আয়িশা (রা)-কে এ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে তিনি চিন্তান্বিত হয়ে পড়লেন। এখন কি করা উচিত তিনি তা বুঝে উঠতে পারছিলেন না। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র অসাক্ষাতে উম্মুল মু'মিনিনের সঙ্গে কথা বলাও বেআদবি মনে করলেন। অথচ উম্মুল মু'মিনিনকে একা এ অবস্থায় ফেলে যাওয়া যায় না। তাও তিনি বুঝলেন। কিছু সময় চিন্তা-ভাবনা করে শেষে নিজের উটকে বসিয়ে দিয়ে আয়িশা সিদ্দীকা (রা)-কে তার পৃষ্ঠে আরোহণ করতে বললেন। হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা) বস্ত্রাবৃতা অবস্থায়ই গিয়ে উষ্ট্রের পৃষ্ঠে উপবেশন করলেন। সাফওয়ান (রা) উষ্ট্রের রশি ধরে নিয়ে চললেন। যতদূর সম্ভব দ্রুত গতিতে চলে তাঁরা দ্বিপ্রহরে পরবর্তী মঞ্জিলে কাফেলায় গিয়ে মিশলেন। কাফেলার লোকেরা এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) এভাবে আয়িশা (রা)-কে আসতে দেখে বিস্মিত হলেন। তিনি তার হাওদায় ছিলেন না। তবে তিনি সাফওয়ানের সঙ্গে এভাবে কোথা হতে আসলেন? বিস্মিত হবার কথাই বটে। যা হোক, সকল ঘটনা জানতে পেরে সকলের বিস্ময় দূরীভূত হল।

ঘটনাটি এখানে শেষ হলেও এর জের কিন্তু এখানেই শেষ হল না। পূর্বেই উল্লেখ করেছি এই সফরে মুসলমানদের সঙ্গে মুনাফিকও যোগদান করেছিল। এমন কি মুনাফিক প্রধান আবদুল্লাহ ইবনে উবাই নামক পরম হিংসুক মুনাফিকও ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছিল। সুতরাং সে সুযোগটিকে লুফে নিল এবং জোরেশোরে প্রচার করে দিল ঃ আয়িশা অপবিত্রা হয়েছেন। মদীনার বিশিষ্ট ভদ্র অধিবাসী এবং সাহাবীগণ শিহরিয়া উঠলেন। তারা চরম অবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন ঃ সুবহানাল্লাহ্! জ্বলন্ত মিথ্যা অপবাদ! মদীনার প্রধান আনসার সাহাবী আবূ আইয়ুব আনসারী (রা) তাঁর পত্নীর কাছে এই অপবাদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, আস্তাগফিরুল্লাহ্, এটা কোন ঈমানদার রমণীর পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। তখন হযরত আবূ আইয়ুব আনসারী (রা) বললেন, হযরত আয়িশা (রা) পরম ধার্মিক—এর মধ্যে কোন সন্দেহ নাই। তাঁর দ্বারা এরূপ জঘন্য কাজ হওয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয়। এটা হিংসুক ইসলামের শত্রুদের মিথ্যা প্রচারণা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

কিন্তু সকল মানুষের মন একরূপ নয়। কতিপয় ঈর্ষাকাতর লোকের মধ্যে বিষয়টি কানাঘুষা শুরু হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র মনে অবশ্য আয়িশা (রা)-র চরিত্রের পবিত্রতা সম্বন্ধে একটুও সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু তবুও মানুষের মুখ বন্ধ করার জন্য সত্যকে যাচাই করা দরকার। অন্য যেকোন মেয়েলোক সম্বন্ধে বিষয়টি যত সহজ ছিল হযরত আয়িশা (রা) নিজের স্ত্রী বলে

www.nagorikpathagar.org

এখানে তত সহজ ছিল না। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা আয়িশার চরিত্র সম্বন্ধে কি মনে কর ? হযরত উমর (রা) বললেন, তিনি পবিত্রা এতে কোন সন্দেহ নেই। অতপর তিনি হযরত উসমান (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন তোমার মত কি ? হযরত উসমান (রা) বললেন ঃ হযরত উমর যা বলেছেন আমারও কথা তাই।

অতপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আলী (রা)-র নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এ বিষয়ে কি বল আলী ? হযরত আলী (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা রটনা বৈ কিছু নয়। অতপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে একটা ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র নবী (সা)! একদিন নামায পড়বার সময় আপনি হঠাৎ এক খানা জুতা খুলে ফেলেছিলেন। নামাযের পর আপনার এভাবে জুতা খোলার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আপনি বলেছিলেন, ঐ জুতাটা অপরিষ্কার ছিল। এ কারণে জিবরাঈল (আ) এসে খুলে ফেলতে বলায় আপনি তা খুলে ফেলেছিলেন। এখন হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আপনি ভেবে দেখুন সামান্য একটা নোংরা বস্তু যা মানুষে পায়ে ব্যবহার করে তা হতে আল্লাহ্ পাক যখন আপনাকে সতর্ক করলেন, এখন এত বড় একটা ব্যাপারে তিনি যে কিছুই করবেন না—চুপ করে থাকবেন তা হতেই পারে না।

সফর হতে প্রত্যাবর্তনের পর হযরত আয়িশা (রা) প্রায় একটি মাস রোগে ভুগছিলেন। এই অসুস্থাবস্থায় তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র আদেশ নিয়ে পিতৃ আলয়ে গমন করেন। তাঁর সম্বন্ধে যে মিথ্যা অপবাদ প্রচারিত হচ্ছে, তা তিনি মোটেই জানতে পারেন নাই। এই অসুস্থ অবস্থায় এক রমণী হযরত আয়িশা (রা)-র নিকটে বসে বলে উঠল, আল্লাহ্ মুস্তাহাকে হালাক কর। হযরত আয়িশা (রা) বললেন ঃ তুমি কেন তার সম্বন্ধে এরূপ কথা বললে, সে যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাহাবী এবং বদর যুদ্ধে যোগদানকারী। তখন ঐ রমণী বলল, আপনি তার সম্বন্ধে জানেন না, সে আপনার উপর মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে। এই সংবাদ শ্রবণ করে ক্ষোভে-দুঃখে লজ্জায় প্রায় অচৈতন্য হয়ে পড়লেন। অসুস্থতা আরও বেড়ে গেল। তিনি মৃত্যু শয্যাশায়ী হলেন। হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা) দুই রাত্র একদিন আহার নিদ্রা ত্যাগ করে কেঁদে কাটিয়ে দিলেন। তাঁর এই অবস্থা দর্শন করে পিতা-মাতা ও অন্যান্য মুরব্বি তাঁকে প্রবোধ দিতে লাগলেন।

এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) তথায় উপস্থিত হলেন। তিনি অগ্রে সকলকে সালাম দিয়ে উপবেশন করলেন। কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর দেখা গেল তাঁর মুখমণ্ডল ঘর্মাক্ত হয়ে উঠেছে। অহী অবতীর্ণ হবার সময় হলে তাঁর মুখমণ্ডল

www.nagorikpathagar.org

এই অবস্থা ধারণ করত। অহী নাজিল হচ্ছে মনে করে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন। অবিলম্বেই অহী নাজিল হল।

আল্লাহ্ অহীর দ্বারা হযরত আয়িশার নির্দোষিতা এবং পবিত্রতার কথা তাঁর রাসূলকে অবগত করালেন। আল্লাহ্র প্রত্যাদেশ বাণী প্রাপ্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মৃদু হাস্য করে আয়িশা (রা)-কে বললেন, আয়িশা আল্লাহ্ তোমার পবিত্রতা এবং নির্দোষিতার কথা ঘোষণা করেছেন। এই বলে আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তা পাঠ করে সকলকে শুনালেন। শুনে সকলে আনন্দে আত্মহারা হবার উপক্রম হল।

অতপর কুৎসা রটনাকারীদেরকে ডাকালেন এবং তাদের উপযুক্ত প্রমাণ দেয়ার কথা বললেন। তাতে কুৎসা রটনাকারীরা এক বাক্যে স্বীকার করল যে, তারা শোনা কথাই রটনা করেছে। এর পক্ষে কোন প্রমাণ তাদের কাছে নেই।

হযরত আয়িশা (রা)-র পবিত্রতা সম্বন্ধে আর কারও কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ রইল না। আল্লাহ্ নিজেই তাকে পবিত্র বলে ঘোষণা করে দিয়েছেন। এ সম্বন্ধে কুরআনের সূরা নূর-এ বিস্তারিত বর্ণনা আছে। এরূপ মিথ্যা কুৎসা রটনাকারীদের জন্য শাস্তির বিধান বাণীও ঘোষণা করেন।

জঙ্গে আহযাব বা পরিখার যুদ্ধ

পরিখার যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে কয়েকটি কারণেই গুরুত্বপূর্ণ ও স্মরণযোগ্য। প্রথমত এটা ছিল মুসলমানদের মদীনার অভ্যন্তরে থেকে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ। দ্বিতীয়ত এই যুদ্ধের অন্যতম রীতি অনুযায়ী মদীনার চতুর্দিকে সুগভীর পরিখা খনন করে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তৃতীয়ত এই যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল আরবের বহু গোত্রের সৈন্য, মদীনার ইয়াহূদী, মক্কার কুরাইশ এবং অন্যান্য বেদুঈন গোত্রের লোকেরা। কিন্তু আল্লাহ্র ইচ্ছায় এত গোত্রের বিশাল বাহিনী মদীনা আক্রমণ করতে এসেও ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধে হযরত আলী (রা) অপূর্ব বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, সত্যিই তা অতুলনীয়। বলতে গেলে এই যুদ্ধে হযরত আলী (রা)-কেই কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়েছিল।

প্রকৃতপক্ষে পরিখা খনন করে আত্মরক্ষার নীতি অবলম্বনে যুদ্ধের রীতি আরবদের তখন জানা ছিল না। হযরত সালমান ফারসী (রা) নামক জনৈক পারস্য দেশীয় সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পরিখা খননের পরামর্শ দিয়েছিলেন। এই পরামর্শ অনুসারে রাসূলুল্লাহ্ (সা) পরিখা খনন করেছিলেন। মদীনা শহরের উত্তরদিকে সালমা নামক পর্বত অবস্থিত ছিল। বাকি তিন দিক ছিল খোলা। এই তিন দিকে পরিখা খনন করতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীদেরকে সঙ্গে নিয়ে

www.nagorikpathagar.org

পরিখা খনন করলেন। তিনি নিজেও একাজে শরীক হলেন। এতে সাহাবীগণ দ্বিগুণ উৎসাহ উদ্যমের সাথে কাজ করে যেতে লাগলেন।

ফলে যে কাজ সম্পন্ন হতে বহুদিন সময় লাগবার কথা, তা মাত্র সাত দিন পরিশ্রম করার পর শেষ হলো। এই পরিখা ছিল বারো ফুট গভীর, সাড়ে নয় শ ফুট দৈর্ঘ্য, আঠার ফুট প্রস্থ। পরিখা খননের পরে মহিলা ও শিশুদের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ দুর্গে স্থানান্তরিত করে পরিখার তীরবর্তী লোকদিগকেও অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হল। অতপর যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়ে মুসলমানগণ শত্রুর আগমন প্রতীক্ষায় রইলেন। ওদিকে কুরাইশ নেতা আবূ সুফিয়ান তার বিশাল বাহিনী নিয়ে মক্কা হতে পূর্বেই রওয়ানা হয়েছিল। সাড়ম্বরে তারা মদীনার দিকে অগ্রসর হতে লাগল। এমন বিরাট বাহিনী নিয়ে কুরাইশগণ আর কখনও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়নি। আজ তাদের বাহিনীতে দশ সহস্র সেনা মোতায়েন রয়েছে। সুতরাং আজ তাদের আনন্দের সীমা নেই।

আবূ সুফিয়ান ভেবেছিল, মুসলমানগণ এবারও মদীনা হতে বাইরে এসে তাদেরকে বাধা দিবে। সুতরাং তারা উহুদ প্রান্তে এসে তাদের সুবিধা মত স্থান বেছে নিয়ে নিজেদের শিবির স্থাপন করল। কিন্তু কয়েকদিন অপেক্ষা করেও দেখল যে, মুসলমানদের কোন সাড়া নেই। তখন আবূ সুফিয়ান ভাবল, নিশ্চয়ই মুসলমানগণ তাদের এই বিপুল বাহিনী ও সমর আয়োজনের খবর পেয়ে ঘাবড়ে গিয়েছে। এরূপ ধারণায় আবূ সুফিয়ানের উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। সুতরাং সে উহুদ হতে তাঁবু উঠিয়ে মহা উল্লাসে মদীনার দিকে ধাবিত হল।

কিন্তু মদীনার উপকণ্ঠে পৌঁছে এক অভিনব দৃশ্য দেখে তারা অবাক হয়ে গেল। এদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) পরিখা বেষ্টিত যথাযোগ্য উন্মুক্ত প্রান্তরে আড়াই হাজার মুজাহিদ নিয়ে শিবির স্থাপন করলেন। পরিখা প্রহরার জন্য মোতায়েন করলেন পাঁচ শ সেনার এক তীরন্দাজ বাহিনীকে। স্তূপীকৃত করে রাখা হলো অসংখ্য প্রস্তর খণ্ড, পরিখা অতিক্রমকারীদের বাধা দান করার জন্য।

আবূ সুফিয়ান পরিখা অতিক্রম করার কোন উপায় খুঁজে পেল না। সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রইল। অবেশেষে বহু চেষ্টার পর তারা একটি স্থান আবিষ্কার করল। বদর যুদ্ধে নিহত আবূ জেহেলের পুত্র আকরামা তার অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে সেই স্থান দিয়ে পরিখা অতিক্রমের চেষ্টায় রইল। অনেক চেষ্টা করে সে একটি পথ বের করল। কিন্তু সে পথেও অধিক সৈন্য মোতায়েন করা সম্ভব হল না। কেবল আকরামার তৈরি রাস্তা দিয়ে আমর ইবন আবদুদ নামক দুর্ধর্ষ কুরাইশ বীর অশ্ব ছুটিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল। অতপর সে লম্ফঝম্ফ সহকারে মুসলমানদের মধ্য হতে দ্বৈরথ যুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বী আহবান করতে লাগল।

www.nagorikpathagar.org

শেরে খোদা হযরত আলী (রা) আমরের দর্প দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে গিয়ে তার সম্মুখীন হবার অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমরের বিক্রম সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। আমর একই সঙ্গে কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর বীরের সাথে একা যুদ্ধ করবার ক্ষমতা রাখত। এই জন্যই সম্ভবত রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আলী আমর সম্বন্ধে তুমি হয়ত জান না। তুমি ধৈর্য ধারণ কর। আলী (রা) নীরব থাকলেন। কিন্তু আমরের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য অন্য কেউ প্রস্তুত হলেন না। ওদিকে আমর কিন্তু কোন মুসলিম প্রতিদ্বন্দ্বীকে না পেয়ে তাদেরকে ভীরু কাপুরুষ বলে বিদ্রূপ করতে লাগল। গর্বে দম্ভে মেদিনী কাঁপিয়ে তুলল।

দূর হতে মহাবীর আলী (রা) এটা প্রত্যক্ষ করছিলেন। তার উষ্ণ শোণিত ধারা টগবগ করে উঠল। ঈমানের যোশে বলীয়ান হয়ে আল্লাহ্র শার্দূল মুসলমানদের প্রতি এই ঠাট্টা-বিদ্রূপ সহ্য করতে পারছিলেন না। পুনরায় তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে গিয়ে করজোড়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমাকে যুদ্ধের ময়দানে যাবার জন্য অনুমতি দিন। বেদীনের কথা আর সহ্য করা যায় না। এবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আলী (রা)-কে নির্দেশ দিলেন আর বললেন ঃ যাও আলী আল্লাহ্র নাম নিয়ে শত্রুর সাথে মুকাবিলা কর এবং বিজয়ী হয়ে ফিরে আস। নিজের মাথার পবিত্র দিস্তার আলী (রা)-র মাথায় বেঁধে দিয়ে দুয়া করলেন।

আমর ময়দানের এক প্রান্তে অশ্ব হাকিয়ে ফিরছিল আর নিজের গৌরব গাথা আবৃত্তি করছিল। শেরে খোদা হযরত আলী (রা)-ও নিজের গৌরব গাথা আবৃত্তি সহকারে আমরের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। দুজনে কিছু কথা কাটাকাটি হল। আমর বলল ঃ তুমিতো নেহায়েত তরুণ যুবক, দুনিয়ার স্বাদ পুরোপুরি উপভোগ করতে পার নি। তবুও তোমার নিষ্ঠুর স্বজাতীয়রা আমরের সঙ্গে যুদ্ধে পাঠিয়ে দিল! কেন তাদের মধ্যে কি দ্বৈরথ যুদ্ধ করবার মত আর কেউ নাই? শুন, তোমার পিতা আবূ তালিব আমার দীর্ঘ দিনের বন্ধু ছিলেন। তারই প্রিয় পুত্রের বুকে বর্শা বিদ্ধ করতে মন চাচ্ছে না। এ জন্যই তোমাকে বলছি তুমি ফিরে যাও। আমরের এরূপ বাগাড়ম্বরের জবাবে আলী (রা) বললেন, দেখ আমর! যুদ্ধক্ষেত্রে বীর শুধু তাকেই বলা হয় যে বৃথা বাড়াবাড়ি না করে অস্ত্রের মাধ্যমে স্বীয় বীরত্ব প্রকাশ করে।

আলী (রা)-র এই ধরনের জবাব শুনে আমর সহসা উত্তেজিত হয়ে উঠল। আলীকে লক্ষ্য করে অস্ত্র হানল। কিন্তু তিনি সে আঘাত ঢালে উড়িয়ে প্রত্যাঘাত করলেন। আমর বিদ্যুৎ গতিতে একদিকে সরে গিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে নিল।

www.nagorikpathagar.org

কিছুক্ষণ এভাবে আঘাত প্রত্যাঘাত চলল। কিন্তু কারও জয়-পরাজয় নির্ধারিত হল না।

যুদ্ধক্ষেত্রে হঠাৎ বুদ্ধি ও কৌশল অবলম্বন করা বিচক্ষণ যোদ্ধার কাজ। এই দিক দিয়ে আলী (রা) সুনিপুণ ছিলেন। তিনি হঠাৎ করে বললেন, আমর তুমি নাকি আরবের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা অথচ আমার একার সঙ্গে যুদ্ধ করতে অতগুলি যোদ্ধা সঙ্গে করে এনেছ কেন ?

আলী (রা) এই কথা বলামাত্র আমর একটি পলকের জন্য পিছনের দিকে ফিরে তাকাল। কিন্তু এই একটি পলকের অসাবধানতাই তার জন্য কাল হল। আলী (রা) ঠিক এই মুহূর্তেই আমরকে লক্ষ্য করে এমন প্রচণ্ড আঘাত হানলেন যে, সেই আঘাতেই তার দেহ দ্বিখণ্ডিত হয়ে ধূলায় লুটিয়ে পড়ল।

কুরাইশগণ আমরের মত বীরের শোচনীয় পরিণতি দেখে শিহরিয়া উঠল। যা হোক, আমরের নিহত হওয়ার সাথে সাথে নওফেল নামক অন্যতম কুরাইশ বীর হযরত আলী (রা)-র সম্মুখীন হল। কিন্তু তিনি চক্ষের পলকে তাকেও সংহার করলেন। অবস্থা দেখে কুরাইশ সেনাদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হল। আর কেউ আলী (রা)-র সম্মুখীন হতে সাহসী হল না। আলী (রা)-র হায়দরী হাঁকে আকাশ প্রকম্পিত করে চারদিকে পায়চারি করতে লাগলেন। কুরাইশ সৈন্যগণ ভীরু কাপুরুষের মত শিবিরাভ্যন্তরে বসে রইল। এভাবে সেদিনকার যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল।

পরের দিন কুরাইশগণ তাদের সমস্ত সৈন্য নিয়ে একযোগে আক্রমণ করল। কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা করেও কিছু করতে পারল না। পরিখা রক্ষাকারী মুসলিম সৈনিকদের প্রবল তীর নিক্ষেপ ও প্রস্তর বর্ষণের মাঝে তাদের কয়েকজন সৈনিক নিহত হল। এতে কুরাইশগণ ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়ল। এদিকে বনী কুরাইজা ইয়াহূদী গোত্রের সাথে কুরাইশদের যে চুক্তি হয়েছিল ইয়াহূদীরা তা পালন করতে পারল না। চুক্তি ছিল কুরাইশগণ যখন সম্মুখ ভাগে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে রত হবে, তখন বনী কুরাইজা তাদের এলাকা হতে বের হয়ে মুসলমানদের ঘরদরজার উপরে হামলা চালিয়ে দিবে। বনী কুরাইজা এই চুক্তি অনুযায়ী কাজ করতে না পারায় কুরাইশগণ আরও নিরাশ হয়ে পড়ল।

বনী কুরাইজা যে সৎ প্রবৃত্তি বশে মুসলমানদের ঘরবাড়ি আক্রমণে বিরত থেকেছিল তা নয়, এর কারণ ছিল মুসলমানদের সাথে ওরা চুক্তিবদ্ধ হলেও গোপনে কুরাইশদের সাথে যোগাযোগ রাখছিল এবং মুসলমানদের বিপদের সময় বিশ্বাসঘাতকতা করে বসতে পারে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা ভাল রূপেই বুঝেছিলেন। আর সেজন্য তিনি যায়েদ ইবনে হারিসা (রা)-র নেতৃত্বে পাঁচশ মুসলিম সৈন্যের

www.nagorikpathagar.org

একটি বাহিনী বনী কুরাইজা পল্লীর চতুর্দিকে পাহারা দেয়ার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে ইয়াহূদী পল্লীর চতুর্দিকে তকবীর ধ্বনি দিয়ে ফিরছিলেন। এর ফলে বনী কুরাইজা কুরাইশদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী কার্য করতে সক্ষম হলো না। আবূ সুফিয়ান বারবার লোক পাঠিয়েও তাদের ওয়াদা পালন করাতে পারল না। তারা প্রতিবন্ধকতার কথা জানিয়ে অক্ষমতার কথা বলছিল। কুরাইশদের সফলতার আর কোন আশাই বাকি রইল না। এত বিরাট বাহিনী নিয়ে এসেও মুসলমানদের সামান্যতম ক্ষতি সাধনেও সক্ষম হলো না। ফলে তারা নিজেরাই নিজদেরকে ধিক্কার দিতে লাগল। এদিকে তাদের রসদ পত্রও ফুরিয়ে এসেছিল। তদুপরি প্রচণ্ড হিমেল হাওয়ার ঝড় শুরু হয়ে গেল। অসহ্য কনকনে শীতের রাতে উন্মুক্ত প্রান্তরে অবস্থান কঠিন হয়ে পড়েছিল। বাধ্য হয়েই তারা শিবির উঠিয়ে প্রস্থানের সিদ্ধান্ত নিল।

কিন্তু আল্লাহ্‌র দুশমন কাফিরগণ এত সহজে সহিসালামতে ফিরে যাবে তা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল না। তাদের জন্য আল্লাহ্‌র আযাব নেমে আসল। আকাশে মেঘ হয়ে বজ্রপাতসহ শিলাবৃষ্টি এবং প্রচণ্ড ঝড় শুরু হয়ে শত্রুদের শিবির ছিন্নভিন্ন করে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে গেল; রসদপত্র ও মালসামানা এদিক-সেদিক বিক্ষিপ্ত হয়ে সবকিছু তছনছ হয়ে গেল। যানবাহনের পশুগুলি ভয়ে তাদের বাঁধন ছিঁড়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাল। ঝড় ও বৃষ্টির কারণে শিবিরের আগুন নিভে গেল। রাতের ঘোর অন্ধকারে এই মহাদুর্যোগের মধ্যে পতিত হয়ে দুশমনদের দুর্গতির আর সীমা রইল না। প্রান্তর জুড়ে শুধু হাহাকার আর হা-হুতাশ ও বিলাপ ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলল। ঝড়-বৃষ্টি বন্ধ হবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত হুজাইফা (রা)-কে প্রেরণ করলেন শত্রুদের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য।

তিনি যথাস্থানে উপস্থিত হয়ে দেখেন, ইসলাম ধ্বংসকারীদের প্রধান নায়ক আবূ সুফিয়ান নিরুপায় হয়ে ক্রন্দন করছে। আর একটু আগুনের জন্য এদিক-সেদিক ছুটাছুটি করছে। যা হোক, বিপর্যস্ত কুরাইশ বাহিনী রাত্রি প্রভাত হবার সাথে সাথে মালসামানা যানবাহনাদি শূন্য করুণ অবস্থায় মক্কার দিকে যাত্রা করল। এভাবে পরিখার যুদ্ধ শেষ হবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন জানতে পারলেন শত্রুগণ দেশে ফিরে চলেছে, তখন সাহাবীগণকে যার যার গৃহে প্রত্যাবর্তন করার হুকুম দিলেন।

www.nagorikpathagar.org

বনী কুরাইজার যুদ্ধ

পরিখার যুদ্ধে আরবের বিরাট সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে সাহাবীগণকে পরিখা খনন হতে আরম্ভ করে বাইশ দিন পর্যন্ত অবর্ণনীয় কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছিল। শত্রুদের প্রত্যাবর্তনের পর এখন সাহাবীগণ যারপরনাই শ্রান্ত, ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তা হলে কি হবে মুসলমানদের কর্তব্যের সম্মুখে শ্রান্তি-ক্লান্তির কোন স্থান নাই। কর্তব্য তাদের তখনও ফুরিয়ে যায় নি।

বনী কুরাইজা নামক ইয়াহূদী গোত্রটির উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। ওদের সাথে মুসলমানদের যে শান্তি চুক্তি হয়েছিল, মুসলমান কর্তৃক নির্বাসিত বনী নাজির গোত্রের প্ররোচনায় তারা এই শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করে কুরাইশদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তাদের এই বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের নিকট লোক প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু মুসলমানদের এই সঙ্কটকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র কথায় কর্ণপাত না করে বা নিজেদের চুক্তি রক্ষার প্রয়োজনীয়তার প্রতি আদৌ ভ্রূক্ষেপ না করে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রইল। ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। মক্কার কুরাইশ বাহিনী মুসলমানদের সমূলে ধ্বংস করতে যখন মদীনার উপকণ্ঠে উপস্থিত হল ঠিক সেই মুহূর্তে মিত্রচুক্তিবদ্ধ বনী কুরাইজা গোত্রের এই বিশ্বাসঘাতকতা মুসলমানদিগকে যে কি ভীষণ সঙ্কটাপন্ন করে তুলেছিল তা ভাবলেও মন চমকে উঠে।

এই ধরনের সর্পতুল্য মারাত্মক দুশমনদেরকে আর কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। আবার কোন্ বিপদের সময় বিশ্বাসঘাতকতা করে বসে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওদের সাথে একটা চূড়ান্ত ফয়সালার ইচ্ছা করলেন। পরিখার যুদ্ধের পরে সাহাবাগণ নিজ গৃহে গমন করে কেবল একটু বিশ্রাম নিবার ব্যবস্থা করছিলেন ঠিক এমনি সময়ে হযরত বিলাল (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নির্দেশ ঘরে ঘরে জারি করলেন, সকলেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে এস। আদেশ পাওয়ামাত্র সকল সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র দরবারে এসে হাযির হলেন। তিনি জানিয়ে দিলেন, তোমরা এই মুহূর্তে বনী কুরাইজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা কর। সাহাবীদের শ্রান্তি-ক্লান্তি-অবসাদ চোখের পলকে বিলীন হয়ে গেল। তাঁরা রণ হুঙ্কারে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে যুদ্ধ যাত্রা করলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, বনী কুরাইজাদের এলাকায় পৌঁছে তোমরা আসরের নামায আদায় করবে। প্রায় তিন হাজার সৈন্যের মুসলিম বাহিনী অগ্রসর হতে লাগলেন। শেরে খোদা হযরত আলী (রা) ইসলামী পতাকা নিয়ে বাহিনীর পুরোভাগে চলেন। আসরের ওয়াক্তেই মুসলিম বাহিনী বনী কুরাইজাদের

www.nagorikpathagar.org

এলাকায় উপনীত হলেন। তারা কিন্তু চিন্তাও করতে পারেনি যে, এত শীঘ্রই ওদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং কুকর্মের ফল ভোগ করবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। মুসলমানগণ প্রায় তিন সপ্তাহ্ পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে আবার এত শীঘ্র অস্ত্রধারণে সক্ষম হবে, তা ছিল তাদের ধারণারও বহির্ভূত।

কিন্তু যা চিন্তারও বহির্ভূত ছিল তাই বাস্তবে দেখে তাদের অন্তর কেঁপে উঠল। মুসলিম সৈন্যদের হাতে উলঙ্গ তরবারি দেখে অবশেষে দুর্গ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করল। মুসলমানগণ তাদের দুর্গ অবরোধ করে রাখলেন। প্রায় দুই সপ্তাহ কঠোর অবরোধ চলল। দুর্গ মধ্যে অবরুদ্ধ থেকে ইয়াহূদীদের আর দুর্গতির সীমা রইল না। শেষে বাধ্য হয়ে তারা আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুত হল। এক সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট দূত পাঠিয়ে জানাল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যদি দয়া করে ক্ষমা করেন তাহলে বনী নাজির গোত্র যেভাবে দেশ ত্যাগী হয়েছে তারাও সেভাবে দেশ ত্যাগ করে চলে যাবে।

কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই বিশ্বাসঘাতক শত্রুদিগকে এত সহজে ক্ষমা করতে রাযী হলেন না। এই অত্যাচারীদের ক্ষমা করে দেয়া ন্যায়নীতিকে বিসর্জন দেয়ারই নামান্তর। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যথাসময়ে সাবধানতা অবলম্বন না করলে ওদের দ্বারা মুসলমানদের যে ভীষণ বিপদে নিপতিত হতে হত, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সুতরাং এই ধরনের শত্রুকে ক্ষমা করা যায় না।

পূর্ব অভিজ্ঞতা দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) উত্তমরূপে উপলব্ধি করেছিলেন অপরাধীকে সর্বক্ষেত্রে ক্ষমা করা যায় না। ইতিপূর্বে বনী নাজির ও বনী কায়নুকাকে ক্ষমা করায় তারাই বনী কুরাইজাকে উত্তেজিত করে সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ করার ইন্ধন যুগিয়েছে এবং সমগ্র আরবের লোকদের ক্ষেপিয়ে তুলে পরিখার যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছে। এখন তাদের ক্ষমা করলে এরাও যে নতুন কোন ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করবে না তারই বা নিশ্চয়তা কি? এ সব দিক চিন্তা করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের বন্দী করার নির্দেশ দিলেন।

এই সময় বনী কুরাইজাদের অন্যতম দলপতি কা'আব ইবনে আসাদ তাদের প্রধান দলপতি হাই ইবনে আফতাবকে বলল, আমরা তৌরাতে মুহাম্মদ (সা)-এর আগমনের বিষয় জানতে পেরেছি, চল আমরা সকলে গিয়ে তার নিকট ইসলাম গ্রহণ করি। কিন্তু হাই ইবনে আফতাব ও অন্যান্য দলপতি তার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে ঈর্ষাবশত বলল, আমরা সবকিছু জলাঞ্জলি দিতে পারি তবুও মুহাম্মদ-এর নিকট নতি স্বীকার করতে পারব না। এদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নির্দেশ পালনের জন্য দুইজন সাহাবীর উপর নির্দেশ দেয়া হল। মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম (রা)

www.nagorikpathagar.org

ইয়াহূদী পুরুষদের বন্দী করলেন। ইবনে সালাম (রা) মহিলা এবং বালক-বালিকাদের জিম্মা গ্রহণ করলেন।

ইয়াহূদীরা যারপরনাই ভীত হয়ে পড়ল। তারা বুঝতে পারল, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিছুতেই তাদের মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে ছাড়বেন না। এই সময় তারা আউস গোত্রের নেতা সা'আদ বিন মা'আজ (রা)-এর উপর তাদের বিচারের ভার ন্যস্ত করতে বলল। এবং বলল, তিনি আমাদের জন্য যে দণ্ড বিধান করবেন আমরা তাই মেনে নেব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের এই প্রস্তাব মেনে নিলেন। ইয়াহূদীদের ইচ্ছানুযায়ীই আউস গোত্রের নেতা সা'আদ বিন মা'আজ বিচারক নিযুক্ত হলেন।

পরিখার যুদ্ধে হযরত সা'আদ বিন মা'আজ (রা) মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন। তাঁর অবস্থা তখন ভীষণ শোচনীয়। চিকিৎসার জন্য তাঁকে মসজিদে নববীর প্রাঙ্গণে রাখা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বাধ্য হয়ে সেই অবস্থায়ই তাঁকে আনবার জন্য লোক পাঠালেন। অতি কষ্টে তাঁকে একটি খাটে করে সেখানে আনা হল। পথে আউস গোত্রের কতিপয় লোক তাঁকে বনী কুরাইজাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাবার জন্য অনুরোধ জানাল। কিন্তু তিনি তখন একরূপ দুনিয়ার মায়া কাটিয়ে পরলোকে পাড়ি জমাবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সুতরাং তিনি কোন কিছু না শুনে চুপ করে রইলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) সা'আদ (রা)-কে বললেন, ইয়াহূদীগণ তোমাকে বিচারপতি মনোনীত করেছে। তুমি যে দণ্ডবিধান করবে তারা তাই মেনে নেবে। আমিও তাই মেনে নিতে প্রস্তুত আছি।

হযরত সা'আদ (রা) বাস্তবিকই এবার বিব্রত হয়ে পড়লেন। বনু কুরাইজাদের সঙ্গে তার পুরানা সম্প্রীতির কথা মনে উদয় হল। পথিমধ্যে তার নিজ গোত্রের কতিপয় লোক তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের সুপারিশ করেছে কিন্তু ন্যায়নীতির প্রতিও তিনি উপেক্ষা প্রদর্শন করতে পারেন না। ইয়াহূদীরা যে মারাত্মক অপরাধ করেছে তাতেও তাদের সমুচিত শাস্তি বিধান না করলে অন্যায় ও পক্ষপাতিত্ব দোষে দোষী হবেন।

বিচারক হয়ে ন্যায় বিচারের মুণ্ডপাত করা হবে। মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে তিনি কিরূপে এ অন্যায় করতে পারেন! না, তা কিছুতেই হতে পারে না। ন্যায়ের মর্যাদা তাঁকে রক্ষা করতেই হবে। হযরত সা'আদ (রা) কিছুক্ষণ এভাবে ভাবনা চিন্তা করে মনকে দৃঢ় করে ফেললেন। স্থির করলেন তিনি ন্যায়ের পক্ষে অটল থাকবেন, তাতে যা হয় তাই হবে।

বন্দী ইয়াহূদীদের কাতর মুখের দিকে একবারও তিনি ফিরে তাকালেন না। তিনি গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করলেন ইয়াহূদীদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাত অনুযায়ীই আমি

www.nagorikpathagar.org

রায় প্রদান করছি। মুসলমানদের সাথে সন্ধি ভঙ্গের অপরাধে ইয়াহূদী পুরুষদের মৃত্যুদণ্ড হবে। আর তাদের মহিলা ও বালক-বালিকাগণ মুসলমানদের দাস ও দাসীরূপে পরিগণিত হবে এবং তাদের যাবতীয় সম্পদ ও সম্পত্তি মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে বন্টিত হবে।

রায় শুনে দয়াল নবীর দয়ার হৃদয় গলে গেল। কিন্তু করবার মত কিছুই ছিল না। কারণ তারাও হযরত সা'আদের উপরে বিচারের ভার অর্পণ করেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও সা'আদের রায় মেনে নিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন, কারণ রায়ও একান্ত ন্যায়ভিত্তিক ছিল।

হযরত সা'আদ (রা)-এর রায় যথারীতি প্রতিপালিত হল। তাদের পাঁচশ সক্ষম পুরুষকে হত্যা করা হল। ফলে ইয়াহূদীদের ষড়যন্ত্র হতে মদীনা নগরী চিরদিনের মত রক্ষা পেল। এই ঘটনার পর ইয়াহূদীরা মদীনায় আর কখনও ষড়যন্ত্র করবার সাহস পায় নাই।

হুদায়বিয়ার সন্ধি

হুদায়বিয়ার সন্ধি ইসলামের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বাহ্যত এই সন্ধিপত্র মুসলমানদের জন্য অবমাননাকর মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এই সন্ধিই ছিল ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি এবং প্রসার লাভের মূল ভিত্তি। এই সন্ধিপত্রের প্রধান ভূমিকায় ছিলেন হযরত আলী (রা)। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর দ্বারাই এটা লিখিয়েছিলেন। ষষ্ঠ হিজরীতে হুদাইবিয়া নামক স্থানে মক্কার কুরাইশ এবং মুসলমানদের মধ্যে এই সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

এই সন্ধির ছয় বছর পূর্বে মুহাজিরগণ নিজেদের মাতৃভূমি মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। তারপর দীর্ঘ ছয় বছর ধরে অনবরত যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকার কারণে তারা আর মক্কার কথা চিন্তাও করতে পারেন নি। বনী কুরাইজার যুদ্ধের পরে আর এক বছর পর্যন্ত আর তেমন যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হতে হয় নাই। এই বছর ষষ্ঠ হিজরীর যিলকদ মাসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বপ্নে দেখলেন যেন তিনি কা'বা গৃহে প্রবেশ করছেন।

এই স্বপ্ন দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীগণকে মক্কা যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। সাহাবীগণের মক্কায় গমনের যারপরনাই আগ্রহ ছিল। থাকবারই কথা বটে। যে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, শৈশবে ও কৈশোরের দিনগুলি অতিবাহিত হয়েছে সে মক্কার মাঠ-ঘাট-পথ-প্রান্তর-অলিগলির সাথে জীবনের অসংখ্য স্মৃতি বিজড়িত, সেই মাতৃভূমিতে পদার্পণ করার অভিলাষ মনে জাগবে না কেন? যে মক্কা হতে কাফির-কুরাইশদের নিষ্ঠুর অত্যাচারে মদীনায় হিজরত

www.nagorikpathagar.org

করতে হয়েছিল, সেই মক্কা ও তার পরিচিত স্থানগুলো পুনরায় স্বচক্ষে দেখতে পাবেন এমন সুযোগ কি পরিত্যাগ করা যায় ? সুতরাং সাহাবীগণ সোৎসাহে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র মক্কা গমনের সাথী হলেন।

নির্দিষ্ট দিনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বার শত সাহাবী সমভিব্যাহারে মক্কা যাত্রা করলেন, উদ্দেশ্য তারা উমরাহ করবেন। সেই উদ্দেশ্যে সত্তরটি উষ্ট্র সঙ্গে নিলেন কুরবানী দিবার জন্য। তীর্থ যাত্রীদের যুদ্ধ-বিগ্রহ উদ্দেশ্য ছিল না। সুতরাং সাথে অস্ত্রশস্ত্র নেয়ার প্রশ্নই উঠে না। শুধু আত্মরক্ষার জন্য প্রত্যেকে একখানা করে তরবারি সঙ্গে নিলেন, তাও কোষবদ্ধ অবস্থায়।

এদিকে মক্কার কুরাইশগণ এ সংবাদ পেয়ে পরামর্শে বসল। তারা স্থির করল, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মক্কায় প্রবেশ করতে দেয়া হবে না। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কুরাইশগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে মদীনার পথে অগ্রসর হতে লাগল। মদীনাবাসীকে বাধা দেয়ার জন্য তারা খালিদ বিন ওলীদ এবং আকরামা বিন আবূ জেহেলকে দুই শ অশ্বারোহী সৈন্যসহ দ্রুতগতিতে রওয়ানা করে দিল। এদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুরাইশদের দুরভিসন্ধি জানতে পেরে সংঘর্ষ এড়াবার জন্য শত্রুর চক্ষুর অন্তরালে অন্য পথ ধরে মক্কার দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন এবং একরূপ কুরাইশদের অগোচরেই মক্কার উপকণ্ঠে হুদাইবিয়া নামক স্থানে উপনীত হলেন। সেখানে পৌছে মুসলমানগণ শিবির স্থাপন করলেন। ইতিমধ্যে কুরাইশগণ জানতে পারল যে, মুহাম্মদ (সা) সদল বলে মক্কার উপকণ্ঠে উপস্থিত হয়েছেন। তখন তারা তাড়াতাড়ি অগ্রগামী সৈন্যগণকে ফিরিয়ে এনে নগর রক্ষার জন্য মোতায়েন করল। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল মুসলমানগণ নিশ্চয়ই মক্কা আক্রমণ করবেন।

মক্কা হতে পরপর কয়েকজন দলপতি এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে সাক্ষাত করল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের প্রত্যেককেই স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন, আমরা কোন যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য আগমন করিনি। আমরা কেবল উমরা করার নিমিত্ত আগমন করেছি। তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র কথায় আস্থা স্থাপন করল। কেননা ওরা মুসলমানদের নিকট কোন অস্ত্র দেখতে পেল না, যাতে তারা যুদ্ধ করতে পারে এমন মনে করা যায়। দলপতিগণ মক্কায় গিয়ে কুরাইশ নেতাদের কাছে অবস্থা খুলে বলল এবং মুসলমানদের মক্কায় প্রবেশে বাধা না দেয়ার জন্যও মত প্রকাশ করল। কিন্তু কুরাইশ নেতাগণ তাদের কথায় কর্ণপাত করল না এবং নিজেদের জেদ বজায় রাখার জন্য বাধাদানের সিদ্ধান্তে অটল রইল।

এদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিন্তু ঘাবড়ালেন না। তিনি পুনরায় বিশিষ্ট সাহাবী হযরত উসমান (রা)-কে কুরাইশদের নিকট প্রেরণ করলেন। উসমান (রা)

www.nagorikpathagar.org

মক্কায় গিয়ে আবূ সুফিয়ান প্রমুখ কুরাইশ নেতাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র মনোভাব জ্ঞাপন করলেন। জবাবে তারা বলল, তোমার যদি উমরাহ করবার ইচ্ছা থাকে তবে করে যেতে পার; কিন্তু মুহাম্মদ বা তাঁর অন্য কোন সহচরকে আমরা কা'বা গৃহে প্রবেশ করতে দিব না। উসমান (রা)-এর পক্ষে এই প্রস্তাব গ্রহণ করা কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না। সুতরাং তিনি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। এতে কুরাইশগণ ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁকে বন্দী করে রাখল।

এদিকে মুসলমানগণ হযরত উসমান (রা)-এর প্রত্যাবর্তনে বিলম্ব দেখে চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে একটি সংবাদ রটে গেল যে, কুরাইশগণ হযরত উসমান (রা)-কে হত্যা করে ফেলেছে। এই নিদারুণ সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম (রা)-দের কাছে যে কত মর্মান্তিক হতে পারে তা সহজেই বোঝা যায়। তবে এই মর্মান্তিক খবরে সাহাবীগণ মর্মাহত হলেও বিচলিত হলেন না। একটি বৃক্ষের নিচে সমবেতভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র হাতে হাত রেখে তাঁরা সকলে দৃঢ় শপথ করলেন যে, ইসলামের জন্য তাঁরা জীবন উৎসর্গ করবেন। ইতিহাসে এই শপথ অনুষ্ঠানই বাইয়াতে রিদওয়ান নামে পরিচিত।

এদিকে সাহাবায়ে কিরাম নিজেদের জীবন উৎসর্গ করার শপথ করে আসন্ন বিপদের সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, ঠিক এমন সময়ে হযরত উসমান (রা) প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁকে ফিরে পেয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং সাহাবীগণের মর্মবেদনা দূরীভূত হল।

মুসলমানদের এই কঠিন শপথের কথা কুরাইশদের কানে গেল। তারা একটি আসন্ন সঙ্কটের পূর্বাভাস লক্ষ্য করে মুসলমানদের সাথে সন্ধি করার জন্য দূত পাঠান। সুহায়েল নামক জনৈক অতি বিচক্ষণ বাগ্মী পুরুষ দূত হিসাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র সঙ্গে সাক্ষাত করল। সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে প্রস্তাব করল, কুরাইশগণ সন্ধি করতে প্রস্তুত রয়েছে তবে শর্ত এই যে, আপনাকে এবার এই স্থান হতে ফিরে যেতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই শর্ত মেনে নিলেন। তবে কোন কোন সাহাবী একে অপমানকর শর্ত বলে মনঃক্ষুণ্ন হলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন ঘোষণা করলেন, তোমরা বুঝতে পারছ না এটা আমাদের জন্য পরাজয় নয়, বরং এর ভিতর দিয়েই আমরা মহাবিজয় অর্জন করব। তখন সকলেই সান্ত্বনা লাভ করলেন। তারপর সন্ধির অন্যান্য শর্তও নির্দিষ্ট হল। এই সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আলী (রা)-কে ডেকে বললেন, সন্ধিপত্র তোমাকেই লিখতে হবে। অতপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলতে লাগলেন এবং হযরত আলী (রা) লিখতে লাগলেন।

www.nagorikpathagar.org

যথানিয়মে প্রথমেই লিখলেন, বিস্‌মিল্লাহির্‌ রাহমানির রাহীম, এতে সুহায়েল আপত্তি করে বলল, একথায় আমার আপত্তি আছে—আল্লাহ্‌কে আমরা স্বীকার করি ঠিকই কিন্তু তার দয়াময় বিশেষণটি (রাহমানির রাহীম) স্বীকার করি না। সুতরাং শুধু 'বিসমিল্লাহ্‌' লিখ। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাতেই রাযী হলেন।

অতপর আলী (রা) লিখলেন ঃ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) অমনি সুহায়েল বাধা দিয়ে বলল, মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল এই কথা সন্ধিপত্রে লিখার অর্থ সে কথাটা আমাদেরও মেনে নিতে বাধ্য করা। যদি আমরা তা মেনে নিতাম তবে আর এত যুদ্ধ-বিগ্রহ কিসের ? ও কথাটা রাখতে পারবে না। সেটা কেটে দিয়ে শুধু লিখ, মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ্‌। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এতে কোন আপত্তি করলেন না। কিন্তু আলী (রা)-র তা সহ্য হল না। তিনি কঠোর হলেন এবং বললেন, আমার হাতে আল্লাহ্‌র রাসূল এ কথা কিছুতেই কেটে দিতে পারব না।

তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন, আচ্ছা আলী আমাকে সে স্থানটি দেখিয়ে দাও। আমি তা কেটে দিচ্ছি। আলী (রা) ক্ষুণ্ন মনে দেখিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) নিজ হাতে শব্দটি কেটে দিলেন। সন্ধিপত্র লেখা শেষ হয়ে গেল। হযরত আলী (রা) তাতে দস্তখত করলেন আর কতিপয় সাহাবী তাতে স্বাক্ষর দান করলেন।

সন্ধির শর্তসমূহ

১. দশ বছর পর্যন্ত মুসলমান এবং কুরাইশদের মধ্যে কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ হবে না।

২. আরব গোত্রসমূহের মধ্যে যে গোত্র মুসলমানদের সঙ্গে চুক্তি করতে ইচ্ছা করে তা করতে পারবে, যে গোত্র কুরাইশদের সঙ্গে সন্ধি করতে ইচ্ছা করে করতে পারবে তাতে কোন বাধা-নিষেধ থাকবে না।

৩. যদি কুরাইশদের মধ্য হতে কেউ মদীনায় মুসলমানদের কাছে চলে যায় তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু কেউ যদি মুসলমানদের মধ্য হতে মক্কায় কুরাইশদের নিকট চলে আসে তবে তাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে না।

৪. এই বছর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সাহাবাদের নিয়ে ফিরে যাবেন, আগামী বছর উমরা আদায় করতে আসবেন। শুধু তরবারি ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্র সঙ্গে করে আনতে পারবে না। তাও কোষবদ্ধ করে রাখতে হবে। তিন দিন মক্কায় থেকে উমরা আদায় করে ফিরে যেতে হবে, তিন দিনের বেশি অবস্থান করতে পারবে না।

www.nagorikpathagar.org

এই শর্তসমূহের মধ্যে তৃতীয় দফা শর্ত মুসলমানদের নিকট অপছন্দনীয় মনে হল। কেউ কেউ তা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট প্রকাশ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, যদি কেউ আমাদের ত্যাগ করে কাফিরদের কাছে আসে তবে তার চলে আসাটাই আমাদের জন্য কল্যাণকর। আর যদি কেউ কাফিরদের ত্যাগ করে আমাদের নিকট চলে যায় তাকে ফিরিয়ে দিলে তার রক্ষার ব্যবস্থা আল্লাহ্ই করবেন।

এই সন্ধির পরে মুসলমানরা তাদের চুল কর্তন করলেন, ইহ্রামের বস্ত্র খুলে ফেললেন, কুরবানী করলেন এবং মদীনার দিকে যাত্রা করলেন। এই সন্ধি বাহ্যত মুসলমানদের জন্য কিছুটা অবমাননাকর মনে হলেও মূলত এটাই ছিল ইসলাম এবং মুসলমানদের বিজয়ের ভিত্তি। এই জন্যই কুরআনে একে ফাতহুম মুবীন বা মহা বিজয় বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

ইসলামী দাওয়াত সম্বলিত পত্রাবলী

ষষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার সন্ধির পর মক্কা বিজয় পর্যন্ত কুরাইশদের সঙ্গে মুসলমানদের আর কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়নি। এই অবসরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণের প্রতি মনোনিবেশ করলেন। একদিন তিনি সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন, আল্লাহ্ আমাকে পুরা আলমের রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন সুতরাং সমগ্র মানব জাতির নিকট সত্যের আহবান জানানো আমার কর্তব্য। তোমরা আমার কাছে মতানৈক্য করো না, তোমরা আমার পক্ষ থেকে সত্যের আহবান সকলের নিকট পৌঁছিয়ে দাও।"

১. রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট গমন করেন হযরত দাহিয়ায়ে কালবী (রা)

২. পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজের নিকট গমন করেন হযরত আবূ আবদুল্লাহ্ বিন খাজাফা (রা)।

৩. মিসর এবং এস্কেন্দারিয়ার বাদশাহ্ মাকুকাসের নিকট প্রেরণ করা হলো হযরত হাতিব বিন আবি বালতায়া (রা)-কে।

৪. আবিসিনিয়ার বাদশা আযহামার নিকট গমন করেন হযরত উমর ইবনে শুমাইয়া (রা)।

৫. রোম সম্রাটের গভর্নর সিরিয়ার শাসনকর্তা শরহাবিল বিন উমর গাসসানীর নিকট গমন করেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র পত্রবাহকরূপে হযরত হারেস ইবনে উমায়ের (রা)।

www.nagorikpathagar.org

রোম সম্রাটের পত্র

রোম সম্রাট কাইসারের কাছে যে পত্র প্রেরণ করেন তা নিম্নরূপ ঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লাহ্র বান্দা এবং তাঁর সত্য রাসূল মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-র পক্ষ থেকে রোমের রাষ্ট্রপতি হিরাক্লিয়াসের নামে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। অতপর তোমাকে ইসলামের আহ্বান জানাচ্ছি। এ বিশ্ব জাহানের মালিক আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের আনুগত্য কবূল কর। তা হলে তুমি দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ্র শান্তি ও করুণা লাভ করবে। আর যদি আল্লাহ্র আনুগত্য বিমুখ হও তাহলে তুমি আল্লাহ্র রহমত হতে বঞ্চিত হবে। এর অনিবার্য পরিণতি হিসেবে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে এবং আখিরাতের অনন্ত জীবনে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে।

হে আহলি কিতাব! এস আমরা এমন একটি কথায় একত্রিত হই যা আমাদের এবং তোমাদের নিকট সমানভাবে গ্রহণীয়। তা এই যে, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া কারো দাসত্ব আনুগত্য করব না, আল্লাহ্র সঙ্গে কাউকে শরীক করব না। কিন্তু যদি তোমরা এ কথা মানতে রাযি না হও, তা হলে তোমরা সাক্ষ্য থাক আমরা মুসলিম (অর্থাৎ সমর্পণকারী) আমরা শুধু আল্লাহ্র দাসত্ব ও আনুগত্য করব।

আবূ সুফিয়ানের সঙ্গে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কথোপকথন

এই সময় বাদশাহ বায়তুল মুকাদ্দাসে অবস্থান করছিলেন। বাদশাহ পত্র পেয়ে আরবের কোন অধিবাসীকে তার কাছে পাঠিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। এই সময় আবূ সুফিয়ান বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়ায় অবস্থান করছিল। বাদশাহের লোকেরা তাকেই নিয়ে বাদশাহর দরবারে উপস্থিত করল। তার সঙ্গে বাদশাহের নিম্নরূপ কথোপকথন হল।

বাদশাহ্ ঃ নবুওতের দাবিদার লোকটির খান্দান কিরূপ ?

আবূ সুফিয়ান ঃ তিনি আরবের শ্রেষ্ঠতম শরীফ খান্দানের লোক।

বাদশাহ ঃ এ খান্দানের অন্য কেহ নবুওতির দাবি করেছিল কি ?

আবূ সুফিয়ান ঃ না।

বাদশাহ্ ঃ যারা এই নতুন ধর্ম গ্রহণ করছে তারা কি গরীব না ধনবান ?

আবূ সুফিয়ান ঃ অধিকাংশই গরীব এবং কৃতদাস শ্রেণীর লোক।

বাদশাহ ঃ তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে না কমে যাচ্ছে ?

www.nagorikpathagar.org

আবূ সুফিয়ান ঃ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাদশাহ্ ঃ তোমরা কি তাকে কখনো মিথ্যা কথা বলতে শুনেছো?

আবূ সুফিয়ান ঃ কখনো নয়, তিনি আজন্ম সত্যবাদী।

বাদশাহ্ ঃ তিনি কি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন ?

আবূ সুফিয়ান ঃ আজ পর্যন্ত কোন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন নাই।

বাদশাহ্ ঃ তোমরা কখনো তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করেছ ?

আবূ সুফিয়ান ঃ হ্যাঁ করেছি।

বাদশাহ্ ঃ যুদ্ধের পরিণতি কি হয়েছে ?

আবূ সুফিয়ান ঃ কখনো আমরা জিতেছি, আর কখনো তিনি জিতেছেন।

বাদশাহ্ ঃ তিনি লোকদের কি শিক্ষা দিয়ে থাকেন ?

আবূ সুফিয়ান ঃ তিনি বলেন, হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহ্‌র বন্দেগী কর। অপর কাউকে এবং কোন কিছুকে তাঁর শরীক করো না। পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় কর, পূত-পবিত্র জীবন যাপন কর, সদা সত্য কথা বল। একে অপরের প্রতি দয়া ও সহানুভূতিশীল হও। সতী-সাধ্বী মেয়ে লোকের প্রতি মিথ্যা তোহমত লাগাবে না।

এই সমস্ত কথোপকথনের পর বাদশাহ্ বললেন ঃ পয়গম্বর সব সময়েই ভাল বংশে জন্মগ্রহণ করে থাকেন। যদি এ লোকটির খান্দানে অন্য কেউ নবুওতির দাবি করতো তবে তার দাবিকেও খান্দানী প্রভাব বলে চিন্তা করা যেত। স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই হয়তো সে এ দাবি করতো। আর প্রমাণিত হলো তিনি কখনো মিথ্যা কথা বলেন নাই, তবে কি করে এ কথা বলা যেতে পারে যে, তিনি আল্লাহ্‌র ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলতে পারেন, যিনি তাঁকে রাসূল রূপে প্রেরণ করেছেন। এতদ্ব্যতীত প্রথম পর্যায়ে যারা নবীগণের শিক্ষা গ্রহণ করে থাকেন তাঁরা অধিকাংশ গরীব শ্রেণীর লোকই হয়ে থাকেন। সত্য চিরদিনই সত্য আর সত্য হয় জয়যুক্ত, বাতিল হয় পরাভূত। আর এ কথা অতি সত্য নবী-রাসূলগণ কখনো মিথ্যাবাদী ও ধোঁকাবাজ হতে পারেন না। আর তোমরা এ কথাও বলেছ, তিনি সবসময় লোকদের সৎ হয়ে চলতে, পুণ্য ও পবিত্র জীবন যাপন করতে উপদেশ দিয়ে থাকেন। তোমাদের কথা যদি সত্য হয় তবে আমার পায়ের নিচের যমীনও তাঁর কবলে চলে যাবে।

আমি জানতাম যে একজন রাসূল আগমন করবেন; কিন্তু তিনি যে মক্কায়ই জন্মগ্রহণ করবেন তা আমার ধারণা ছিল না। আমি যদি তাঁর নিকট যেতে পারতাম তবে তাঁর পবিত্র কদম চুম্বন করতাম।

www.nagorikpathagar.org

বাদশাহর এরূপ কথাবার্তা শ্রবণ করে তার সভাসদেরা ক্রোধে পলায়ন করতে উদ্যত হল। কিন্তু পূর্ব হতেই দরওয়াজা বন্ধ করা হয়েছিল বলেই পালাতে পারল না। কিন্তু বাদশাহের অন্তরে যে সত্যের আলো প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছিল তা নির্বাপিত হয়ে গেল। তিনি কথার সুর পরিবর্তন করে বললেন, আমি তোমাদের পরীক্ষার নিমিত্ত এ কয়টি কথা বলেছি মাত্র। যদি তেমন কিছু হয় তবে তোমরা আমাকে পরিত্যাগ করে তার পক্ষ অবলম্বন কর কিনা। তখন সকলে খুশী হয়ে বাদশাহের কদমে পড়ল। বাস্তবিকপক্ষে দুনিয়ার মোহ মানুষকে সত্য গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে মানুষকে বিপথগামী করে থাকে।

পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজের নামে পত্র

পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজ পূর্বদিকে অর্ধ দুনিয়ার উপরে প্রভুত্ব করেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর কাছে নিম্ন মর্মে ইসলামী দাওয়াত দিয়ে পত্র লেখেন।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদ (সা)-র তরফ থেকে পারস্য সম্রাট কিসরা সমীপে ঃ

যে ব্যক্তি সত্য পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করে মুখে এই কথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সমগ্র মানব জাতির নিমিত্ত আল্লাহ্র পক্ষ হতে রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি, যেন সমগ্র মানব জাতির নিকটে আল্লাহ্র বাণী পৌঁছাতে পারি। হে সম্রাট! তুমিও আল্লাহ্র দাসত্ব এবং তাঁর রাসূলের নেতৃত্ব কবূল করে নাও, তা হলে তোমার উপরে আল্লাহ্র শান্তি বর্ষিত হবে। অন্যথায় সমগ্র অগ্নি উপাসকের পাপের জন্য তুমিই দায়ী হবে।

খসরু পারভেজ ছিল প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাট। তার কাছে যে পত্র প্রেরণ করা হয়েছিল তাতে প্রথম মহান আল্লাহ্র নাম তৎপরে তাঁর রাসূল (সা)-র নাম, নিম্নে তার নাম তাও নিতান্ত সাদাসিধেভাবে। তাতে ছিল না কোন সম্ভাষণ ও সম্বোধন, খসরু পারভেজ পত্র দেখেই ক্রোধে জ্বলে উঠে বলল, আমার সামান্যতম প্রজা হয়ে আমার নামে এমনিভাবে পত্র লেখে, এত স্পর্ধা। এ কথা বলেই পত্রখানি ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলে দিল এবং অবিলম্বে নবুওতের দাবিদারকে বন্দী করে তার দরবারে প্রেরণ করার জন্য ইয়ামনের গভর্নরের উপর নির্দেশ জারি করল। ইয়ামনের গভর্নর মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে হাযির হয়ে বাদশাহর নির্দেশ শুনালো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ যাও তোমার বাদশাহ আজ রাতে তার পুত্র শেরওয়াহ কর্তৃক নিহত হয়েছে এবং সে নিজে পারস্যের সিংহাসন অধিকার করে নিয়েছে। তুমি ইরানে গিয়ে এ কথার সত্য-

www.nagorikpathagar.org

মিথ্যা প্রমাণ কর। এই কথা শ্রবণ করে উক্ত গভর্নর ইয়ামনে প্রত্যাবর্তন করল। এদিকে খসরু পারভেজের পুত্র শেরওয়াহ্ তার পিতাকে হত্যা করে নিজে ইরানের সিংহাসন দখল করে নিল এবং ইয়ামনের গভর্নরের উপর নির্দেশ প্রেরণ করল, আমার হুকুম না পাওয়া পর্যন্ত নবুওতের দাবিদার ব্যক্তিকে কিছুই বল না।

খসরু পারভেজ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র পত্র ছিঁড়ে ফেলেছে এই সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ (সা) জানতে পেরে বললেন ঃ সে যেমন আমার পত্র ছিঁড়ে ফেলেছে তেমনি আল্লাহ্ তার রাজ্যকে টুকরা টুকরা করে দিবেন। তার কয়েক বছর পরে শেরওয়াহ্ বিষ পান করে আত্মহত্যা করে এবং হযরত উমরের খিলাফতকালে কাদেসিয়ার যুদ্ধে ইরানের শাশানী বংশের শেষ সম্রাট ইরাজদ জারদ পরাজিত হয় এবং সমগ্র ইরান মুসলমানদের অধিকারে চলে আসে।

খায়বরের যুদ্ধ

খায়বরের যুদ্ধ ছিল ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে। ইসলামের ইতিহাসে এই যুদ্ধটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ এটা ছিল মুসলমান ও ইয়াহূদীদের মধ্যে সর্বশেষ যুদ্ধ। এই যুদ্ধের পর ইয়াহূদী শক্তি আর কোন দিন মুসলমানদের বিপক্ষে মাথা তুলে দাঁড়াতে সক্ষম হয় নাই।

খায়বর মদীনা হতে প্রায় এক শত মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত একটি ইয়াহূদী প্রধান এলাকা। সেখানে যে ইয়াহূদিগণ বাস করত প্রকৃতপক্ষে তারা মুসলমানদের ঘোর দুশমন ছিল। তাছাড়া মুসলমান কর্তৃক নির্বাসিত বনী নাজির, বনী কায়নুকা গোত্রের ইয়াহূদীরা এবং বনী কুরায়জা গোত্রের কতিপয় পলাতক ইয়াহূদীও সেখানে গিয়ে বসবাস করতে থাকে। এরা সকলে মিলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিরাট ষড়যন্ত্র পাকিয়ে মুসলমানদিগকে নানাভাবে উত্ত্যক্ত করতে শুরু করে দেয়। খায়বরে অনেকগুলি দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিল। সুতরাং স্থানটি ইয়াহূদীদের জন্য একটি শক্তিশালী ঘাঁটিতে পরিণত হয়।

খায়বরের এই সম্মিলিত ইয়াহূদী শক্তির বিরুদ্ধে মুসলমানদের খায়বর অভিযান করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। খায়বরে যে দুর্ভেদ্য দুর্গসমূহ ছিল তন্মধ্যে নায়েম, কমুদ, ওয়াতীহ, সায়াব, কামুস এবং সালামের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ করে সপ্তম হিজরীতে অতর্কিতভাবে খায়বর অবরোধ করেন। এত সতর্কতার সহিত এই অভিযান পরিচালিত হয় যে, পূর্বাহ্নে ইয়াহূদিগণ ঘূর্ণাক্ষরেও এর কিছুই জানতে পারে নি। চৌদ্দশ পদাতিক এবং দুই শ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রথম খায়বরে উপস্থিত হলেন, তখন ফজরের ওয়াক্ত সমুপস্থিত। প্রত্যূষে যখন

www.nagorikpathagar.org

মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র ইমামতিতে ফজরের নামায় আদায় করলেন তখন ইয়াহূদী কৃষকগণ মাঠে এসে বিরাট মুসলিম বাহিনী দেখে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। দৌড়িয়ে গিয়ে তারা নগরবাসীকে এ সংবাদ জানাল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বরস্থ রজী নামক স্থানে ছাউনি ফেলে প্রথমে ইয়াহূদীদের সঙ্গে সন্ধি করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ইয়াহূদিগণ এতে সাড়া দিল না। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাধ্য হয়েই নায়েম দুর্গ আক্রমণ করলেন। মুসলিম বাহিনী বীর-বিক্রমে যুদ্ধ করে দুর্গটি অধিকার করলেন। এভাবে কমুদ, সায়াব প্রভৃতি দুর্গ অতি সহজেই অধিকারে এলো। সাথে সাথে মুসলিমগণ ছোট ছোট কয়েকখানি গ্রামও অধিকার করে বসলেন। কিন্তু কামুস ও সালেম দুর্গ দু'টি বহু চেষ্টা করেও অধিকারে আনা গেল না। ইয়াহূদিগণ সর্বশেষ আশ্রয়স্থল হিসাবে এই সুরক্ষিত দুর্গ দু'টিতে আশ্রয় গ্রহণ করল এবং সর্বশক্তি প্রয়োগ করে যুদ্ধ করতে লাগল। ইয়াহূদিদের দলপতি ছিল হারেস এবং আরবের প্রখ্যাত বীর মারহাব।

এই দুর্গ দু'টি অধিকার করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রথম দিন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নেতৃত্বে সেনাবাহিনী নিয়োগ করলেন। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত অকৃতকার্য হয়ে ফিরে এলেন। দ্বিতীয় দিন হযরত উমর (রা)-কে সেনাপতি করে পাঠালেন। কিন্তু তিনিও ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলেন। তৃতীয় দিনও হযরত উমর (রা)-এর নেতৃত্বে যুদ্ধ পরিচালিত হল কিন্তু কাজ হল না। সেদিনও দুর্গ জয় হল না।

বলা প্রয়োজন, এ সময় হযরত আলী (রা) চক্ষুরোগে আক্রান্ত ছিলেন এবং তজ্জন্যই তাঁকে সেনাপতির পদে নিয়োগ করা হয়নি। কিন্তু প্রতিদিনই যখন মুসলিম বাহিনী এভাবে ব্যর্থ হয়ে আসতে লাগলেন তখন তৃতীয় দিন রাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সমবেত সাহাবীবৃন্দকে লক্ষ্য করে ঘোষণা করলেন, আগামীকল্য আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে ইসলামী ঝাণ্ডা অর্পণ করব যিনি আল্লাহ্ ও তার রাসূলের অতি প্রিয় এবং তার হাতে আল্লাহ্র রহমতে দুর্গ জয় হবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র এই ঘোষণা শ্রবণ করে সাহাবীদের মনের মধ্যে এক আশা ও নিরাশার দোদুল্যমান অবস্থার সৃষ্টি হল। বিশিষ্ট সাহাবীদের মধ্যে প্রত্যেকেই এই গৌরবজনক মর্যাদা লাভের আশায় তন্ময় হয়ে উঠলেন। এমনকি হযরত আবূ বকর, উমর, সায়াদ বিন আবি ওক্কাসের মত সাহাবীও মনে মনে এই গৌরব লাভের প্রত্যাশা করলেন। না জানি কাল প্রত্যূষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কার হাতে এই পতাকা প্রদান করবেন, তিনিই তো হবেন মহা ভাগ্যবান।

www.nagorikpathagar.org

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, এই সময় হযরত আলী (রা) দারুণ চক্ষুরোগে আক্রান্ত ছিলেন। সে কারণে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে খায়বরে উপস্থিত থাকলেও যুদ্ধে শরীক হতে পারেন নি। আর এ জন্যই তিনি সাহাবীগণের মধ্যে অদ্বিতীয় বীর হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সম্পর্কে কারও মনে কোনরূপ ধারণা সৃষ্টি হল না। এমন কি তাঁর নিজের মনেও না। যা হোক, সাহাবীদের মনের চাঞ্চল্য ও আগ্রহাতিশয্যের উত্তেজনা আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বদোলার মধ্য দিয়ে রাত্র অতিবাহিত হয়ে গেল। প্রত্যূষে ফজরের নামায আদায় করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সমবেত সাহাবীদের মধ্যে উপবিষ্ট হয়ে তাঁর ঘোষণা জানাবার জন্য নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করলেন সেই মুহূর্তে সাহাবীদের মনের অবস্থার কথা সত্যই অবর্ণনীয়। খায়বর বিজয়ের লোভনীয় গৌরব লাভের প্রবল বাসনা সকলের মনকে অধীর করে তুলল। এমনকি হযরত উমর (রা) বলেছিলেন, জীবনে আমি কোনদিন সেনাপতিত্ব বা নেতৃত্ব লাভের জন্য লালায়িত বা আগ্রহী ছিলাম না তবে শুধু একটি দিন এর ব্যতিক্রম ছিল। আর তা খায়বর বিজয়ের দিন।

যা হোক, ক্ষণকাল পরেই মৌনতা ভঙ্গ করে সকলের আশা-নিরাশার সমাপ্তি ঘটিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে হযরত আলী (রা)-কে আহবান করলেন। আলী (রা) তখন চোখের পীড়ায় এমনি কাতর হয়ে পড়েছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকটবর্তী হতেও তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। তখন সালাম বিন আকাবা (রা) হাত ধরে নিয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের মুবারক মুখের লালা হযরত আলী (রা)-র চোখে লাগিয়ে দিলেন আর তিনি তখনই সুস্থ বোধ করলেন।

অতপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আলী (রা)-র হাতে ইসলামী পতাকা এবং জুলফিকার নামক তরবারি খানা অর্পণ করে বললেন ঃ প্রিয় আলী আজ তোমার হাতেই আল্লাহ্র রহমতে দুর্গ জয় হবে। সমস্ত সাহাবী তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করে আলী (রা)-কে ধন্যবাদ দিতে লাগলেন।

আলী (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! যুদ্ধ করে কি ইয়াহূদিগণকে মুসলমান বানাবেন ?

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ না, যুদ্ধারম্ভের পূর্বেই তাদের কাছে ইসলাম পেশ করবো। তাদের সম্মুখে ইসলামের শিক্ষা সৌন্দর্য তুলে ধরবো। কারণ তোমার চেষ্টায় যদি একটি লোকও মুসলমান হয় তা হলে তা হবে তোমার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত। হযরত আলী (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নির্দেশ অনুযায়ী যুদ্ধস্থলে গিয়েই প্রথম ইসলামের দাওয়াত দিলেন। অতপর ইয়াহূদিদের সম্মুখে ইসলামের শিক্ষা আদর্শ তুলে ধরলেন। কিন্তু যাদের কিসমতে হিদায়াত নেই তাদের

www.nagorikpathagar.org

সুপথে আনা যায় না। হতভাগ্য ইয়াহূদিগণ হযরত আলী (রা)-র কথার প্রতি কর্ণপাত করল না। কাজেই তারা রাব্বুল আলামিনের রহমত হতে বঞ্চিত হল।

এবার হযরত আলী (রা) কামুস দুর্গের নিকটে উপস্থিত হলেন এবং প্রস্তর খণ্ডের উপরে ঝাণ্ডা স্থাপন করত সৈন্য নিয়ে এমন প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ চালালেন যে, ইয়াহূদিগণ সুরক্ষিত দুর্গ অভ্যন্তরে থেকেও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। আত্মগর্বে স্ফীত নেতা হারেস মনে করল যে, মুসলিম বাহিনীর এই আক্রমণের বেগ প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। সুতরাং একা আলী (রা)-কে দ্বৈরথ যুদ্ধে আহ্বান করে তাঁকে শেষ করে দিলেই তো যুদ্ধ থেমে যায়। হারেস আরবের এক বিক্রমশালী ইয়াহূদী বীর ছিল। হযরত আলী (রা)-কে সে এক সাধারণ সৈনিকরূপে ধারণা করেছিল। যা হোক, হারেস ব্যাপক যুদ্ধ পরিহার করে আলী (রা)-কে দ্বৈরথ যুদ্ধের প্রস্তাব করল। হযরত আলী (রা) তাতেই সম্মত হলেন। হারেস কোষ উন্মুক্ত অসি নিয়ে হযরত আলী (রা)-র সম্মুখে ছুটে আসল এবং মুহূর্ত বিলম্ব না করে হযরত আলী (রা) প্রস্তুতি নিলেন। তিনি হারেসের আঘাত প্রতিরোধ করে চক্ষের পলকে তাকে এমন তীব্র আঘাত করলেন যে, সেই এক আঘাতেই হারেসের শির উড়িয়ে দিলেন।

এই দৃশ্য ইয়াহূদীদের কাছে যেমন ভীষণ তেমনি হৃদয়বিদারক ছিল। হারেসের মত বিক্রমশালী যোদ্ধা এত শীঘ্রই যে প্রাণ হারাবে তা কল্পনারও অতীত ছিল। যা হোক, হারেসের প্রাণ বিয়োগের দৃশ্য তার ভ্রাতা মারহাব অদূরে দাঁড়িয়ে নিরীক্ষণ করছিল। মারহাবের নামে আরবের বীরযোদ্ধা থর থর করে কেঁপে উঠত। মারহাব ছিল হারেসের সহোদর ভ্রাতা। ভ্রাতৃ হত্যার শোকে সে ক্রোধে অধীর হয়ে বিদ্যুৎবেগে সমরাঙ্গণে ছুটে এলো এবং ক্রোধব্যঞ্জক স্বরে বীরত্বের গর্ব করে বলে উঠল—জীবনের প্রতি যদি মায়া থাকে তবে আমার সম্মুখীন হও। সে হযরত আলী (রা)-র প্রতি তীব্র আঘাত হানলো। কিন্তু হযরত আলী (রা) সে আঘাত ব্যর্থ করে দিয়ে এমন ভীষণ জোরে মারহাবের মস্তক লক্ষ্য করে তরবারির আঘাত হানলেন যে, তাতে তার দুর্ভেদ্য শিরস্ত্রাণ ভেদ করে তার মস্তক দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। মুহূর্তে বিরাট বৃক্ষসম দেহ ধুলায় লুটিয়ে পড়লো।

মারহাবের নিহত হবার পর আর একজন ইয়াহূদী যোদ্ধা হযরত আলী (রা)-র সম্মুখে উপস্থিত হল এবং মুহূর্তের মধ্যে সেও নরকগামী হল। সাথে সাথে আর একজন এলো, তারও শোচনীয় পরিণতি ঘটলো। এভাবে হযরত আলী (রা) একে একে সাতজন ইয়াহূদী সৈনিককে হত্যা করলেন। এরূপ

www.nagorikpathagar.org

ঘটনায় ইয়াহূদীরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। তারা দুর্গ মধ্যে লুকিয়ে থেকে প্রাণ রক্ষা করার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু কতিপয় দলপতির তিরস্কারে তিষ্ঠিতে না পেরে ইয়াহূদিগণ জীবনের মায়া বিসর্জন দিয়ে সমস্ত ইয়াহূদী সৈনিক সমবেতভাবে মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তুমুলভাবে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। ইয়াহূদী সৈনিকগণ হয় যুদ্ধ জয় না হয় মৃত্যুপণ করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। কিন্তু হযরত আলী (রা)-র অমিত বিক্রম সৈন্য পরিচালনার নিপুণতার মুখে ইয়াহূদীরা তিষ্ঠিতে পারলো না। মুসলমানগণ শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করে দুর্বার বেগে সম্মুখ পানে অগ্রসর হতে লাগলেন। হযরত আলী (রা) শত্রু সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করে ভীষণ বিক্রমে অসি চালিয়ে যেতে লাগলেন। এই যুদ্ধে হযরত আলী (রা)-র অবস্থা অন্যরূপ হয়ে দাঁড়ালো। যুদ্ধের এক পর্যায়ে বাম হস্তস্থিত ঢালখানা ভেঙ্গে গেল।

চারদিক হতে শত্রুর তীর বর্ষার পানির মত ছুটে আসছিল। মুহূর্তে কামুস দুর্গের একখানি লৌহ কপাট খুলে নিয়ে তা দ্বারাই ঢালের কাজ করে যেতে লাগলেন। ইয়াহূদী সৈন্যগণ বিপক্ষীয় আক্রমণের তীব্রতা সহ্য করতে না পেড়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। কিন্তু তবুও জীবন রক্ষা করা সম্ভব নয় বুঝতে পেরে সকলে আলী (রা)-র নিকট ছুটে এসে আল আসান আল আসান (অর্থাৎ আমাদের নিরাপত্তা দান করুন) বলে চিৎকার করে উঠল। খায়বরের যুদ্ধ এভাবেই শেষ হল। এই যুদ্ধে উনিশ জন মুসলমান শাহাদাত বরণ করলেন। ইয়াহূদী পক্ষের মোট তিরানব্বই জন নিহত হল। প্রায় তিন সপ্তাহ অবরুদ্ধ থাকার পর সমস্ত ইয়াহূদী দুর্গ মুসলমানদের হস্তগত হল। ইয়াহূদিগণ আত্মসমর্পণ করল।

হযরত আলী (রা)-র অমিত বিক্রম এবং অসাধারণ সাহস ও যোগ্যতা, সর্বোপরি আল্লাহ্র রহমতে বিজয় সাধিত হলো, তা মুসলমানদের জন্য পরম আনন্দের, যা প্রয়োজনও ছিল। কারণ খায়বর বিজয়ের পর দুনিয়ায় ইয়াহূদী জাতির আর কোন আশ্রয়স্থল রইল না, একারণে তাদের আর কোন শক্তিও অবশিষ্ট রইল না।

হযরত আলী (রা) কামুস দুর্গের যে কপাট ঢালের ন্যায় ব্যবহার করেছিলেন যুদ্ধ শেষে ঐ কপাটখানা যুদ্ধের প্রাঙ্গণে ফেলে রেখেছিলেন। ঐ কপাটখানা এত ভারী ছিল যে, কয়েকজন সাহাবীর সম্মিলিত শক্তির দ্বারা স্থানান্তরিত করতে হয়েছিল।

www.nagorikpathagar.org

হযরত হারুন (আ)-এর বংশোদ্ভূত সুফিয়া (রা) খায়বরের যুদ্ধের শেষে মুসলমানদের হাতে আসেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন এবং বিশ্ব মুসলিমের জননীর পদমর্যাদা লাভে ভূষিতা হন।

রাহমাতুল্লিল আলামীনের দয়া

যুদ্ধ শেষ হবার পরেও রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিছুদিন পর্যন্ত খায়বরে অবস্থান করলেন। ইয়াহূদীদের জায়গা-জমি, বাড়ি-ঘর তাদের ফিরিয়ে দিয়ে পূর্ণ নিরাপত্তা দান করলেন। তবুও তাদের মনের কলুষতা দূরীভূত হল না। একজন ইয়াহূদী মেয়েলোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এবং কিছুসংখ্যক সাহাবীকে দাওয়াত করে এবং খানায় বিষ মিশ্রিত করে খেতে দেয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোকমা মুখে দিয়ে আবার ফিরিয়ে আনলেন এবং বললেন, এই খানার মধ্যে বিষ মিশ্রিত করেছ কেন ? সে বলল, আপনাকে পরীক্ষা করার জন্য, আপনি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র রাসূল কিনা ? যদি আপনি সত্যিই নবী হন তা হলে এই খানা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আর যদি তা না হন তবে আপনি মরে যাবেন আমরা মুক্ত হয়ে যাব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার জবাব শুনে তাকে মাফ করে দিলেন। কিন্তু কিছু সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র পূর্বে বিষ মিশ্রিত খানা খেয়েছিলেন। যখন এই সাহাবীরা এই বিষের ক্রিয়ায় শাহাদাত বরণ করলেন তখন তাকে কতল করে দেওয়া হল।

খায়বরের কাছে 'ওয়াদিল্ কুরা' নামক একটি স্থান আছে। সেখানে তায়েমা এবং ফদক নামক কয়েকটি গ্রাম ছিল। খায়বর বিজয়ের পরে কিছু সংখ্যক সাহাবীকে তথায় প্রেরণ করলেন এবং তারা যুদ্ধ-বিগ্রহ না করেই সন্ধি করল। এভাবে ইয়াহূদীদের সঙ্গে যুদ্ধের অবসান হল।

কাযা উমরা আদায়

মনে রাখা দরকার হুদাইবিয়ার সন্ধিতে সিদ্ধান্ত হয়েছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবারকার মত এই স্থান হতে ফিরে যাবেন। আগামী বছর মুসলমানরা ওমরা আদায় করে যাবেন। এই শর্ত অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ্ (সা) সপ্তম হিজরীর যিলকদ মাসে উমরার জন্য আহবান করলেন। সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের বিরাট কাফেলা প্রস্তুত হয়ে মক্কার দিকে যাত্রা করলেন। শর্ত ছিল কোন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসতে পারবে না। কিন্তু বিনাঅস্ত্রে যাওয়ার মধ্যে খুবই আশঙ্কা ছিল। তবুও মুসলমানদের কা'বা গৃহ জিয়ারতে আশা এবং সন্ধির মর্যাদা রক্ষার জন্য যেতে হল। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যাত্রা করলেন। মক্কা হতে আট মাইল দূরে অস্ত্রশস্ত্র রেখে এক শত লোকের একটা বাহিনী অস্ত্রের হিফাজতের জন্য রেখে গেলেন।

www.nagorikpathagar.org

বাকি মুসলমানরা মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং শর্তানুযায়ী তিন দিন মক্কায় অবস্থান করে উমরা আদায় করে আবার মদীনার দিকে যাত্রা করলেন। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলের স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করলেন।

মূতার যুদ্ধ

সপ্তম হিজরীতে যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপতিদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন, সেই সময়ে রোম সম্রাটের গভর্নর সিরিয়ার শাসনকর্তা শরহাবিল বিন উমর গাছ্ছানীর নিকট হারেস ইবনে উমায়ের (রা)-কে পত্রবাহকরূপে প্রেরণ করেন। শরহাবিল গাছ্ছানী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাসেদকে হত্যা করে ফেলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তিন হাজার সৈন্যের এক বাহিনী অষ্টম হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাসে মদীনা হতে সিরিয়ার দিকে রওয়ানা করিয়ে দিলেন। এই বাহিনী বিদায় করার সময় নিম্ন হিদায়াত প্রদান করলেন ঃ

১. যদি আল্লাহ্র কোন বান্দা তার ইবাদত খানায় আল্লাহ্র ইবাদতে লিপ্ত থাকে তবে তার উপরে অত্যাচার করবে না।

২. কোন মেয়েলোকের উপরে হাত লাগাবে না।

৩. শিশু সন্তানকে হত্যা করবে না।

৪. কোন বৃদ্ধ লোককে মেরে ফেলবে না।

৫. কোন ফলবান বৃক্ষ কর্তন করবে না।

এই বাহিনীর নেতা নির্বাচন করলেন হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা (রা)-কে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলে দিলেন তাঁর শহীদের পরে জাফর ইবনে আবি তালিব (রা) নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। তিনিও শহীদ হয়ে গেলে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রওয়াহা (রা) সেনাপতি হবেন।

গাছ্ছানী এই কথা জানতে পেরে এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। পথিমধ্যে মুসলমানরা জানতে পারলেন রোমকদের সৈন্য সংখ্যা এক লক্ষ, আমরা তিন হাজার—এমতাবস্থায় আমরা যুদ্ধ করব না। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে সংবাদ পৌছাব?

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রওয়াহা (রা) এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান করলেন। তিনি বললেন ঃ আমরা সংখ্যাধিক্যের বলে বলীয়ান হয়ে যুদ্ধ করি না। আমরা আল্লাহ্র সাহায্য নিয়ে ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে যুদ্ধ করে থাকি। আমরা দু'টি কামিয়াবি সঙ্গে নিয়ে এসেছি, হয় আমরা বিজয়ী হব অথবা হব শহীদ। যদি আমরা শহীদ হই তবে আল্লাহ্র বেহেশতে প্রবেশ করব, আর যদি বিজয়ী হই,

www.nagorikpathagar.org

তবে আল্লাহ্‌র বেহেশত আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকবে। উক্তরূপ ভাষণ শুনে নব বলে বলীয়ান হয়ে তিন হাজার সৈন্যের ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনী মুতা নামক প্রান্তরে পৌছে শিবির স্থাপন করলেন। শরহাবিল গাছছানী পূর্ব হতেই এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে মুসলিম বাহিনীর অপেক্ষা করছিল। তিন হাজারের ক্ষুদ্র বাহিনী এক লক্ষ কাফিরের উপরে আক্রমণ শুরু করলেন। প্রথম দিনের যুদ্ধে হযরত যায়েদ শহীদ হলেন। হযরত জাফর (রা) সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এবং যুদ্ধ পরিচালনা করতে লাগলেন। কাফিরের তরবারির আঘাতে তাঁর এক খানা হস্ত দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। অন্য হাতে ইসলামী পতাকা ধারণ করলেন, দ্বিতীয় হাতও শহীদ হয়ে গেল। এবার ইসলামী পতাকা কর্তিত বাহু দ্বারা বুকের সঙ্গে চেপে ধরলেন। শেষ পর্যন্ত শাহাদাত বরণ করলেন। এবার হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রওয়াহা (রা) ইসলামী পতাকা উত্তোলন করে প্রচণ্ড বিক্রমে যুদ্ধ করে যেতে লাগলেন। কাফিরের তরবারির আঘাতে হাতের তিনটি অঙ্গুলি কেটে ঝুলছিল। কর্তিত অঙ্গুলি নিয়ে যুদ্ধ করতে বাধা হচ্ছিল। এ কারণে পায়ের দ্বারা চেপে ধরে অঙ্গুলি তিনটি টেনে ছিঁড়ে ফেলে যুদ্ধ করে যেতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত তিনিও শাহাদতের অমিয় পিয়ালা পান করলেন।

এবার বিচক্ষণ রণকুশলী যোদ্ধা মহাবীর খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা) অগ্রসর হয়ে সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে যুদ্ধ পরিচালনা করতে লাগলেন। তিনি এমন ভীষণ বিক্রমে যুদ্ধ করেছিলেন যে, এক দিনেই তাঁর হাতে একে একে নয়খানা তরবারি ভেঙ্গে যায়। ঐ দিন খালিদ (রা) তাঁর রণকৌশল পূর্ণরূপে প্রকাশ করেছিলেন। তিনি যুদ্ধ করছিলেন এবং পিছে হটে আসছিলেন এভাবে মুসলিম সেনাদের কাফির বাহিনীর ভিড়ের মধ্য হতে বের করে এনে মুসলিম সৈন্যদের আসন্ন ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করলেন। পরে সেনাবাহিনী সুবিন্যস্ত করে নিয়ে নতুন উদ্যমে আক্রমণ চালিয়ে মুসলমানদের থেকে চল্লিশ গুণ বেশি কাফির সৈন্যকে ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করতে বাধ্য করেন।

এই যুদ্ধে মাত্র ১২জন মুসলমান শহীদ হয়েছিলেন। এই যুদ্ধের পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা)-কে সাইফুল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র তরবারি উপাধি দ্বারা ভূষিত করেছিলেন। মুসলিম বাহিনীর মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে মুতার যুদ্ধের ঘটনা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অবগত করালেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীদের মুতার ঘটনা বর্ণনা করে শুনালেন। প্রথমে হযরত যায়েদ (রা) ইসলামী পতাকা ধারণ করলেন এবং যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হলেন। পরে জাফর (রা) পতাকা তুললেন তিনিও শাহাদত বরণ করলেন। এরপরে ইবনে রওয়াহা পতাকা ধারণ করলেন এবং তিনিও

www.nagorikpathagar.org

শাহাদতের পিয়ালা পান করলেন। তারপরে আল্লাহ্র এক তরবারি অগ্রসর হয়ে ইসলামের পতাকা ধরলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর হাতে মুসলমানদের বিজয় গৌরবে গৌরবান্বিত করলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই কথা উপস্থিত জনগণকে শুনাচ্ছিলেন আর তাঁর মুবারক চক্ষে অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছিল।

মক্কা বিজয় ঃ অষ্টম হিজরী

রাসূলে আকরাম (সা) ও মক্কার কাফিরদের মধ্যে যে সন্ধি হয়েছিল তা স্থায়ী হয় নাই। কুরাইশগণই সর্বপ্রথম সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করেছিল। কুরাইশদের মিত্র গোত্র বনু বকরদের দ্বারা মুসলমানদের মিত্র গোত্র বনী খুজাআদের উপরে আক্রমণ করিয়ে দেয়। বনী খুজআদের উপরে এমনি নিষ্ঠুরভাবে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল যে, তারা কাবা গৃহের হেরেম শরীফে আশ্রয় গ্রহণ করেও তাদের হাত হতে বাঁচতে পারে নি। সেখানেও তাদের হত্যা করা হয়েছিল। বনী খুজাআ গোত্রের কয়েকজন নেতা মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট উপস্থিত হয়ে এই বর্বর হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আবেদন জানায়।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুরাইশদের এই পাশবিক হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য অষ্টম হিজরী সনে মক্কা অভিযানের পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। এবং এটা সম্পূর্ণ গোপন রেখে সৈন্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করলেন। অভিযানের আয়োজনের সংবাদ যাতে বাইরে না যেতে পারে তজ্জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনার চতুর্দিকে সীমানায় কড়া প্রহরার ব্যবস্থা করলেন, বিশেষ সতর্কতা সহকারে এই প্রস্তুতি সমাপ্ত হল।

কিন্তু মক্কা যাত্রার পূর্বক্ষণে একটি অবাঞ্ছিত কাণ্ড ঘটে গেল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র জনৈক সাহাবী হাতিব ইবনে বালতায়া (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে হিজরত করেছিলেন। কিন্তু তার পরিবার-পরিজন তখনও পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করছিল। মক্কা আক্রমণের প্রস্তুতি দেখে তাঁর মনে আশঙ্কা হল হয়ত মক্কা আক্রমণের সময় কুরাইশগণ তার পরিজনদের উপর কঠোর নির্যাতন চালাতে পারে। এই কারণে কুরাইশদের সহানুভূতি লাভের আশায় একখানি গোপন পত্রসহ জনৈকা ক্রীতদাসীকে মক্কায় পাঠিয়ে দিলেন। সেই পত্রে তিনি মুসলমানদের দ্বারা মক্কা আক্রমণের কথা উল্লেখ করে কুরাইশগণকে হুঁশিয়ার করে দিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) সঙ্গে সঙ্গেই এই চিঠির কথা অবগত হলেন। আর তৎক্ষণাৎ হযরত আলী (রা)-কে ডেকে পাঠালেন। আলী (রা) উপস্থিত হওয়া মাত্র বললেন ঃ আলী তুমি দুইজন সাথীসহ এই মুহূর্তে মক্কার পথে বের

www.nagorikpathagar.org

হয়ে যাও। পথিমধ্যে এক বাগিচায় একজন ক্রীতদাসীকে বিশ্রামরত অবস্থায় দেখতে পাবে, তার কাছে একখানা গোপন পত্র আছে তা নিয়ে আস।

হযরত আলী (রা), হযরত জোবায়ের (রা), হযরত মকদাদ (রা) দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করে ত্বরিত বেগে ধাবিত হলেন। যথাস্থানে উপস্থিত হয়ে সত্যিই তাঁরা উক্ত ক্রীতদাসীর দেখা পেলেন। তারা তাকে আটক করে পত্রখানা তলব করলেন। প্রথমে সে পত্রের কথা অস্বীকার করল। কিন্তু তাকে দেহ তল্লাশির ভয় দেখালে সে মাথার চুলের মধ্য হতে পত্রখানা বের করে দিল। সাহাবীত্রয় পত্রখানা নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট উপস্থিত হলেন এবং পত্রখানা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র হাতে অর্পণ করলেন। তৎক্ষণাৎ পত্রখানা পাঠ করা হল। দেখা গেল তাতে কুরাইশদের নিকট এমন গোপন বিষয় লেখা আছে যা এ সময় তাদের জানার কথাই নয়।

যা হোক, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাতীব (রা)-কে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করলেন, একি ব্যাপার হাতীব ? হাতীব (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমাকে শাস্তিদানের পূর্বে প্রকৃত অবস্থা শ্রবণ করুন। কুরাইশদের প্রতি আমার কোন আকর্ষণ বা সহানুভূতি নেই। শুধু তাদের সহানুভূতি লাভের আশায় এটা করেছি। কারণ মক্কায় অন্য মুহাজিরদের আত্মীয়-স্বজন রয়েছে। মক্কা আক্রমণের সময় তারা তাদের স্ত্রী-পুত্রদের সাহায্য করবে। কিন্তু আমার স্ত্রী-পুত্রদের সাহায্য করবার মত কেউ মক্কায় নেই, যদি তাদের প্রতি একটু লক্ষ্য করে—শুধু এই উদ্দেশ্যেই আমি এ কাজ করেছি। এ ছাড়া পত্র লিখার পিছনে আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। আল্লাহ্র কসম আমি ইসলাম এবং মুসলিমদের সামান্য ক্ষতিও সহ্য করতে পারি না এবং তা আমার উদ্দেশ্যও ছিল না।

কিন্তু হযরত উমর (রা) অত্যন্ত উগ্র মেজাজী লোক ছিলেন। তাঁর ক্রোধ সংবরণ হচ্ছিল না। তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনি অনুমতি দান করুন, এই মুনাফিকের জান হালাক করে দেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, উমর! শান্ত হও হাতীব বদর যুদ্ধের মুজাহিদ! তুমি কি ভুলে গিয়েছ বদরের মুজাহিদদের সকল অপরাধই ক্ষমার যোগ্য।

যা হোক, আর কোনরূপ অঘটন ঘটলো না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রস্তুতি পর্ব সম্পন্ন করে দশ হাজার মুসলিম সৈন্যের এক শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে ১০ই রমযান তারিখে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করলেন। দীর্ঘ আট বছর পূর্বে যে মক্কা হতে রাতের অন্ধকারে তিনি একাকী বের হয়ে এসেছিলেন আট বছর পরে সেই পিতৃভূমির পানে প্রত্যাবর্তন করছেন রাজকীয় আড়ম্বরে। আজ তাঁর সঙ্গী দশ হাজার মুসলিম সৈনিক।

www.nagorikpathagar.org

অধিকাংশ সাহাবীই আজ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র সঙ্গে চলেছেন। পথিমধ্যে সাফওয়া নামক স্থানে উপস্থিত হবার পর মক্কা হতে বহু লোক এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট ইসলাম গ্রহণ করলেন। এর মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র চাচা আব্বাস (রা)-ও ছিলেন। তিনি মক্কার জীবনে সর্বদাই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র কুশল কামনা করতেন। এতদসত্ত্বেও এতদিন ইসলাম গ্রহণ করেন নি। আজ তিনি সপরিবারে ইসলাম গ্রহণ করলেন। অতপর তার পরিবারবর্গকে মদীনায় পাঠিয়ে দিয়ে নিজে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র সঙ্গে চললেন।

আনসার সাহাবী সা'দ বিন ওবাদার হাতে মুসলিম বাহিনীর একটি পতাকা ছিল। তিনি আবেগভরে বলছিলেন, আজ ভীষণ যুদ্ধের সময়ে হেরেম শরীফে রক্ত প্রবাহিত করা অসঙ্গত হবে না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এটা জানতে পেরে বললেন, না এরূপ কথা বলো না। বরং আজ কা'বা শরীফের গৌরবের দিন। আজ কা'বা তার নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবে। মুসলিম বাহিনী মক্কার উপকণ্ঠে পৌছলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে মক্কা শহর পরিবেষ্টন করে আগুন জ্বালাতে হুকুম করলেন। যখন কুরাইশরা জানতে পারলো মুসলমানরা একেবারে তাদের ঘাড়ের উপরে এসে পৌছেছে তখন তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তাদের নেতা আবূ সুফিয়ানকে মুসলিম বাহিনীর খবর নেয়ার জন্য প্রেরণ করলো। আবূ সুফিয়ান এসে দেখতে পেল সারা প্রান্তর লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েছে। এই দৃশ্য দেখে সে অবাক হয়ে কাষ্ঠ পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল। এদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) পূর্ব হতেই প্রহরী নিযুক্ত করে রেখেছিলেন তাঁরা দূরে থেকেই প্রহরার কার্য করছিলেন।

মুসলিম প্রহরীরা আবূ সুফিয়ানকে দেখতে পেয়ে তাকে গ্রেফতার করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট উপস্থিত করলেন। হযরত উমর (রা) আবূ সুফিয়ানকে দেখামাত্র তলোয়ার কোষমুক্ত করে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! হুকুম করুন, আজ আল্লাহ্র দুশমনের গর্দান উড়িয়ে দেই। কিন্তু আব্বাস (রা) আবূ সুফিয়ানের প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে রাসূলে পাক (সা)-র নিকট সুপারিশ করলেন। হযরত আব্বাস (রা)-এর সুপারিশ মঞ্জুর করে দয়ার প্রতীক মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে মাফ করে দিলেন। সারা রাত আবূ সুফিয়ান হযরত আব্বাস (রা)-এর তাঁবুতে অবস্থান করে পরদিন প্রত্যুষে রাসূলে পাক (সা)-এর খিদমত মুবারকে উপস্থিত হলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আবূ সুফিয়ান এখনও কি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে না ?

www.nagorikpathagar.org

এবার আবূ সুফিয়ান তার গর্বিত মস্তক নত করে দিয়ে মুখে পাঠ করলেন, "আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্ (সা)।" মুসলমান হয়ে গেলেন।

মক্কায় প্রবেশ

রাসূলে পাক (সা) স্বীয় সৈন্য বাহিনীকে দশ ভাগে বিভক্ত করে বিভিন্ন পথে মক্কায় প্রবেশ করবার হুকুম দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল কাসওয়ার পৃষ্ঠে আরোহণ করে অবনত মস্তকে বিজয়ীর বেশে রাব্বুল আলামীনের দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে করতে সম্পূর্ণ নির্বিবাদে নগরে প্রবেশ করলেন; রক্তপাত ব্যতীতই মক্কা নগরী বিজিত হল। এটা পদানত হল না। সে তার প্রকৃত মর্যাদা ফিরে পেল।

মক্কা বিজয়ের এই দৃশ্যের মধ্যে বিশ্ব মানবের জন্য বহু কিছু শিক্ষণীয় বিষয় অবশ্যই রয়েছে। রাসূলে আকরাম (সা) বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করলেন। দিগন্ত ব্যাপী আনন্দ উল্লাসের তুফান বয়ে গেল। কিন্তু দম্ভ, অহঙ্কার ও নিষ্ঠুরতার লেশমাত্র পরিদৃষ্ট হল না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সর্বদা সম্পূর্ণ সচেতন। সে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হল সুখে-দুঃখে, আনন্দে ও নিরানন্দে, উত্থানে ও পতনে যেকোন অবস্থায় আল্লাহকে ভুলে না যাওয়া, কাউকেও অপমানিত ও লাঞ্ছিত না করা। বরং ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় দানের মহান দায়িত্ব পালন করে যাওয়া।

বস্তুত মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন আল কাসওয়ার পৃষ্ঠে আরোহণ করে মক্কা নগরীতে প্রবেশ করছিলেন তখন দেখা গেল কোন হত্যার উন্মাদনা নেই, প্রতিশোধ গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা নেই, রক্তপাতের কোন বাসনা নেই। প্রশান্ত মূর্তিতে অবনত মস্তকে আল্লাহ্র গুণ-কীর্তন করতে করতে মক্কায় প্রবেশ করছেন। এর উদ্দেশ্য এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র উম্মতগণ এই দৃশ্য দেখে প্রত্যক্ষ শিক্ষা লাভ করুক। মানুষ সুখে-দুঃখে, আনন্দ উৎসবে সর্ব অবস্থায় যেন আল্লাহকে স্মরণ রাখে, কোন অবস্থায় যেন ভুলে না যায়।

মক্কা বিজয়ের পরে কাফিরগণ স্বাভাবিকভাবেই ভয়ে অস্থির হয়ে পড়েছিল। তারা ভেবেছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি, অসহায় মুসলমানদের প্রতি তেরটি বছর ধরে যে দুর্বিষহ নির্যাতন-নিপীড়ন ও চরম নিষ্ঠুর আচরণ করেছে, আজ আর তাদের রক্ষা নেই। আজ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার চরম প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। কিন্তু এ ছিল তাদের ধারণা মাত্র। কিন্তু দয়ার নবী রাহমাতুল্লিল আলামীন বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করে তাদের ভীত এবং সন্ত্রস্ত ভাব দেখে বললেন,

www.nagorikpathagar.org

তোমাদের ভয় নেই, চিন্তাও নেই। তোমাদের নিকট হতে কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে না। তোমাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া হল।

যখনই তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র মুবারক জবানে ক্ষমার কথা শুনতে পেল, তখনই তারা রাহমাতুল্লিল আলামীনের মুবারক কদমে লুটিয়ে পড়ে মুখে উচ্চারণ করল আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্ (সা)। মক্কার কাফিরকুল কুফরী ছেড়ে তৌহিদের আবেকাওসার পান করে জীবনকে ধন্য করলো।

অতপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীগণকে নিয়ে কা'বা গৃহের দিকে অগ্রসর হলেন। কা'বা গৃহের নিকটে পৌঁছেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) তকবীর পাঠ করতে শুরু করলেন। সঙ্গে দশ হাজার সাহাবীর মুখে একই আওয়াজ ধ্বনিত হতে লাগলো। আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে আজ মক্কার অলি-গলি পথ-প্রান্তর মুখরিত হয়ে উঠল। এভাবে তাকবীর পাঠরত অবস্থায় সাহাবীগণকে নিয়ে কা'বা গৃহের তাওয়াফ সম্পাদন করলেন। তারপর উসমান ইবনে তালহার নিকট হতে চাবি নিয়ে কা'বা গৃহের দরজা খুলে অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন এবং প্রাণ ভরে আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চারণ করতে লাগলেন। এবার দৃষ্টি পড়ল গৃহাভ্যন্তরে সযত্নে রক্ষিত দেব-দেবীর মূর্তিগুলির প্রতি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুবারক হাতের যষ্টি দ্বারা এইগুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ করছিলেন আর বলছিলেন জা-আল হাক্কু ওয়া যাহাকাল বাতিলু, ইন্নাল বাতিলা কানা যাহুকা। অর্থাৎ সত্য সমাগত মিথ্যা বিতাড়িত। মিথ্যার বিলোপ অবশ্যম্ভাবী। অতপর কা'বা গৃহের ভিতর হতে হযরত ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ)-এর মূর্তি বাইরে নিক্ষেপ করা হল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) দেখলেন কা'বা গৃহে আরও মূর্তি রয়েছে। সেটা ছিল মাটি হতে উপরে লৌহ নির্মিত একটি চৌপায়ার উপরে স্থাপিত। এটা ছিল তাম্র নির্মিত।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নির্দেশে হযরত আলী (রা) স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর কাঁধের উপরে দণ্ডায়মান হয়ে মূর্তিটি ভেঙ্গে ফেলার চেষ্টা করলেন। কিন্তু হযরত আলী (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র মুবারক দেহভার বহন করতে অপারক হওয়ায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) নেমে পড়লেন। অতপর আলী (রা)-কে কাঁধে তুলে মূর্তিটি ভেঙ্গে ফেলতে বললেন। হযরত আলী (রা) মূর্তিটি ধরে এক আছাড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেললেন। আজ আল্লাহ্র ঘর কা'বা শিরক হতে মুক্ত হয়ে তৌহিদের কেন্দ্রে পরিণত হল।

মক্কা বিজয়ের পরের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) নির্দেশ জারি করলেন, যেন নগর সীমার অভ্যন্তরে কোথাও কোনরূপ রক্তপাত না ঘটে। কা'বা গৃহ ছাড়াও অন্যত্র যে সকল দেব-দেবীর মূর্তি ছিল, সেগুলো ভেঙ্গে ফেলার জন্য লোক প্রেরণ করা

www.nagorikpathagar.org

হত। বনী জামিমা গোত্রের নিকট খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা) পৌঁছে তাদের ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করল কিন্তু তা বোঝা গেল না, উপরন্তু তারা এমন ব্যবহার করল যার মধ্যে কিছু বিদ্রোহের ভাব প্রকাশ পেল। খালিদ (রা) এতে ক্রোধান্বিত হয়ে তাদের বন্দী করে ফেললেন। এমন কি কয়েকজনকে হত্যাও করলেন। অন্যান্য সাহাবী খালিদের এই কাজ পসন্দ করলেন না। তাঁরা তাঁকে বাধা দান করলেন।

এই সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র কর্ণগোচর হল। তিনি এই সংবাদে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তিনি বললেন ঃ আয় আল্লাহ্! আয় আল্লাহ্ আজ খালিদ যা করেছে এতে আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ। তিনি তৎক্ষণাৎ আলী (রা)-কে প্রচুর অর্থ-সহ উক্ত গোত্রের ক্ষতিপূরণ ও সন্তুষ্টি বিধানের নিমিত্ত প্রেরণ করলেন।

হযরত আলী (রা) তথায় পৌঁছে খালিদ (রা) যাদের হত্যা করেছিলেন তাদের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি তদন্ত করে তাদের পরিবারবর্গকে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দান করলেন। হযরত আলী (রা)-র উদার ও মহত ব্যবহারে তারা অত্যন্ত প্রীত হল। এভাবে একটি উত্তম পরিবেশ সৃষ্টি করে হযরত আলী (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট ফিরে এলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আলী (রা)-র এরূপ যথাযোগ্য ও কর্তব্যপরায়ণতার বিষয় অবগত হয়ে তার কর্ম দক্ষতার জন্য তাকে অশেষ ধন্যবাদ দিলেন এবং প্রাণ খুলে দোয়া করলেন।

যখন মক্কা ফতে হয়ে গেল, কুরাইশ গোত্রের লোকেরা সবাই ইসলাম গ্রহণ করলেন। সেই সময় কিছু আনসার সাহাবীর মনে সন্দেহ জাগলো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র আপন গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করছে এবং তিনি আপন মাতৃভূমিতে ফিরে এসেছেন, এখন এমন কিছু ঘটে না যায় যাতে তিনি আমাদের ত্যাগ করে এখানেই থেকে যান।

আনসারদের এই সন্দেহের কথা কোন প্রকারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র কর্ণগোচর হল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আমার উপর তোমাদের কিছু সন্দেহ আছে ? প্রথম তারা কথাটা গোপন করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু যখন দেখলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) জেনে ফেলেছেন তখন তারা বলে ফেললেন যে, আমাদের মনের মধ্যে এই জেগেছে যে, আপনি আমাদের ত্যাগ করে মক্কায় থেকে যান। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তা কখনো হতে পারে না। আমি বেঁচে থাকলেও তোমাদের সঙ্গেই বেঁচে থাকব, তোমাদের নিকটেই মৃত্যুবরণ করব। তখন তাদের সন্দেহ দূরীভূত হল এবং সবাই খুশিতে ভরে গেলেন।

www.nagorikpathagar.org

হুনায়েনের যুদ্ধ

মক্কা বিজয়ের পর পরই মুসলমানদের আরবের একটি মর্যাদাসম্পন্ন ও শক্তিশালী গোত্র হাওয়াজিনের সহিত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ ইতিহাসে হুনায়েনের যুদ্ধ নামে পরিচিত।

মক্কা এবং তায়েফের মধ্যবর্তী স্থানে একটি প্রান্তরের নাম হুনায়েন। এই প্রান্তরে হাওয়াজিন, সাকীফ প্রভৃতি ভ্রাম্যমাণ জাতি বাস করতো। তাদের নিকটবর্তী স্থানে বাস করত সায়াদ গোত্রের লোক। রাসূলুল্লাহ্ (সা) শিশুকালে যে হালিমার দুগ্ধ পান করেছিলেন এবং যাঁর স্নেহের ক্রোড়ে লালিত-পালিত হয়েছিলেন তিনি ছিলেন এই গোত্রেরই এক দরিদ্র মহিলা। উল্লিখিত গোত্রের সমস্ত লোকই যথেষ্ট শক্তির অধিকারী এবং বিত্তশালী ছিল। এদের মধ্যে হাওয়াজিন গোত্রের লোকেরাই মর্যাদাসম্পন্ন এবং উন্নত। এদের বাসস্থান ছিল তায়েফ নগরীর মত সুদৃঢ় দুর্গের দ্বারা সুরক্ষিত। এরা আরবের সুপ্রসিদ্ধ লাত দেবীর উপাসনা করত।

এরা প্রথম হতেই ইসলামের ক্রমোন্নতিকে বিষদৃষ্টিতে দেখে আসছিল। ইতিমধ্যে মুসলমান কর্তৃক মক্কা বিজিত হওয়ার পর হাওয়াজিন গোত্রের এবং সাকীফ গোত্রের লোকেরা বলাবলি করতে লাগল যে, মক্কার লোকেরা যুদ্ধে তেমন পারদর্শী নয় বলেই মুসলমানদের নিকট পরাজয় বরণ করেছে। যদি মুসলমানরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করত তবে বুঝতে পারত যুদ্ধ কাকে বলে। মক্কার উপকণ্ঠের বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করায় তারা উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ল। ভাবল যে, হয়ত এখন হতে নতুন মুসলিমগণ কর্তৃক যেকোন মুহূর্তে তারা আক্রান্ত হতে পারে, এজন্য তারা কাল বিলম্ব না করে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা বিজয়ের পর মদীনা অভিমুখে যাত্রা করলেন, তখন তারা ভাবল যে, এই মুসলমানরা তাদের আক্রমণের জন্য আগমন করছে। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়েই তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার প্রস্তুতি গ্রহণ করে ফেলল। তারা এক বিরাট শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হতে লাগল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই সংবাদ পাওয়া মাত্র ৭ই শওয়াল শনিবার বারো সহস্র মুসলিম সৈন্য নিয়ে তাদের মুকাবেলার জন্য অগ্রসর হলেন। হযরত আলী (রা) এই বাহিনীর নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করেছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

হাওয়াজিন গোত্রের নেতা মালিক বিন আওফ ও সাকীফ গোত্রের নেতা কেনানা বিন আবূ ফিয়ালিন পূর্বেই নিজেদের বাহিনীসহ হুনায়েনের প্রান্তরে পৌঁছে গিয়েছিল। মুসলমানগণ সেখানে পৌঁছামাত্র যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই মুসলিম বাহিনী শত্রু সৈন্যদিগকে হটিয়ে দিলেন। ওরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করতে লাগল। মুসলমানগণ বিজয়ের উল্লাসে যুদ্ধের প্রতি অমনোযোগী হয়ে শত্রুর পরিত্যক্ত মালামালের প্রতি মনোযোগ দিলেন। মুসলমানদের এই ভুল পদক্ষেপ দেখতে পেয়ে পলায়নপর শত্রু বাহিনী পুনরায় ফিরে দাঁড়াল এবং সর্বশক্তি দিয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালালো। তারা বর্ষার ধারার ন্যায় তীর নিক্ষেপ করতে লাগল। ফলে মুসলমানদের টিকে থাকা কঠিন হয়ে দাঁড়াল। কাফিরদের আক্রমণের বেগ সহ্য করতে না পেরে কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবী ব্যতীত প্রায় সকলেই পলায়ন করতে লাগলেন। তবে এই সঙ্কটময় মুহূর্তেও রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রদত্ত পতাকা উঁচু রাখার জন্য যাঁরা পরম ধৈর্য সহকারে যথাস্থানে স্থির ছিলেন তাঁদের মধ্যে হযরত আলী (রা) ছিলেন সর্বপ্রথম।

ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আব্বাস (রা)-কে বললেন সাহাবীদেরকে আহ্বান করতে। হযরত আব্বাস (রা) আহ্বান করতে লাগলেন ঃ হে আনসার, হে বায়াতে রিদওয়ান! তোমরা আল্লাহ্র রাসূলকে ফেলে কোথায় চলেছ। হযরত আব্বাস (রা)-এর আহ্বান শুনে মুসলমানদের চেতনা ফিরে এল। তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারলেন। কিন্তু তাঁরা ফিরে আসতে চাইলেও তাঁদের সওয়ারীর জন্তুগুলো ফিরাতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত সওয়ারীর পৃষ্ঠ হতে অবতরণ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট সমবেত হলেন। এবার মুসলমানরা সমবেত হয়ে কাফিরদের উপর আক্রমণ চালালেন। কাফিররা আক্রমণের বেগ সহ্য করতে না পেরে যুদ্ধ ক্ষেত্র পরিত্যাগ করে পলায়ন করতে লাগল।

ইসলামের ইতিহাসে দ্বিতীয় ঘটনা মুসলমানদের বিজয়ের পরে পরাজয়। এর প্রথম কারণ নিজেদের সংখ্যাধিক্যের কারণে গর্বে গর্বিত হওয়া, দ্বিতীয় কারণ সেনাবাহিনীর সকলেই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ না করা। তাদের উদ্দেশ্য থাকে ধনসম্পদ লাভ করা। এ থেকে মুসলমানদের শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন। মুসলমানদের যুদ্ধ হবে শুধু আল্লাহ্কে খুশি করার জন্য এবং ভরসা শুধু আল্লাহ্র সাহায্যের উপর।

হুনায়েনের যুদ্ধে পরাজিত কাফিররা তায়েফে চলে যায়। মুসলমানরাও তাদের পিছে পিছে তায়েফে চলে যান, কাফিররা দুর্গে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ

www.nagorikpathagar.org

করে দেয়। মুসলমানরা আঠারো দিন পর্যন্ত দুর্গ অবরোধ করে রাখেন। কিন্তু তাদের খোঁজ পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত সাহাবীগণের পরামর্শক্রমে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। কিছু দিন পরে মদীনায় গিয়ে তারা ইসলাম গ্রহণ করেন।

হুনায়েনের যুদ্ধে মুসলমানরা বহু পরিমাণে গনিমত প্রাপ্ত হন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই গনিমতের বৃহৎ অংশ মক্কার নওমুসলিমদের মধ্যে বন্টন করে দেন। এ ব্যাপারে তারা খুশি হয়ে যায়। আনসারদের মধ্য হতে কিছুসংখ্যক এটা ভাল মনে করলেন না, তারা নিজেরা আলাপ আলোচনা করতে লাগলেন। আশ্চর্য, আল্লাহ্র রাসূল সমস্ত গনিমত কুরাইশদের প্রদান করলেন, যে কুরাইশদের রক্তে আমাদের তরবারি এখনও রঞ্জিত রয়েছে।

কোন প্রকারে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ কথা জানতে পারলেন এবং তাদের পৃথক করে নিয়ে বললেন, হে আনসারগণ! আমি একি কথা শুনতে পাচ্ছি? এ কথা কি সত্য নয়, তোমরা পথভ্রষ্ট ছিলে আল্লাহ্ আমার দ্বারা তোমাদের হিদায়েত দান করেছেন! তোমরা গরীব ছিলে আল্লাহ্ আমার দ্বারা সচ্ছলতা দিয়েছেন, তোমরা একে অন্যের দুশমন ছিলে আল্লাহ্ তা'আলা আমার দ্বারা তোমাদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন! তোমাদের আখিরাতের অফুরন্ত নিয়ামতের অধিকারী করেছেন, এখন তোমরা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ধন-সম্পদের মোহে তোমাদের আত্মা কলুষিত করছ।

হে আনসারগণ! তোমরা তো ইসলামের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছ। এই সমস্ত লোকেরা নতুন ইসলাম গ্রহণ করেছে, আমি তাদের মন জয় করার জন্য দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জিনিস তাদের প্রদান করলাম। হে আনসারগণ! তোমরা কি এটা ভালবাস না—তারা দুনিয়ার মাল-সামান নিয়ে ঘরে ফিরে যাক, আর তোমরা আল্লাহ্র রাসূলকে নিয়ে ঘরে ফিরে যাও! আল্লাহ্র কসম, আমি তোমাদের এত ভালবাসি যদি আমি মুহাজির না হতাম তবে আমি আনসার হওয়াটাই পসন্দ করতাম। যদি মানুষ ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করত তবে আমি আনসারদের পথ অবলম্বন করতাম।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র ভাষণ শুনে আনসারগণ অঝোর নয়নে কাঁদতে লাগলেন। তারা এত কাঁদলেন যে, প্রান্তরে ক্রন্দনের শোর পড়ে গেল এবং তাদের অশ্রুধারা নির্গত হয়ে বক্ষস্থল প্লাবিত হয়ে গেল। চক্ষের পানি মুছে বলতে লাগলেন, আমরা চাই না দুনিয়ার ধনসম্পদ, চাইনা গনিমত, আমরা আল্লাহ্র রাসূলকে নিয়ে ঘরে ফিরে যেতে চাই।

www.nagorikpathagar.org

মদীনায় প্রত্যাবর্তন

আররানা নামক স্থান হতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) উমরার ইহরাম বাঁধলেন। এমতাবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে উমরা আদায় করলেন। পরে আতাব বিন ওসহিদ যার বয়স মাত্র আঠার বছর হয়েছিল, কিন্তু আল্লাহ্-ভীরুতায় শীর্ষ স্থান অধিকার করেছিলেন, তাকে গভর্নর নিযুক্ত করে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

তবুকের যুদ্ধ

অষ্টম হিজরীর যিলকদ মাস শেষ হবার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা বিজয়, হুনায়েন ও তায়েফের যুদ্ধ শেষ করে সাহাবীদেরসহ মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন। নবম হিজরীর কয়েক মাস অতিবাহিত হতে না হতেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) জানতে পারলেন, রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস মুতার যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্ত মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। সংবাদটি প্রকৃতপক্ষে সত্য ছিল।

মুতার প্রান্তরে তিন সহস্র মুসলিম সৈন্যের সহিত রোম সম্রাটের এক লক্ষ সৈন্য শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। এই পরাজয়ের কথা হিরাক্লিয়াস ভুলে যায় নাই। মাত্র অল্প কিছুদিন পূর্বে তার সৈন্য বাহিনী কর্তৃক পারস্য দেশ বিজিত হওয়ায় বিজয় উল্লাসে কিছুদিন অতিক্রান্ত হল। এবার আরব দেশ জয় করবার উদ্দেশ্যে সৈন্য সংগ্রহ করতে লাগলেন। নব অধিকৃত পারস্য দেশ হতেই বহু সৈন্য সংগ্রহ করা হল। অতপর যুদ্ধের প্রস্তুতি শেষ হবার পর বিরাট এক সৈন্য বাহিনী তবুকের প্রান্তরে যা মদীনা এবং সিরিয়া সীমান্তে অবস্থিত ছিল—সমবেত করল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই সংবাদ যথাসময়ে জানতে পারলেন। তিনিও এবার বিপুল সমরায়োজন করলেন। কারণ রোম সম্রাটের সমর শক্তির কথা রাসূলুল্লাহ্ (সা) ভাল করেই জানতেন। ইতোপূর্বে তার সৈন্য বাহিনীর সাথে মুসলমানদের যুদ্ধও হয়েছে। যদিও সে যুদ্ধে মুসলমানগণ জয়লাভ করেছেন। কিন্তু রোম সম্রাটের শক্তির কথা অস্বীকার করবার উপায় ছিল না। এজন্যই রাসূলুল্লাহ্ (সা) ব্যাপকভাবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। প্রায় সমগ্র আরব দেশ তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র করায়ত্ত। সুতরাং সহজেই সৈন্য সংগ্রহের কাজ হয়ে গেল। কিন্তু এই বিপুল বাহিনীর প্রয়োজনীয় অস্ত্র, পোশাক, রসদ এবং আনুষঙ্গিক সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা সহজসাধ্য নয়।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই যুদ্ধে আর্থিক সাহায্যদান করার জন্য সাহাবীদের আহবান করলেন। তারা অকাতরে আর্থিক সাহায্য দান করলেন। হযরত আবূ

www.nagorikpathagar.org

বকর সিদ্দীক (রা) তাঁর যথাসর্বস্ব এনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র সামনে রাখলেন। বিখ্যাত ধনী হযরত উসমান (রা) বিপুল পরিমাণে ধনসম্পদ দান করলেন। তিন শ উট, এক হাজার দিনার ও এক শ ঘোড়া যুদ্ধের জন্য দান করলেন হযরত উসমান গনি (রা)। হযরত উমর (রা) তাঁর সমস্ত সম্পদের অর্ধাংশ এনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট হাযির করলেন। এভাবে সাহাবীদের মুক্তহস্ত দানের দ্বারা তবুক যুদ্ধের সরঞ্জাম যোগাড় করা হয়েছিল। তবুক যুদ্ধে যোগদানে ইচ্ছুক কিছু লোকের সরঞ্জাম অভাব রয়ে গেল। তারা যুদ্ধে যোগদান করতে পারবেন না আশঙ্কায় শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করতে লাগলেন। এবার চেষ্টা চালিয়ে সকলের জন্য সামান যোগাড় করা হল, ফলে যারা যুদ্ধে যোগদান করতে ইচ্ছুক ছিলেন সকলেই যুদ্ধে যোগদান করতে পারলেন।

যখন তবুক যুদ্ধের কাল তখন মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি ধর্মীয় দায়িত্ব ছাড়াও পারিবারিক, সামাজিক, শাসনতান্ত্রিক এবং বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রীয় দায়িত্বও পালন করতে হত। একারণে সবসময় তাঁর মদীনায় উপস্থিত থাকার বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

আবার তবুকের মত গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধেও উপস্থিত থাকার প্রয়োজন ছিল। সুতরাং তবুক যুদ্ধ উপলক্ষে মদীনায় অনুপস্থিত থাকাকালে একজন সুযোগ্য লোকের প্রয়োজন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র অবর্তমানে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে তাঁর কার্য পরিচালনা করতে পারেন। এ তামাসার কথা নয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) অনেক চিন্তা করে হযরত আলী (রা)-কেই একাজের জন্য মনোনীত করলেন। একমাত্র আলী (রা) এ দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

যুদ্ধ যাত্রার পূর্বক্ষণেই হযরত আলী (রা)-কে ডেকে বললেন, আলী তোমাকে মদীনায় থাকতে হবে। তুমি মদীনায় থেকে আমার কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করবে। আল্লাহ্র রাসূলের কথা অবশ্য শিরোধার্য, অমান্য করার উপায় নেই। কারণ যদি রাসূলের হুকুম অমান্য করা হয় তবে আল্লাহ্র হুকুম অমান্য করা হয়। আল্লাহ্র হুকুম অমান্য করলে দুনিয়া ও আখিরাত বরবাদ হওয়া ব্যতীত কোন উপায় থাকে না। হযরত আলী (রা) মেনে নিলেন। কিন্তু তাতে যেন তাঁর মন ভরছিল না।

বিমর্ষ বদনে হযরত আলী (রা) আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমিতো পূর্বের সকল জিহাদেই আপনার সঙ্গে থাকতাম। আজ আমাকে মদীনায় ফেলে যাচ্ছেন। এটা কি আমার কোন অপরাধের কারণে, বুঝতে পারছি না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আলী! তুমি ভুল বুঝেছ। তোমার কোন অপরাধ বা অযোগ্যতা তোমাকে যুদ্ধে না নেয়ার কারণ নয়। তবে কেন যে তোমাকে যুদ্ধে না

www.nagorikpathagar.org

নিয়ে মদীনায় রেখে যাচ্ছি, তাতো পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তোমাকে এমন একটি দায়িত্ব পালনের জন্য মদীনায় রেখে যেতে চাই যা পালন করা অন্য কারো দ্বারা সম্ভব নয়। হযরত মূসা (আ) যেমন হযরত হারুন (আ)-এর উপর দায়িত্ব অর্পণ করে গিয়েছিলেন আমিও তদ্রূপ আমার দায়িত্ব তোমার উপর অর্পণ করে যাচ্ছি। তা কি তুমি পছন্দ কর না? এ কথা শুনে হযরত আলী (রা) যারপর নাই খুশি হলেন। অতপর মদীনায় থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রদত্ত দায়িত্ব পালনে মনোনিবেশ করলেন। এদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নেতৃত্বে ত্রিশ হাজার মুসলিম সৈন্যের বিরাট বাহিনী ইসলামী পতাকা উঁচু করে রোমক শক্তির বিরুদ্ধে যাত্রা করলেন। তখন এমন এক অভাবনীয় দৃশ্যের অবতারণা হল যার কোন তুলনা হয় না। এর পূর্বে মুসলমানগণ আর কখনো এত বড় বিশাল বাহিনীসহ যুদ্ধযাত্রা করেন নি। এ কারণেই আজ মুসলমানদের মনে এক তৃপ্তির আনন্দ ফুটে উঠেছে। তাই তারা আজ আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞ।

বাহিনী গন্তব্য স্থানের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। জোরফ নামক স্থানে পৌছলে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই তার অনুসারী দলসহ বাহিনী হতে পৃথক হয়ে ফিরে আসল। কিন্তু মুসলিম বাহিনী এতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। কারণ এর পূর্বে উহুদ যুদ্ধের সময়ও মুসলিম সৈন্যের সংখ্যা ছিল সাত শ মাত্র। তখনও এই লোকটা পথিমধ্য হতে তার দলবল নিয়ে সরে পড়েছিল। আল্লাহ্র মর্জি, তাতে মুসলমানদের কোন ক্ষতি হয় নাই। আর এবার তো মুসলমানদের সংখ্যা ত্রিশ সহস্র। সুতরাং আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইর বিশ্বাসঘাতকতায় মুসলমানদের মাথা ঘামাবার কোন কারণ ছিল না।

এবার মুসলিম বাহিনীর গন্তব্যস্থলের দূরত্ব ছিল অনেক বেশি, তারা সুদীর্ঘ মরুপথ দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন। প্রচণ্ড সূর্যকিরণে কলেবর ঘর্ম-স্নাত হয়ে আসছিল কিন্তু ধর্মপ্রাণ মুসলিমগণ অসীম মনোবল ও ইসলাম রক্ষার তাকিদে সকল কষ্ট অবহেলা করে অগ্রসর হচ্ছিলেন। প্রতিটি সৈনিক পানির পিপাসায় কাতর। তবুও তারা সামান্যতম দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিলেন না। অবশেষে যথাসময়ে মুসলিম বাহিনী সিরিয়া সীমান্তে তবুক নামক প্রান্তরে উপস্থিত হলেন।

এবার মুসলিম বাহিনীর দৃশ্যই তাদের অনুকূলে কাজ করল। যে খৃষ্টানগণ রোম সম্রাটকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্ররোচিত করেছিল, বিশাল মুসলিম বাহিনীর বাহ্যিক দৃশ্য ও সাজসরঞ্জাম দেখে তারা ভয় পেয়ে গেল এবং তারাই আবার রোম সম্রাটকে এসব সংবাদ জানিয়ে যুদ্ধ করতে নিষেধ করল। রোমসম্রাট তাদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করল। এদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)

www.nagorikpathagar.org

মুসলিম বাহিনীসহ কয়েকদিন তবুকে অবস্থান করলেন কিন্তু রোমকদের পক্ষ হতে কোন সাড়া না পেয়ে শেষ পর্যন্ত মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

আরব গোত্রসমূহের মধ্যে ইসলামের প্রসার

হুদায়বিয়ার সন্ধির পরে ইসলাম প্রচারের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। এজন্য এই সন্ধিকে ফাতহুম মুবিন বা মহা বিজয় নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তবুও কিছু কিছু লোক কুরাইশদের ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে পারছিল না। মক্কা বিজয়ের পরে সমস্ত বাধাবিপত্তি দূরীভূত হয়ে ইসলামের পথ একেবারেই উন্মুক্ত হয়ে গেল। এখন ইসলামের আলো আরবের ঘরে ঘরে প্রবেশ করে জাহিলিয়াতের অন্ধকারকে দূরীভূত করে মানুষের মনকে তৌহিদের আলোকে উদ্ভাসিত করে তুলতে লাগল। যারা একদিন ইসলাম এবং মুসলমানদের নাম পর্যন্ত শুনতে পারত না তারাই আজ দূর-দূরান্ত হতে দলে দলে মদীনায় আগমন করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র মুবারক কদমে লুটিয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল।

এই সমস্ত প্রতিনিধিদল নবম হিজরীতেই মদীনায় আগমন করতে থাকে। যে সব প্রতিনিধি মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে আগমন করতে থাকে তাদের কয়েকজনের নাম নিম্নে প্রদত্ত হল।

সাকীফ প্রতিনিধি দল ঃ তবুকের যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনের পরই বনি সাকীফ প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে এসে উপস্থিত হল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদে নববীর সন্নিকটে তাদের থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন, যাতে তারা মুসলমানদের ইবাদতের পদ্ধতি দেখতে পায় এবং কুরআনে করীম শুনতে পায়। বনি সাকীফেরা কিছুদিন মদীনায় অবস্থানের পর ইসলাম গ্রহণ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উসমান ইবনে আবিল আস (রা)-কে তাদের নেতা নির্বাচন করে দিলেন; যদিও তিনি তাদের মধ্যে বয়সে কম ছিলেন। তিনি তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন।

নাজরানের খৃস্টান প্রতিনিধি দল ঃ নাজরানের খৃস্টানরা তাদের ষাটজন সদস্যের এক প্রতিনিধি দল মদীনায় প্রেরণ করলো। তারা রেশমী বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় রাসূলে আকরাম (সা)-র মুবারক দরবারে উপস্থিত হল। তারা তাদের দেশীয় এক প্রকার মূল্যবান চাদর এবং ছবিওয়ালা বিছানা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হাদিয়া প্রদান করল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) চাদর গ্রহণ করলেন এবং বিছানা ফিরিয়ে দিলেন। যখন তাদের নামাযের সময় হল তখন তারা মসজিদে নববীতে তাদের খৃস্ট ধর্মের নিয়ম অনুসারে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায আদায় করল। নামায শেষ করার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের ইসলামের দাওয়াত

www.nagorikpathagar.org

দিলেন। তখন তারা বলল, আমরা তো আপনাদের আগেই মুসলমান আছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তোমাদের মুসলমান হওয়ার মধ্যে তিন জায়গায় ইসলামের বিপরীত। এক. তোমরা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে যিশুর উপাসনা করে থাক; দুই. তোমরা শূকরের মাংস ভক্ষণ করে থাক; তিন. হযরত ঈসা (আ)-কে তোমরা আল্লাহ্র পুত্র বলে মনে কর।

উত্তরে খৃস্টান নেতা বলল, বিনা পিতায় কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করতে পারে না, এ কারণে ঈসা (আ)-এর পিতা স্বয়ং আল্লাহ্। (নাউজুবিল্লাহ্)

আল্লাহ্র ওহী অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ হযরত আদম (আ)-কে আল্লাহ্ বিনা মাতায় বিনা পিতায় সৃষ্টি করেছিলেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করলো না, বরং জিযিয়া কর দিতে বাধ্য হয়ে মুসলমানদের আশ্রয় গ্রহণ করল।

যিমাম প্রতিনিধি দল ঃ রাসূলে আকরাম (সা) একদিন সাহাবাদের মজলিসে বসেছিলেন এমন সময় যিমাম বিন সায়ালবা সায়াদ ইবনে বাকার গোত্রের নেতা, উষ্ট্রের পৃষ্ঠে আরোহণ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র মুবারক খিদমতে উপস্থিত হল। জিজ্ঞাসা করল ঃ তোমাদের মধ্যে আবদুল্লাহ্র পুত্র কে? সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখিয়ে দিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বললেন, আমি আপনার নিকট কিছু প্রশ্ন করব। যদি কঠিন বলে মনে হয় তবে অসন্তুষ্ট হবেন না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তোমার যা ইচ্ছা হয় প্রশ্ন করতে পার। সুতরাং তিনি ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু প্রশ্ন করলেন এবং প্রশ্নের সঠিক উত্তর পেয়ে তখনই ইসলাম গ্রহণ করলেন। এবং তাঁর পূর্ণ কওম ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করল।

আবদুল কয়েস প্রতিনিধি দলের মদীনায় আগমন ঃ আবদুল কয়েস গ্রোত্রের লোকেরা বাহ্রাইনের অধিবাসী ছিল। তারা অনেক দূর-দরাজের রাস্তা অতিক্রম করে মদীনায় আগমন করেছিল এবং মসজিদে নববীতে পৌছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র মুবারক চেহারা দর্শন করেই দিলের টানে মহব্বতের সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করলেন। তাদের মধ্যে মদ্যপানের প্রতিযোগিতা চলতো। এই কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের মদ্যপান করতে কঠোরভাবে নিষেধ করলেন। তারা নিবেদন করে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমরা শীতপ্রধান এলাকায় বাস করি, যদি আমরা মদ্য পান করতে না পারি তবে আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ব। আমাদের সামান্য পরিমাণে মদ্য পান করবার হুকুম প্রদান করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, সামান্য বেশিতে পরিণত হবে এবং তোমরা ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়বে; সুতরাং কিছুতেই মদ্যপান করা যাবে না।

www.nagorikpathagar.org

বনী হুনাইফা গোত্রের প্রতিনিধি দল ঃ বনী হুনাইফা গোত্রের লোকেরাও মদীনায় এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র মুবারক হস্তে হস্ত রেখে ইসলামের বাইয়াত করলেন। এই গোত্রের মধ্যে মুসায়লামা নামক এক ব্যক্তি এই প্রতিনিধি দলের সঙ্গে মদীনায় আগমন করেছিল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট বলল, আমি ইসলাম গ্রহণ করতে পারি এই শর্তের উপরে, যদি আপনি আমাকে আপনার পরে মুসলমানদের খলীফা নিযুক্ত করে যেতে পারেন। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র হাতে কোন একটা বৃক্ষের একটি ক্ষুদ্র শাখা ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বললেন, তোমাকে এরূপ একটি ক্ষুদ্র শাখাও প্রদান করব না। এই লোকটা ইয্যতের বড় লোভী ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র ইন্তিকালের পরে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফতের সময়ে সে মিথ্যা নবুওতির দাবি করেছিল। এই কারণে তাকে মুসায়লামা কাজ্জাব বলা হত। কাজ্জাব অর্থাৎ মিথ্যাবাদী। ইয়ামামার যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করে সে পরাজিত এবং নিহত হয়েছিল।

কিনদাহ্ প্রতিনিধি দল ঃ বনী কিনদাহ প্রতিনিধি দল যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে উপস্থিত হল তাদের নেতা আশইয়াস বিন কায়েস তার হাতের মধ্যে কোন একটা দ্রব্য গোপন রেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট জিজ্ঞাসা করল, আপনি বলতে পারেন আমার হাতের মধ্যে কি ?

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, সুবহানাল্লাহ্ এটাতো গণকের কাজ, আমি তো গণক নই। আমি তো আল্লাহ্র রাসূল। আমি তো আল্লাহ্র সত্য দীনসহ আগমন করেছি। পরে রাসূলে পাক (সা) পাক কালাম থেকে কিছু তিলাওয়াত করে শুনালেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বল ইসলাম গ্রহণ করতে ইচ্ছা কর ? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমি ইসলাম গ্রহণ করব। ঐ সময়ে তার কাছে একটি রেশমী চাদর ছিল। রাসূলে পাক (সা) জিজ্ঞাসা করলেন, রেশমী চাদর সঙ্গে রেখেছ কেন ? তৎক্ষণাৎ সে তার চাদর ফেড়ে ফেলে দিল এবং পবিত্র কালেমা পড়ে ইসলাম গ্রহণ করল।

তাজিব প্রতিনিধি দল ঃ তাজিব গোত্রের তেরজন লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে উপস্থিত হলেন। তারা যাকাতের মাল সঙ্গে এনেছিলেন। রাসূলে পাক (সা) তাদের অনেক সম্মান করলেন এবং তাদের আনীত মাল ফিরিয়ে দিলেন এবং বললেন, এগুলি তোমাদের গরীব লোকদের মধ্যে বন্টন করে দিবে। তারা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! আমরা তো তাদের যা প্রাপ্য তা তাদের প্রদান করেছি। এ মাল এই স্থানের গরীব লোকদের জন্য নিয়ে এসেছি। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাদের পবিত্র মনোভাব লক্ষ্য করে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্

www.nagorikpathagar.org

(সা)! আরব গোত্রসমূহের মধ্যে এরূপ পবিত্র ও সদঅন্তকরণবিশিষ্ট লোক আর দেখি নাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হিদায়াত আল্লাহ্র হাতে। তিনি যাকে চান হিদায়াত দিয়ে থাকেন। এই সমস্ত লোক পরম ভক্তিসহকারে আল্লাহ্র কালাম শিক্ষা করলেন। যখন তারা বিদায় নেয়ার জন্য রাসূলে পাক (সা)-র খিদমতে উপস্থিত হলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের অনেক বেশি পরিমাণে হাদিয়া প্রদান করলেন। এই প্রতিনিধিদল যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট বিদায় গ্রহণের জন্য উপস্থিত হয় সেই সময় তাদের মধ্য হতে একজন বালক তাদের মাল-সামানের প্রহরার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে উপস্থিত হতে পারে নি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকেও হাদিয়া গ্রহণের জন্য আহবান করলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! আপনি সকলের প্রয়োজন পূর্ণ করে দেন। সঙ্গে সঙ্গে আমারও হক পূর্ণ করে দেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার প্রয়োজন কি ? সে বলল, আমার প্রয়োজন আপনার দোয়া, আপনি আমার জন্য দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ আমার অতীত অপরাধসমূহ মাফ করে দেন এবং আমার প্রতি তাঁর করুণা ধারা বর্ষণ করেন এবং আমার দিলকে ধনী করে দেন। এটিই আমার প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার জন্য দোয়া করলেন এবং সকলকে যা দিয়েছিলেন তাকেও তাই প্রদান করলেন।

আসল কথা রাসূলে আকরাম (সা)-র কাছে আরবের বিভিন্ন গোত্র থেকে যে সকল প্রতিনিধি দল আগমন করত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের পরম সমাদর করতেন এবং তাদের সঙ্গে মোলায়েম ভাষায় আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার করতেন। ইসলামের আদর্শ তাদের সামনে তুলে ধরতেন, যতদিন মদীনায় অবস্থান করতেন পরম সমাদরে মেহমানদারী করতেন। বিদায়ের সময় উপঢৌকন প্রদান পূর্বক বিদায় করতেন। এ জন্যই আরবের ঘরে ঘরে রাসূলে পাক (সা)-র প্রশংসা হতে লাগল। বাদশাহর বালাখানা হতে শুরু করে গরীবের কুঁড়ে ঘর পর্যন্ত তৌহিদের জ্যোতিতে উজ্জ্বল ভাস্বর হয়ে উঠলো। দিকে দিকে ইসলামের বিজয়ডঙ্কা বাজতে লাগলো। ইসলামী প্রথায় হজ্জ শুরু হল। মক্কায় হজ্জপ্রথা ও কা'বা গৃহের তাওয়াফের রীতি প্রাক ইসলামী যুগেও ছিল। কিন্তু তা ইসলামী প্রথায় নয়। নবম হিজরীতে আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মতের উপর হজ্জ ফরয করেন। এ জন্যই নবম হিজরীর শেষ ভাগে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে হজ্জের নেতা মনোনীত করে তিন শ সাহাবীসহ মক্কায় প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য, খাঁটি ইসলামী প্রথায় হজ্জ শিক্ষা দেওয়া। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর

www.nagorikpathagar.org

সাথে হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা), আবদুর রহমান বিন আওফ (রা) এবং হযরত আবূ হুরায়রা (রা) প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবীও মক্কায় গমন করেছিলেন।

ইতিমধ্যে কুরআনের 'সূরা বারাআত' অবতীর্ণ হল। এতে কা'বাগৃহে পৌত্তলিকদের প্রবেশ নিষেধ করা হয়েছিল। অতএব হজ্জ উপলক্ষে আল্লাহ্‌র এই নির্দেশ জারি করা বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এই নির্দেশ জারি করার জন্য হযরত আলী (রা)-কে মক্কায় প্রেরণ করলেন।

মক্কায় পৌছে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) মুসলমান হাজীগণকে খাঁটি ইসলামী প্রথায় হজ্জ সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন। মিনায় পৌছে হযরত আলী (রা) ভাষণ দান করলেন। এই ভাষণে আরবের মুশরিকদের উপরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র যে নির্দেশ ছিল তাই তাদের জানিয়ে দিলেন। নির্দেশগুলি নিম্নে বর্ণিত হল ঃ

১. মুসলমান ব্যতীত কেউ বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না।

২. আজ হতে কোন পৌত্তলিক কা'বা শরীফে হজ্জ করতে পারবে না। কা'বা গৃহে প্রবেশ তাদের জন্য নিষিদ্ধ হল।

৩. উলঙ্গ হয়ে কেউ কা'বা তাওয়াফ করতে পারবে না।

৪. বিধর্মীরা চার মাসের মধ্যে আপন আপন স্থানে গমন করবে। এরপরে মুসলমানদের সঙ্গে তাদের আর কোন সম্পর্ক থাকবে না।

৫. মুসলমানদের সাথে যাদের যে সন্ধি হয়েছে তাদের সাথে তা নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত কার্যকরী থাকবে।

সমবেত মুশরিক এই ঘোষণা নীরবে শ্রবণ করল। কিন্তু কোন আপত্তি বা বাধা প্রদান করবার ক্ষমতাই তাদের ছিল না। চৌদ্দ শ বছর পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে নির্দেশ জারি করেছিলেন, আল্লাহ্‌র রহমতে আজ পর্যন্ত তার কার্যকারিতা একইভাবে জারি রয়েছে। কালের আবর্তনে তা এতটুকু ম্লান বা ক্ষুণ্ন হয়নি। কোন বিধর্মী এখনও কা'বা গৃহে প্রবেশ করতে পারেনি।

বিদায় হজ্জ

কা'বা নির্মাণ কার্য শেষ হবার পর আল্লাহ্ স্বীয় খলীলকে সম্বোধন করে বললেন ঃ 'হে খলীল! তুমি লোকদের মধ্যে ঘোষণা করে দাও, যেন তারা দেশের প্রত্যেক প্রান্ত হতে পদব্রজে বা উষ্ট্রারোহণে তোমার সন্নিধানে সমবেত হয় এবং নিজের কল্যাণ করতে পারে। মুসলিম জাতির ইহ-পরকালের সকল কল্যাণ ও সকল মঙ্গলকে পূর্ণে পরিণত করবার জন্য, কুলপতি হযরত ইবরাহীম (আ)-কে দিয়ে এই ঘোষণা বাণী প্রচার করিয়েছিলেন। এতদিন পর ইবরাহীম (আ)-এর বংশের উজ্জ্বলতম রত্ন তাঁর প্রার্থনা আল্লাহ্‌র সশরীরী আশীর্বাদ হযরত মুহাম্মদ

www.nagorikpathagar.org

মুস্তফা (সা)-র কঠোর সাধনার ফলে আল্লাহ্র খলীলের সেই কা'বা শিরকের কলঙ্ক-কলুষ হতে সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করেছে। হযরত ইসমাঈল (আ)-এর আবাস ভূমি আরব উপদ্বীপ আল্লাহ্র নামের জয়ধ্বনিতে আবার মুখরিত হয়ে উঠেছে। তাই সময় বুঝে দশম হিজরীর যিলকদ মাসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হজ্জের ঘোষণা করলেন। এই ঘোষণা বাণী প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই আরব উপদ্বীপের প্রান্তে প্রান্তে আনন্দ, উৎসাহ ও উদ্দীপনার তরঙ্গ বয়ে গেল। বহু মুসলমানের পক্ষে আজও রাসূল পাক (সা)-র মুবারক চরণ দর্শনের সৌভাগ্য ঘটে ওঠে নাই। তারা যুগপৎভাবে এই মহা পুণ্যার্জনের জন্যও ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

তাই দলে দলে লোক এসে মদীনায় সমবেত হতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) দশম হিজরীর ২৮শে যিলকদ সোমবার গোসল করে হজ্জের পোশাক পরিধান করলেন। যুহরের নামায শেষ করে পবিত্র বিবিগণ ও সাহাবীগণকে সঙ্গে নিয়ে মদীনা মুনাওয়ারা হতে মক্কা মুয়াজ্জমার দিকে যাত্রা করলেন। বিশ্ব মুসলিমের জননী হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা)-র মুবারক দেহে আতর লাগিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইহরাম বেঁধে দুই রাকআত নামায আদায় করলেন। নামায শেষ করে উষ্ট্রী আল কাসওয়ার পৃষ্ঠে আরোহণ করে উচ্চ শব্দে তাকবীর পাঠ করতে করতে মক্কার দিকে যাত্রা করলেন।

প্রত্যক্ষদর্শী সাহাবী হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন ঃ আমি প্রান্তরে উপস্থিত হয়ে দেখলাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র অগ্রে ও পশ্চাতে, দক্ষিণে-বামে যতদূর নজর চলল লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েছে। ধনী-নির্ধন, ইতর, ভদ্র-দাস প্রভু নির্বিশেষে সকল মুসলমান আল্লাহ্র সেবক এবং এক আদমের সন্তানরূপে একই সাধন ক্ষেত্রের দিকে চলছে। লাব্বায়েক ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে হজ্জের কাফেলা সম্মুখপানে অগ্রসর হতে লাগল।

রাস্তার মধ্যে বহু স্থানে নামাযের জন্য থামছিলেন এবং নামায শেষ করে আবার চলছিলেন। ওয়াদি আফফান নামক স্থানে পৌছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আমি দেখছি হযরত মূসা (আ) আমাদের অগ্রে অগ্রে চলছেন ও তলবিয়া পাঠ করছেন।

সরফ নামক স্থানে পৌছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাতে গোসল করলেন এবং কিছু সময় বিশ্রাম করার পর আবার যাত্রা করলেন। যিলহজ্জের চার তারিখ রোববার প্রত্যুষে মক্কায় উপস্থিত হলেন। বনী হাশিম গোত্রের লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে শহর ছেড়ে বাইরে এসে স্বাগতম জানালেন।

মক্কাধামে আজ এক অভিনব দৃশ্য দেখা দিয়েছে। সেই উপেক্ষিত উৎপীড়িত সত্যের সেবক সোয়া লক্ষ অনুরক্ত ভক্তের অনুপম জামায়াত সঙ্গে নিয়ে আজ

www.nagorikpathagar.org

আবার কা'বার সন্নিধানে সমবেত হয়েছেন। সাফা-মারওয়া পরিক্রম এবং কা'বা প্রদক্ষিণ কালে, একই প্রকার শ্বেতবস্ত্র পরিহিত এই বিপুল জনসমুদ্র, কখনও ধীরে কখনও বা দ্রুত পদবিক্ষেপে উপত্যকা অধিত্যকা অতিক্রম করছেন, বিশাল সাগর বক্ষের উর্মিমালার মত সেই অনন্ত জনসাগরে তরঙ্গের পর তরঙ্গ খেলে যাচ্ছে। প্রত্যেক অধিরোহণ অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র বাণীর প্রতিধ্বনি করে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে রহিয়া রহিয়া লাব্বায়েক নিনাদে ধ্বনিত হয়ে উঠলো। ফলে আল্লাহ্র পবিত্র নামের ধ্বনিতে মক্কার গগন পবন পুলকিত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো। কা'বার প্রান্তরে প্রান্তরে রোমাঞ্চ জাগলো, স্বর্গের পুণ্যাশীস সহস্রধারে নেমে আসলো।

কুরাইশ পুরোহিত ও যাজক জাতি, ধর্মানুষ্ঠানেও তারা নিজেদের পৌরহিত্যগর্ব অক্ষুণ্ন রেখেছিল। এই জন্য তারা নিয়ম করেছিল যে, কুরাইশ ব্যতীত আর সকলেই নরনারী নির্বিশেষে বিবস্ত্র হয়ে কা'বার তাওয়াফ করতে হবে। তবে বিগত হজ্জের সময় এই নির্মম ও ঘৃণিত ব্যবস্থার মূলোৎপাটন করা হয়। সেই সঙ্গে তারা নিয়ম করেছিল যে, কুরাইশগণ হেরেমের অন্তর্গত মুযদালিফায় অবস্থান করবে, আর অকুরাইশ অকুলীন জনসাধারণকে যথা পূর্ব আরাফাতের ময়দানে সমবেত হতে হবে। পাণ্ডা পুরোহিত প্রপীড়িত জনসাধারণ এই ব্যবস্থা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। প্রথম দিনই রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই নির্মম ব্যবস্থার কঠোর প্রতিবাদ করেছিলেন, আল্লাহ্র নিকটে সমস্ত মানুষই সমান, তার ইবাদত-বন্দেগীতে শাস্ত্র শরীয়তে বিভিন্ন গোত্রের জন্য বিভিন্ন নিয়ম হতে পারে না। যে ঘৃণিত অহংকার ও নির্মম অসাম্যবাদের উপর এই তারতম্যের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে, ইসলাম তা সমর্থন করতে পারে না। বরং এর মূলোৎপাটন করাই ইসলামের একটি প্রধানতম সাধনা। কুলপতি ইবরাহীম (আ) এই সহানুভূতি শিক্ষা ও সাম্যের দীক্ষা দানের জন্যই ইতর-ভদ্র নির্বিশেষে আল্লাহ্র সকল বান্দাকে আরাফাতের ময়দানে সমবেত হবার জন্য আহবান করেছিলেন। এ ছাড়া হজ্জের আসল উদ্দেশ্যই যে পণ্ড হয়ে যায়। সকলকে এই কথা বুঝিয়ে দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সহযাত্রীদেরকে সঙ্গে নিয়ে আরাফাতের দিকে অগ্রসর হলেন।

এদিকে আলী (রা) ইয়ামন হতে হজ্জের কাফেলার সঙ্গে মিলিত হয়ে মক্কায় উপস্থিত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র সঙ্গে মিলিত হলেন। যিলহজ্জের অষ্টম তারিখ সমস্ত সাহাবীকে নিয়ে মিনায় অবস্থান করলেন। যিলহজ্জের নয় তারিখ শুক্রবার ফজরের নামায শেষ করে মিনা হতে আরাফাতের দিকে যাত্রা করলেন। আরাফাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক কম্বলের তাঁবুতে আশ্রয় নিলেন। যুহরের

www.nagorikpathagar.org

নামাযের পূর্বে আল কাসওয়ার পৃষ্ঠে আরোহণ করে ময়দানে উপস্থিত হলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই হজ্জে আরাফাতের ময়দানে যে ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন তা কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মুসলমানের জন্য অমূল্য নসীহত। উক্ত ভাষণ প্রত্যেক মুসলমানের অবগত হওয়া এবং তা পালন করা অবশ্য কর্তব্য। উক্ত ভাষণ নিম্নে প্রদত্ত হল।

বিদায় হজ্জের ভাষণ

করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার মহিমা কীর্তন ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পর মহানবী (সা) সকলকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন ঃ

আজ ইসলাম পূর্ণরূপে বিকশিত হয়েছে, অন্ধকার যুগের সমস্ত রোসম আমার পায়ের নিচে নিষ্পেষিত হয়ে গেছে।

১. হে লোক সকল! আমার কথাগুলি মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ কর। আমার মনে হচ্ছে, তোমাদের সঙ্গে আমার আর হজ্জে যোগদান করা সম্ভব হয়ে উঠবে না।

২. শ্রবণ কর! মূর্খতা যুগের সমস্ত কুসংস্কার, সমস্ত অন্ধবিশ্বাস এবং সকল প্রকারের অনাচার আজ আমার পদতলে দলিত-মথিত অর্থাৎ রহিত ও বাতিল হয়ে গেল।

৩. মূর্খতা যুগের শোণিত প্রতিশোধ আজ হতে তাড়িত, মূর্খতা যুগের সমস্ত কুসীদ আজ হতে রহিত। আমি সর্ব প্রথমে ঘোষণা করছি, আমার স্বগোত্রের প্রাপ্য সমস্ত সুদ ও সকল প্রকার শোণিতের দাবি আজ হতে রহিত হয়ে গেল।

৪. একজনের অপরাধের জন্য অন্যকে দন্ড দেয়া যায় না। অতপর পিতার অপরাধের জন্য পুত্রকে এবং পুত্রের অপরাধের জন্য পিতাকে দায়ী করা চলবে না।

৫. যদ্যপি কোন কর্তিত নাসা কাফ্রী ক্রীতদাসকেও তোমাদের আমীর করে দেয়া হয় এবং সে আল্লাহ্র কিতাব অনুসারে তোমাদিগকে পরিচালিত করতে থাকে, তাহলে তোমরা সর্বতোভাবে তার অনুগত হয়ে চলবে।

৬. সাবধান, ধর্ম সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করো না। এই অতিরিক্ততার ফলে তোমাদের পূর্ববর্তী বহু জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে।

৭. স্মরণ রেখো, তোমাদের সকলকেই আল্লাহ্র সন্নিধানে উপস্থিত হতে হবে, তাঁর নিকট এ সকল কথার জবাবদিহি করতে হবে। সাবধান, তোমরা যেন আমার পর ধর্মভ্রষ্ট হয়ে যেও না, কাফির হয়ে পরস্পরের রক্তপাতে লিপ্ত হয়ো না।

www.nagorikpathagar.org

৮. দেখ, আজিকার এই হজ্জের দিবস যেমন মহান, এই মাস যেমন মহিমাপূর্ণ, মক্কাধামের এই হেরেম যেমন পবিত্র, প্রত্যেক মুসলমানের ধন-সম্পদ, প্রত্যেক মুসলমানের মানসম্ভ্রম এবং প্রত্যেক মুসলমানের শোণিত বিন্দুও তোমাদের প্রতি সেরূপ পবিত্র। পূর্বোক্ত বিষয়গুলির পবিত্রতার হানি করা যেমন তোমরা প্রত্যেকেই অবশ্য পরিত্যাজ্য হারাম বলে বিশ্বাস করে থাক, কোন মুসলমানের সম্পত্তির, সম্মানের এবং তার প্রাণের ক্ষতি সাধন করাও তোমাদের প্রতি সেরূপ হারাম, সেরূপ মহাপাতক।

৯. কোন আযমীর উপরে আরবীর প্রাধান্য নেই আর কোন আরবীর উপরে আযমীর প্রাধান্য নাই আল্লাহ্‌ভীরুতা ব্যতীত। মানুষ সকলেই আদম হতে আর আদম মাটি হতে সৃজিত হয়েছেন।

১০. জেনে রেখ, এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই, আর সকল মুসলমান মিলে গড়ে উঠে এক অবিচ্ছেদ্য ভ্রাতৃ-সমাজ।

১১. হে লোক সকল! শ্রবণ কর, আমার পর আর কোন নবী নেই। আর তোমাদের পর কোন উম্মত নাই। আমি যা বলছি মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ কর! এই বছরের পর হয়ত তোমরা আর আমার সাক্ষাত পাবে না, ইল্‌ম উঠে যাওয়ার পূর্বে আমার নিকট হতে শিখে নাও।

১২. চারটি কথা, হ্যাঁ! এই চারটি কথা বিশেষ করে স্মরণ রেখ! শিরক করো না, অন্যায়ভাবে নর হত্যা করো না! পরস্ব অপহরণ করো না, ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ো না।

১৩. হে লোক সকল! শ্রবণ কর, গ্রহণ কর এবং গ্রহণ করে জীবন লাভ কর। সাবধান! কোন মানুষের উপর অত্যাচার করো না। অত্যাচার করো না। সাবধান, কারো অসম্মতিতে তার সামান্য ধনও আত্মসাৎ করো না।

১৪. আমি তোমাদের নিকট যা রেখে যাচ্ছি, দৃঢ়তার সাথে তা অবলম্বন করে থাকলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাঁর রাসূলের আদর্শ।

১৫. হে লোক সকল! শয়তান নিরাশ হয়েছে, সে আর তোমাদের দেশে কখনও পূজা পাবে না। কিন্তু সাবধান, অনেক বিষয়কে তোমরা ক্ষুদ্র বলে মনে করে থাক, অথচ শয়তান তার দ্বারা তোমাদের সর্বনাশ সাধন করে থাকে। ঐগুলি সম্পর্কে খুব সতর্ক থেকো।

১৬. অতপর হে লোক সকল! নারীদের সম্পর্কে আমি তোমাদের সতর্ক করে দিচ্ছি। ওদের প্রতি নির্মম ব্যবহার করার সময় আল্লাহ্‌র দণ্ড হতে নির্ভয় হয়ো না। নিশ্চয়ই তোমরা তাদের আল্লাহ্‌র যামিনে গ্রহণ করেছ এবং তাঁরই বাক্যে

www.nagorikpathagar.org

তাদের সাথে তোমাদের দাম্পত্যস্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নিশ্চয়ই জেনে রেখ, তোমাদের সহধর্মিণীদের উপর তোমাদের যেমন দাবিদাওয়া ও স্বত্বাধিকার আছে তোমাদের উপরও তাদের তদ্রূপ দাবিদাওয়া ও স্বত্বাধিকার আছে। পরস্পর পরস্পরকে নারীদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ করবে। স্মরণ রেখো, এই অবলাদিগের একমাত্র বল তোমরাই, এই নিঃসহায়দিগের সহায় তোমরাই।

১৭. আর তোমাদের দাস-দাসী নিঃসহায়-নিরাশ্রয় দাস-দাসী। সাবধান! এদের নির্যাতন করো না, এদের মর্মে ব্যথা দিও না। শুনে রেখ, ইসলামের আদেশ ঃ "তোমরা যা খাবে দাস-দাসীদেরকে তাই খাওয়াতে হবে। তোমরা যা পরিধান করবে তাদেরও তাই পরিধান করাতে হবে, কোন প্রকার তারতম্য করতে পারবে না।"

১৮. যে ব্যক্তি নিজের বংশের পরিবর্তে নিজেকে অন্য বংশের বলে প্রচার করে তার উপর আল্লাহ্‌র, তাঁর ফেরেশ্‌তাগণের ও সমগ্র মানব জাতির অনন্ত অভিসম্পাত।

১৯. আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র কিতাব রেখে যাচ্ছি। যাবৎ ঐ কিতাবকে অবলম্বন করে থাকবে তাবৎ তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না।

২০. যারা উপস্থিত আছ, তারা অনুপস্থিতদেরকে আমার এই পয়গাম পৌঁছিয়ে দিবে। হয়ত উপস্থিতগণের কতক লোক অপেক্ষা অনুপস্থিতগণের কতক লোক এর দ্বারা অধিকতর উপকৃত হবে।

মহানবী (সা) একটি একটি পদ উচ্চারণ করছিলেন আর তাঁর নকীবগণ বিভিন্ন কেন্দ্রে দণ্ডায়মান হয়ে অযুত কণ্ঠে তার প্রতিধ্বনি করে যাচ্ছিলেন। এরূপে বিশাল জনসমুদ্রের প্রত্যেক প্রান্তে মহানবী (সা)-র পয়গামগুলির প্রচার হয়ে গেল।

রাসূলে পাক (সা)-র মুবারক চেহারা ক্রমশই স্বর্গের পূর্ণচন্দ্রতায় জ্যোতির্ময় কণ্ঠস্বর সত্যের তেজে দৃপ্ত হয়ে উঠতে লাগলো। এই অবস্থায় তিনি ঊর্ধ্বপানে মুখ তুলে উচ্চকণ্ঠে বলতে লাগলেন ঃ "হে আল্লাহ্! আমি কি তোমার বাণী পৌঁছিয়ে দিতে পেরেছি ? আমি কি আমার কর্তব্য সম্পাদন করতে পেরেছি ?" লক্ষ কণ্ঠে প্রতিধ্বনি উঠলো ঃ 'নিশ্চয় নিশ্চয়'। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন অধিকতর উদ্দীপনাপূর্ণ স্বরে বলতে লাগলেন ঃ "হে আল্লাহ্ শ্রবণ কর, সাক্ষী থাক ঃ এরা স্বীকার করছে, আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি।"

"হে লোক সকল! আমার সম্বন্ধে তোমাদের প্রশ্ন করা হবে। তোমরা সে প্রশ্নের কি উত্তর দিবে জানতে চাই।" আরাফাতের পর্বত প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করে লক্ষ কণ্ঠে উত্তর হল ঃ 'আমরা সাক্ষ্য দিব, আপনি আল্লাহ্‌র বাণী আমাদের নিকট

www.nagorikpathagar.org

পৌঁছিয়ে দিয়েছেন, নিজের কর্তব্য সম্পূর্ণরূপে পালন করেছেন।' রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বিভোর অবস্থায় আকাশের পানে মুখ তুলে উচ্চ কণ্ঠে বলতে লাগলেন ঃ "প্রভু হে শ্রবণ কর, প্রভু হে সাক্ষী থাক, হে আমার আল্লাহ্ সাক্ষী থাক।"

এই অভিভাষণ শেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) জনতার দিকে মুখ ফিরিয়ে করুণ ও গম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন—'বিদায়'! এই জন্য এই হজ্জ বিদায় হজ্জ বলে বর্ণিত হয়ে থাকে। এই মুহূর্তে আল্লাহ্‌র বাণী নিয়ে অবতীর্ণ হলেন জিবরাঈল (আ) ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

আজ আমি তোমাদের দীন পূর্ণ করে দিলাম। পূর্ণ করলাম তোমাদের উপর আমার নিয়ামত। এবং মনোনীত করলাম ইসলামকে তোমাদের জীবন বিধানরূপে। (সূরা মায়েদাহ ঃ ৩)

মহানবী (সা) পাক কালাম যা আল্লাহ্ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন, মুহূর্তে উপস্থিত জনতাকে শুনিয়ে দিলেন। কুরআনে পাকের এই আয়াত শ্রবণ করে লোকেরা উপলব্ধি করতে পারলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলকে আর আমাদের মধ্যে রাখবেন না। কারণ যে দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন সে দায়িত্ব পূর্ণ করে দিয়েছেন, তাই রাব্বুল আলামীন তাঁকে নিজের দরবারে তুলে নিবেন।

ভাষণ শেষ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত বিলাল (রা)-কে আযান দিতে বললেন, যুহর এবং আসরের নামায এক সঙ্গে আদায় করলেন। সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে উষ্ট্রীর পৃষ্ঠে আরোহণ করলেন এবং উসামা বিন যায়েদ (রা)-কে নিজের পিছনে আরোহণ করালেন। পরে সমস্ত মুসলমানকে সঙ্গে নিয়ে মুযদালিফার দিকে যাত্রা করলেন। মুসলমানরা বিক্ষিপ্তভাবে পথ চলছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিক্ষিপ্ত জনতাকে সম্বোধন করে বলছিলেন, আসকিনাতু আইউহান্নাস আসকিনাতু আইউহান্নাস (অর্থাৎ) হে লোক সকল! শান্তির সঙ্গে চলো, শান্তির সঙ্গে চলো।

মুযদালিফায় পৌঁছে প্রথমে মাগরিবের নামায আদায় করলেন। সামান্য বিলম্ব করে ইশার নামায আদায় করলেন, নামায শেষ করে আরামের জন্য কম্বলের তাঁবুর মধ্যে গমন করলেন। রাতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠলেন না, ফজরের নামায প্রথম ওয়াক্তে শীঘ্র শীঘ্র আদায় করে মুহাসসাব উপত্যকা অতিক্রম করে যমরায় পৌঁছলেন এবং হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা)-কে বললেন, আমাকে কংকর এনে দাও। তিনি কংকর এনে দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কংকর হাতে নিয়ে নিক্ষেপ করলেন। পুনরায় মুসলমানদের সম্বোধন করে বললেন ঃ

হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহ্‌র নাফরমানি হতে দূরে থাক, তোমাদের পূর্বে বহু জাতি আল্লাহ্‌র নাফরমানির কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে।

www.nagorikpathagar.org

হে লোক সকল! হজ্জের মাস'আলা শিখে নাও, কেননা আমি জানি না তোমাদের সঙ্গে আমার পুনরায় হজ্জ করবার সুযোগ মিলবে কি না। এই দিনটা যিলহজ্জের এগার তারিখ শনিবার ছিল। এরপরে তিনি মিনার ময়দানে উপস্থিত হলেন। হযরত বিলাল (রা) উষ্ট্রীর রশি ধরে চলছিলেন এবং উসামা (রা) পিছনে বসে কাপড়ের দ্বারা মাথার উপরে ছায়া করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) জনসমুদ্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ফরায়েযে নবুওতের তেইশ বছরের মেহনতের সুফল দেখে আল্লাহ্র দরবারে শুকরিয়া আদায় করলেন। এরূপ মনে হচ্ছিল যেন যমীন হতে আকাশ পর্যন্ত সমগ্র সৃষ্টি দীন ইসলামের পূর্ণতার ঘোষণা করছে। এর পরেই রাসূলুল্লাহ্ (রা) জনতার সম্মুখে আবার ভাষণ শুরু করলেন ঃ

বছরের বার মাসের মধ্যে চার মাস অতি পবিত্র এবং সম্মানের যোগ্য। মুহাররম, রজব, যিলকদ ও যিলহজ্জ।

পুনরায় আবার বললেন ঃ তোমাদের রক্ত, তোমাদের মাল, তোমাদের ইজ্জত কিয়ামত পর্যন্ত এরূপ সম্মানিত যেমন এই দিন, এই মাস, এই শহর (মক্কা)। আমার পরে আবার গুমরাহ্ হয়ে একে অন্যকে যেন হত্যা করতে শুরু করে না দাও। তোমাদের আল্লাহ্র সম্মুখে উপস্থিত হতে হবে। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কাজ সম্বন্ধে প্রশ্ন করবেন। গুনাহগার তার গুনাহর বোঝা বহন করবে, পিতার গুনাহর কারণে পুত্রকে দণ্ডিত করা হবে না এবং পুত্রের কারণে পিতাকে দণ্ড প্রদান করা হবে না।

পুনরায় আবার বললেন ঃ যদি কোন হাবসী গোলামকে তোমাদের নেতা নির্বাচিত করা হয় সে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী তোমাদের পরিচালিত করবে তত সময় পর্যন্ত তার হুকুম মেনে চল। পুনরায় বললেন, শয়তান নিরাশ হয়ে গেছে এই দেশে আর সে পূজা পাবে না। অবশ্য তোমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুনাহর কাজ করবে, তাতেই সে খুশি হবে। আবার বললেন, শুধু আল্লাহ্র বন্দেগী কর, পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক মাস রোযা কখনও পরিত্যাগ করো না। আমার অনুসরণ তোমাদের আল্লাহ্র বেহেশতে নিয়ে পৌছাবে।

ভাষণ শেষ করে কুরবানী করার জন্য কুরবানীর স্থানে গমন করলেন। কুরবানীর জন্য একশ উষ্ট্র সঙ্গে নিয়েছিলেন। কিছু নিজে কুরবানী করলেন, বাকিগুলি হযরত আলী (রা)-র দ্বারা কুরবানী করালেন। সমস্ত গোশ্ত এবং চামড়া দান করে দিলেন। কুরবানী শেষ করে মুয়াম্মার ইবনে আবদুল্লাহ্কে ডেকে মাথা কামালেন, পরে তা আবূ তালহা আনসারী (রা) এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা) সমস্ত মুসলমানের মধ্যে বন্টন করে দিলেন।

www.nagorikpathagar.org

এর পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলেন, কা'বাগৃহ তাওয়াফ করলেন। পরে যম যম কূপের নিকটে গমন করলেন। হযরত আব্বাস (রা) বালতি পূর্ণ করে পানি উঠালেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কেবলা মুখো দাঁড়িয়ে তা তিন নিঃশ্বাসে পান করলেন।

এই স্থান হতে পুনরায় মিনায় প্রত্যাবর্তন করলেন এবং যুহরের নামায সেখানেই আদায় করলেন। যিলহজ্জের বার তারিখ পর্যন্ত মিনায় অবস্থান করলেন এবং প্রতিদিন যুহরের নামাযের পরে কংকর নিক্ষেপ করতে যেতেন এবং কংকর নিক্ষেপ করে ফিরে আসতেন।

যিলহজ্জের তের তারিখ মঙ্গলবার মিনা হতে বাতহা উপত্যকায় যাকে মুহাস্সাব উপত্যকাও বলা হয় তথায় পৌছলেন। সেখানেই রাত যাপন করলেন। প্রত্যূষে শীঘ্র শীঘ্র মক্কায় এসে পৌছলেন এবং বিদায়ী তাওয়াফ করলেন। এবার মুসলমানদের বিভিন্ন কাফেলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট হতে বিদায় নিয়ে নিজ নিজ আবাস ভূমির দিকে যাত্রা করছিল। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে ও আনসার মুহাজির সমভিব্যহারে মদীনার পথে যাত্রা করলেন। পথের মাঝে এক জায়গায় সমস্ত মুসলমানকে একত্র করে এরূপ ভাষণ দান করলেন ঃ আমার মনে হয় শীঘ্রই আল্লাহ্র ফেরেশতা আমার নিকটে এসে পৌছবেন আর আমাকে আল্লাহ্র আহবানে সাড়া দিয়ে বিদায় গ্রহণ করতে হবে। আমি তোমাদের জন্য দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, একটা আল্লাহ্র কিতাব যার মধ্যে রয়েছে পথের সন্ধান এবং উজ্জ্বল আলো, এটা শক্ত করে ধরে থেকো। দ্বিতীয় আমার আহ্লি বায়েত, আমি তোমাদের আল্লাহ্কে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। তিনি এই কথা তিন বার বললেন।

আয় আল্লাহ্, যে আমার আলীকে ভালবাসবে সে আমাকে ভালবাসার কারণে আলীকে ভালবাসবে, যে আমার আলীর সঙ্গে দুশমনি করবে সে আমার সঙ্গে দুশমনির কারণে আলীর সঙ্গে দুশমনি করবে। আয় আল্লাহ্, যে আমার আলীকে ভালবাসবে তুমি তাকে ভালবেসো, যে আমার আলীর সঙ্গে দুশমনি করবে তুমি তার সঙ্গে দুশমনি করো। এটা যিলহজ্জের ষোল তারিখ জুমার দিন ছিল।

এই স্থান হতে যাত্রা করে যুলহুলাইফা এসে পৌছলেন। রাতে সেখানেই অবস্থান করলেন, প্রত্যূষে ফজরের নামায বাদে মদীনায় প্রবেশ করলেন এবং মুবারক জবানে এই কথা বললেন ঃ আয় আল্লাহ্, সকল প্রশংসা তোমার জন্য, তুমি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। তুমি প্রত্যেক জিনিসের উপর সক্ষম, তুমি তোমার ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছ, তোমার বান্দা মুহাম্মদ (সা)-কে সাহায্য করে জয়যুক্ত করেছ, যার উপর সমগ্র আরবের লোকেরা নির্যাতন চালিয়েছিল। এই দিন যিলহজ্জের চব্বিশ তারিখ শনিবার ছিল।

www.nagorikpathagar.org

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র ইন্তিকাল

বিদায় হজ্জ হতে প্রত্যাবর্তনের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র সম্মুখে আর এক নতুন সমস্যা দেখা দিল। তবুক অভিযান হতে ফিরে আসার কিছুদিন পর হতেই সিরিয়া সীমান্তে খৃস্টানগণ পুনরায় গোলযোগ আরম্ভ করে দিয়েছিল। তথাকার খৃস্টান ও ইয়াহূদীদের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র যে সন্ধি হয়েছিল, তাও তারা ভঙ্গ করে চলেছিল। এতে সীমান্ত এলাকার মুসলমানগণ ঐ গোলযোগ এবং নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয়েছিলেন। ক্রমান্বয়ে সীমান্ত গোলযোগ সীমাতিক্রম করে যেতে থাকলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তথায় একটি বাহিনী প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। সুতরাং বিলম্ব না করে মুসলমানদেরকে অভিযানের জন্য প্রস্তুত হতে আদেশ দিলেন। অভিযানের সেনাপতি নিযুক্ত করলেন ক্রীতদাস যায়েদের পুত্র উসামা (রা)-কে। ইনি তখন বিশ বছরের যুবক মাত্র।

ক্রীতদাস পুত্র সেনাপতি নিযুক্ত হওয়ায় কিছু কিছু সাহাবী একটু কানাকানি আরম্ভ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের এই অবস্থা বুঝতে পেরে ইসলামের সাম্যনীতির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলেন। এতে সকলের মনের ভাবের পরিবর্তন হয়ে গেল। সকলেই উসামা (রা)-র নেতৃত্বে যুদ্ধ অভিযানে যেতে প্রস্তুত হতে লাগলেন।

এদিকে কিন্তু আল্লাহ্র ইচ্ছায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিদায়ের মুহূর্ত নিকটে এসে গিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে বিদায় হজ্জের পরেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) পরপারে যাত্রার আহবান পেয়েছিলেন। তিনি স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর কর্তব্য শেষ হয়ে গিয়েছে। উসামা (রা)-কে অভিযানের নির্দেশ দানের পরের দিনই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কিন্তু তবুও হযরত আবূবকর সিদ্দীক (রা), হযরত উমর (রা), হযরত উসমান (রা), হযরত আবূ উবায়দা (রা), হযরত সা'দ বিন আবি ওক্কাস (রা) প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবীকে উসামার বাহিনীতে যোগদান করবার নির্দেশ দিলেন। শুধুমাত্র হযরত আলী (রা)-কে যেতে নিষেধ করলেন। হযরত আলী (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে নিযুক্ত রইলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র পীড়া ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগল। সুতরাং আলী (রা) ও ফাতিমা (রা) সর্বক্ষণ নিকটে অবস্থান করতে লাগলেন।

১১ই রবিউল আউয়াল রোববার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র রোগ অতিশয় বৃদ্ধি পেল। ঐ দিন হযরত বিলাল (রা) আযান দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ডাকতে আসলেন। তিনি তাঁকে বললেন, বিলাল তুমি আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে

www.nagorikpathagar.org

ইমামতি করতে বল। আর তোমরা সকলে তাঁর ইমামতিতে নামায আদায় কর। মসজিদে গিয়ে বিলাল (রা) এই কথা বললেন। শুনে আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বিষাদিত হলেন এবং অন্যান্য সাহাবী ক্রন্দন করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেই আওয়াজ শুনে ফাতিমা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, ফাতিমা মুসলমানরা কি জন্য কাঁদছে ? ফাতিমা (রা) বললেন, আপনি মসজিদে উপস্থিত হতে পারেন নি বলেই তারা কাঁদছেন।

এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আলী (রা) ও ফজল বিন আব্বাস (রা)-কে ডাকলেন। তাঁরা আসলে তাঁদের কাঁধে ভর দিয়ে মসজিদে গমন করলেন এবং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ইমামতিতে নামায আদায় করলেন। নামায শেষে মুসল্লিগণকে কিছু নসিহত করলেন। নসিহত নিম্নে প্রদত্ত হল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র আখিরী ভাষণ

হে লোক সকল! আমার মনে হচ্ছে তোমরা তোমাদের নবীর মৃত্যুতে ভীত হয়ে পড়েছ। আমার পূর্বে যত নবী আগমন করেছিলেন তাঁরা কি সবাই বেঁচে আছেন ? হ্যাঁ, আমি আমার রবের সঙ্গে মিলবার আশা রাখি এবং তোমরাও আমার সঙ্গে মিলবার আশা রাখ। আর তোমাদের সঙ্গে আমার মিলনের স্থান হাউজে কাওসার। যে ব্যক্তি এই আশা করে কিয়ামতের দিন আমার হাওজের থেকে পানি পান করতে, সে যেন তার হাতের দ্বারা আল্লাহ্র নিষিদ্ধ কাজ না করে। জবানের দ্বারা আল্লাহ্র নিষিদ্ধ কথা না বলে। হে আনসাররা, আমি তোমাদের মুহাজিরদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করবার ওসীয়ত করছি। হে মুহাজিরগণ, আমি তোমাদের আনসারদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকার জন্য সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দান করছি। পুনরায় বললেন, যতক্ষণ লোকেরা আল্লাহ্র হুকুম মেনে চলবে ততক্ষণ তাদের বাদশাহ্ এবং হুকুম দাতাগণ তাদের উপরে ইনসাফ করবে। আর যখন তারা আল্লাহ্র নাফরমানি করবে তখন তারাও যুলুম করবে।

এর পর গৃহে গমন করলেন। এই রাতটি অতি কষ্টে অতিবাহিত হল। সোমবার প্রত্যূষে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র অবস্থা বেশ সুস্থ দেখা গেল। ঐ সময় হযরত আলী (রা) গৃহ হতে বাইরে এলেন। প্রতীক্ষমান জনতা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র কথা জিজ্ঞেস করলেন। তিনি জবাব দিলেন, উদ্বেগের কোন কারণ নেই। কিন্তু হযরত আব্বাস (রা) বললেন, আলী (রা)! আমি মুত্তালিবের খান্দানের ব্যক্তিদের মৃত্যুকালীন চেহারার সঙ্গে বেশ পরিচিত। চল আমরা

www.nagorikpathagar.org

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে গিয়ে আরয করি তিনি যেন আমাদের জন্য খিলাফতের ওসীয়ত করে যান।

হযরত আলী (রা) বললেন না ঃ এখন কোন আরয পেশ করা ভাল মনে করি না। যা হোক, ঐ দিন দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি সময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র অবস্থা আবারও পরিবর্তিত হলো। শারীরিক অবস্থা অবনতির দিকে চলল। তিনি আলী (রা)-কে ডেকে নিকটে বসালেন। অতপর বললেন, আলী আমার অন্তিম সময় আসন্ন। আমি অমুক ইয়াহূদীর নিকট হতে কিছু ঋণ গ্রহণ করেছিলাম তুমি তা পরিশোধ করবে। আমার পরে জগতে তোমার উপরে অনেক বিপদাপদ আসবে, তুমি ধৈর্যের মাধ্যমে তা সহ্য করে নিও।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র মুখে এই হৃদয়বিদারক বাক্য শ্রবণ করে হযরত আলী (রা) মর্মাহত হয়ে পড়লেন। তাঁর মুখে কোন বাক্য সরল না, তিনি শুধু অপলক দৃষ্টিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন।

এই সময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র দুই প্রিয়তম দৌহিত্র ইমাম হাসান ও হুসাইন (রা)-কে কাছে ডেকে নিয়ে মাথায় স্নেহাসিক্ত হাত রেখে দু'আ করলেন। দৃশ্য দেখে সমবেত জনতা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিচ্ছেদে আকুল হয়ে উঠলেন। কিন্তু তখনও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র বদনমণ্ডল প্রশান্ত প্রফুল্ল কমল সদৃশ অম্লান ও চিন্তাশূন্য মনে হচ্ছিল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র পীড়া পুনরায় বৃদ্ধি পেয়েছে জানতে পেরে সাহাবাগণ তাড়াতাড়ি যে যেখানে ছিলেন, তথা হতে ছুটে আসলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র অসুস্থতার কারণে হযরত উসামা (রা)-র সিরিয়া অভিযান বন্ধ ছিল। প্রভাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র অবস্থা ভাল জেনে বিদায় নিতে এসেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি যাত্রার উদ্যোগ নিচ্ছিলেন তখন তাঁর মাতা উম্মে আয়মন এসে সংবাদ দিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র অবস্থা আশঙ্কাজনক। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রধান প্রধান সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট উপস্থিত হলেন। সিরিয়া অভিযানের পতাকাটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র গৃহদ্বারে স্থাপন করা হলো।

হযরত ফাতিমা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র পীড়ার শুরু হতেই তাঁর কাছে অবস্থান করতেন। তিনি পিতার উদ্বেগজনক অবস্থা দেখে ছিন্নমূল লতিকার ন্যায় মুষড়ে পড়লেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র হস্তপদ শিথিল হয়ে আসছিল। হযরত ফাতিমা (রা) পিতার শয্যাপার্শ্বে লুটিয়ে পড়লেন। ফাতিমা (রা)-র অবস্থা দর্শন করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর কানে কানে কি যেন বললেন, তাতে তিনি কিছুটা আশ্বস্ত হলেন। হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র মুমূর্ষু অবস্থা দেখে পবিত্র মস্তক

www.nagorikpathagar.org

কোলে তুলে নিলেন এবং নিজ হাতে পবিত্র হস্তদ্বয় আস্তে আস্তে মর্দন করতে লাগলেন।

ধীরে ধীরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র জীবন প্রদীপ নিভু নিভু হয়ে এলো। একবার তিনি ঊর্ধ্ব পানে তাকালেন এবং মৃদু স্বরে বলতে লাগলেন, হে আমার পরম বন্ধু তোমারই সকাশে....

পর মুহূর্তেই সব শেষ হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র পবিত্র আত্মা নশ্বর দুনিয়া পরিত্যাগ করে অবিনশ্বর জান্নাতে গমন করলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র মুবারক জবানের শেষ কথা

হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা) বলেছেন, এই অসুস্থতার সময়ে কখনও কখনও মুখমণ্ডলের উপর হতে চাদর উঠিয়ে বলতেন ঃ ইয়াহূদী এবং নাসারাদিগের উপরে আল্লাহ্র অভিসম্পাত হয়েছিল এই জন্য যে, তারা তাদের নবীদের মাজারকে সিজদার স্থান বানিয়েছিল। এ কথার কারণ ছিল যাতে মুসলমানরা এরূপ না করে।

হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা) আরও বলেছেন ঃ যখন বিদায়ের মুহূর্ত নিকটবর্তী হয়ে এল তখন ঊর্ধ্ব দিকে দেখছিলেন এবং বলছিলেন

اَللّٰهُمَّ الرَّفِيْقَ الْاَعْلٰى

অর্থাৎ হে আল্লাহ্ তুমিই শ্রেষ্ঠ বন্ধু।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র লাশ দাফন

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র ইন্তিকালের সংবাদ মুহূর্ত মধ্যে সারা মদীনায়, তথা সমগ্র আরবে ছড়িয়ে পড়ল। এই সংবাদ যে শুনল সেই স্তম্ভিত ও নির্বাক হয়ে পড়ল। সকলের হৃদয়েই এই শোকাবহ সংবাদ প্রচণ্ড শেলাঘাত তুল্য হয়ে আঘাত করল। সমগ্র আরব জুড়ে এই শোকের বারতা মাতম তুলে দিল। সর্বত্রই হাহাকার জাগল। আরবের আকাশে বাতাসে ভূতলে মরুতে বেদনার ছায়া মূর্ত হয়ে উঠল। আরবের শ্রেণী-গোত্র নির্বিশেষে সমগ্র মানবকুল যেন আজ কি হারিয়ে রিক্ত ও শূন্য হয়ে পড়েছে। ধরণীর অন্তস্থল হতে যেন বেদনাবহ্নি হুহু করে উদগীরণ হতে লাগল।

শোকার্ত জনতা দৌড়ে এসে মসজিদে নববীতে সমবেত হতে লাগল। মসজিদে নববী আজ যেন শোকের সাগরে পরিণত হল। প্রতিটি মানুষ আজ

www.nagorikpathagar.org

শোকে মুহ্যমান। কে কাকে সান্ত্বনা দিবে। প্রত্যেকের বক্ষ যেন আজ শোক-বিদীর্ণ। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রিয় দুলালী হযরত ফাতিমা (রা) পিতার সান্ত্বনা-দানে সাময়িকভাবে আশ্বস্ত ও সান্ত্বনা লাভ করলেও পিতার প্রাণবায়ূ বহির্গত হবার সাথে সাথেই তাঁর যে কি করুণ অবস্থা হল, তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। পিতার অন্তর্ধানে তাঁর প্রস্ফুটিত গোলাপ সদৃশ বদন মণ্ডল সেই যে মসী-মলিন হয়ে গেল তিনি জীবনে যতদিন বেঁচেছিলেন আর তা কখনও হাস্য রেখায় উদ্ভাসিত হয়নি। যে বেদনা, যে আঘাত তিনি পেয়েছিলেন তা হতে আর কোনদিন নিজেকে মুক্ত করতে পারেন নি। এই নিদারুণ শোকের আঘাত কাটিয়ে উঠবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র ইন্তিকালের মাত্র ছয়মাস কাল পরই তিনিও জান্নাতে পিতার নিকট গমন করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র এই বিচ্ছেদ যন্ত্রণা এই অল্পকাল সহ্য করতে হবে এ খবরটিই রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফাতিমা (রা)-র কানে কানে বলে দিয়ে তাঁকে সাময়িকভাবে সান্ত্বনা দান করেছিলেন।

হযরত আলী (রা) যে শোক সাগরে নিমজ্জিত হলেন তার অন্ত নেই। পিতার স্নেহে ভ্রাতার আদর সোহাগে যার নিকট প্রতিপালিত হয়েছিলেন, যার সামান্য ইশারায় নিজের জীবন বিসর্জন দিতে একটুও দ্বিধাবোধ করতেন না সেই স্নেহছায়া আজ তিরোহিত হওয়ায়, সেই অভিভাবকের তিরোধানে তিনি আজ বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। পিতার অন্তর্ধানে যে শোক পান নাই, মাতার পরলোক গমনে বেদনা অনুভূত হয় নাই, আজ সেই শোক সেই বেদনা পুঞ্জীভূত হয়ে যেন শোকের উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি করল। সেই তরঙ্গাঘাতে হযরত আলী (রা)-র অন্তর বিদীর্ণ হয়ে হাহাকার জাগলো, জগতের সবকিছু যেন তাঁর নিকট শূন্য হয়ে গেল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র ইন্তিকালে অন্যান্য সাহাবীও অসহনীয় আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। শোকের যাতনা সহ্য করতে না পেরে হযরত বিলাল (রা) মুমূর্ষু হয়ে পড়েছিলেন। চরম অবস্থা কাটিয়ে উঠে শেষ পর্যন্ত আযান দেওয়া বন্ধ করেছিলেন। অবশেষে রাসূল শূন্য মদীনা নগরী পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। হযরত উমর (রা)-এর মত মনোবলসম্পন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিয়োগ ব্যথায় উদভ্রান্তের মত হয়ে নাঙ্গা তরবারি হাতে নিয়ে বলতে লাগলেন আল্লাহ্‌র রাসূলের মৃত্যু হয়নি, যে বলবে রাসূলে আকরাম (সা) ইন্তিকাল করেছেন তাকে এই তলোয়ার দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করে দেব।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রাণপ্রিয় দৌহিত্রদ্বয় হাসান ও হুসাইন (রা)। তাঁদের যে কি অবস্থা হয়েছিল তাও বর্ণনার অতীত। জনক-জননী হতেও যার স্নেহ ছিল

www.nagorikpathagar.org

প্রগাঢ়, যাঁর কোলে কাঁধে উঠে স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করতেন, সেই প্রাণপ্রিয় মাতামহকে হারিয়ে তাঁরা উন্মাদের মত হয়ে পড়লেন।

কিন্তু অবস্থা যাই হোক, রীতিনীতি কর্তব্য পালন করতেই হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র মুবারক দেহ গোসল করাবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। জনৈক সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র আত্মীয়-স্বজনকে গোসল করাতে বললেন। কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সা) পীড়িতাবস্থায় একদিন ইরশাদ করেছিলেন, আমার ইন্তিকালের পর আমার আত্মীয়বর্গের মধ্য হতে যেন কেউ আমাকে গোসল করায়। সেই নির্দেশ অনুযায়ী হযরত আলী (রা)-র প্রতিই গোসলের ভার অর্পণ করা হল। জীবনে যিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা প্রিয় ও ঘনিষ্ঠ আজ তাঁরই মৃতদেহ গোসল দেয়ার ভারপ্রাপ্ত হয়ে গোসল দিতে গিয়ে হযরত আলী (রা)-র বক্ষভেদ করে কান্না বের হয়ে আসছিল।

গোসল শেষ করে সুগন্ধি ও আতর দ্বারা পবিত্র দেহ সিক্ত করা হল। পরে তিনখানা কাফন দ্বারা পবিত্র দেহ আচ্ছাদিত করা হল। প্রথমে আলী (রা) আব্বাস (রা) প্রমুখ হাশিমী বংশীয়গণ তৎপর আনসার মুহাজিরগণ তারপর অন্য সকল মুসলমান পর্যায়ক্রমে জানাযার নামায পড়লেন। প্রথমে পুরুষগণ, তারপর স্ত্রীলোকেরা তৎপর বালকবালিকাগণ—এভাবে এক দলের পর অন্য দল জানাযার নামায আদায় করলেন।

পবিত্র দেহ কাফনে আচ্ছাদিত করে রেখে দেয়া হল। এই সময়ের মধ্যে অগণিত মুসলমান দূর-দূরান্ত হতে এসে তাঁদের প্রাণ প্রিয় নবীর মুবারক চেহারাখানা চিরজনমের মত একবার দেখে যেতে লাগলেন।

অতপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র মুবারক দেহ কোথায় সমাহিত করা হবে এ কথা নিয়ে কথোপকথন শুরু হয়ে গেল। জনৈক সাহাবী (রা) বললেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছিলাম নবীগণ যেখানে প্রাণত্যাগ করেন সেখানেই দাফন করতে হয়।

এ কথা প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা)-র খানকায় ইন্তিকাল করেন, সেখানেই দাফনের ব্যবস্থা করা হয়। হযরত আবূ তালহা (রা) নিজের হাতে কবর খনন করেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র ইন্তিকালের পরে সমস্যা দেখা দিল খলীফা নির্বাচন নিয়ে। আনসারগণ দাবি করেন তাদের মধ্য হতে খলীফা নির্বাচিত হবেন। মুহাজিরগণ দাবি করেন মুহাজিরদের মধ্য হতে খলীফা নির্বাচিত হবেন। এ ব্যাপার নিয়ে মদীনার গোপন মন্ত্রণাগৃহ সকিফায়ে বনী সায়েদায় সকলে একত্রিত হলেন। এ বিষয় নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক চলল। প্রথম দিকে

www.nagorikpathagar.org

আনসারগণ তাদের নেতা সা'দ বিন আবি উবাদাকে খলীফা নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা), হযরত আবূ ওবায়দা (রা) প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবী তাতে সম্মত না হয়ে কতকগুলি যুক্তি পেশ করলেন এবং মুহাজিরদের মধ্য হতে খলীফা নির্বাচনের প্রস্তাব পেশ করলেন —ার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করলেন।

এভাবে বেশ কিছু সময় তর্ক-বিতর্কের পরে সহসা উমর (রা) অগ্রসর হয়ে হযরত আবূ বকর (রা)-এর হাতে হাত রেখে তাঁর আনুগত্যের বাইয়াত করলেন। দেখাদেখি সকল তর্ক-বিতর্কের অবসান হল। একে একে মুহাজির ও আনসারগণ প্রায় সকলেই হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট বাইয়াত করলেন। এভাবে খলীফা নির্বাচনের কাজ সমাপ্ত করে বুধবার দিবাগত রাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র মুবারক দেহের দাফন ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। দাফনের পূর্ব মুহূর্তে নব নির্বাচিত খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) সকলের পক্ষ হতে মুনাজাত করেন। মুনাজাতান্তে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র পবিত্র দেহ তাঁর একান্ত আপনজন হযরত আলী (রা) ও আব্বাস (রা) প্রমুখ আত্মীয় কবরে স্থাপন করেন। এভাবে জগতের মানবকুল শ্রেষ্ঠ ভূপৃষ্ঠ হতে চির বিদায় গ্রহণ করেন এবং ভূবক্ষ তার সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রত্নকে স্বীয় বক্ষে স্থান দেয়।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দাফনের পরের দিন মসজিদে নববীতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর হাতে সাধারণ বাইয়াত সম্পন্ন হয়।

বাইয়াত সমাপনান্তে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে একটি ভাষণ দান করলেন। ইসলামী খিলাফতের এটাই ছিল সর্বপ্রথম ভাষণ।

আবূ বকর সিদ্দীক (রা) খলীফা নির্বাচিত হবার পর মসজিদে নববীতে প্রথম যে ভাষণ দেন তাতে বলেন—"আমাকে আপনাদের আমীর বানানো হয়েছে অথচ আমি আপনাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি নই। সে সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, আমি ইচ্ছা করে এ দায়িত্ব গ্রহণ করি নি, আমি এটা কখনো কামনা করিনি যে, আমাকে এ পদে নিয়োগ করা হোক। আমি না তা আল্লাহ্র কাছে চেয়েছি, না তার লোভ আমার মনে ছিল। আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ দায়িত্ব নিয়েছি শুধু এই জন্য যে, মুসলিমদের মধ্যে মতবিরোধ এবং আরব ভূ-খণ্ডে ইসলাম পরিত্যাগেব ফিৎনা শুরু হয়ে যাবার আশংকা আমি দেখেছিলাম। এ পদ আমার জন্য কোন আরামের বস্তু নয়। বরং এ এক কঠিন বোঝা যা আমার উপর চাপানো হয়েছে। আল্লাহ্র সাহায্য ছাড়া এ বোঝা বহনের শক্তি আমার নেই। আমি চাচ্ছিলাম যে, অন্য কেউ এ দায়িত্বভার গ্রহণ করুক। এখনো যদি

www.nagorikpathagar.org

আপনারা চান তো আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)-র সাহাবীদের মধ্য থেকে অন্য কাউকে এ পদের জন্য বেছে নিন। আপনারা যদি আল্লাহ্‌র রাসূলের মানদণ্ডে আমার মূল্যায়ন করেন এবং আমার নিকট তাই আশা করেন যা আল্লাহ্‌র রাসূলের নিকট [illegible]তেন তা হলে আমি তা অপারক। কারণ তিনি ছিলেন শয়তান থেকে সম্পূর্ণ মাহফুজ এবং তাঁর কাছে আসতো আল্লাহ্‌ থেকে ওহী। আমি যদি আল্লাহ্‌র হুকুম মত কাজ করি, তাহলে আপনারা আমাকে সাহায্য করবেন। আর আমি যদি ভুল করি আপনারা তা আমাকে সংশোধন করবেন। সত্যবাদিতা একটি আমানত এবং মিথ্যা খিয়ানত। আপনাদের মধ্যে যে দুর্বল আমার নিকট সে শক্তিশালী। ইনশা আল্লাহ্‌ আমি তার অধিকার সংরক্ষণ করব। আর আপনাদের মধ্যে যে শক্তিশালী সে আমার নিকট দুর্বল।

আমি তার নিকট হতে হক আদায় করে ছাড়ব। এমন কখনো হয়নি যে, কোন জাতি আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ ছেড়ে দিয়েছে আল্লাহ্‌ তাদের জন্যে লাঞ্ছনা নির্ধারিত করে দেন নি। আর এমনটিও কখনো হয় নি যে, কোন জাতির মধ্যে অশ্লীলতা অনাচার বেড়ে গেছে আল্লাহ্‌ তাদের উপর বিপদ চাপিয়ে দেন নি। আপনারা আমার আনুগত্য করুন যতদিন আমি আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করি। যদি আমি আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানি করি তা হলে আপনারা আর আমার আনুগত্য করবেন না। আমি একজন অনুসারী, নতুন পথের আবিষ্কারক নই।" হযরত আবূ বকর (রা)-এর এ ভাষণ থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় ইসলামী রাষ্ট্রের একজন খলীফা আল্লাহ্‌র দাসত্ব, রাসূলের আনুগত্য এবং মুসলিম জনতার রায়কে সঠিক স্থানে গুরুত্ব দিতেন।

এক নজরে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র মদীনার জীবন

সওর পর্বতের গুহায় কয়েকদিন অবস্থানের পর তেইশে সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার নবুওতের চৌদ্দ বছর আল্লাহ্‌র প্রিয় রাসূল কুবায় উপস্থিত হলেন। কুবা মদীনা হতে তিন মাইল দূরে একটা স্থানের নাম। সেখানে চৌদ্দ দিন অবস্থান করে ইসলামের প্রথম মসজিদে কুবা নির্মাণ করে মদীনার দিকে যাত্রা করলেন। ঐ দিন শুক্রবার ছিল। পথে বনী সালিম মহল্লায় জুমআর নামাযের সময় হয়ে গেল। সেখানেই নামায আদায় করলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) জুমআর খুৎবা প্রদান করলেন। খুৎবা এত মর্মস্পর্শী ছিল যে, যে শুনলো সে মোহিত ও বিমুগ্ধ হয়ে গেল। নামায শেষ করে আবার যাত্রা শুরু করলেন।

www.nagorikpathagar.org

মদীনায় প্রবেশ

ছাব্বিশে রবিউল আউয়াল শুক্রবার সন্ধ্যার সময় মদীনার দক্ষিণ দিক দিয়ে শহরে প্রবেশ করলেন। মদীনার পূর্ব নাম ছিল ইয়াসরিব। ঐ দিন হতে নাম হল মদীনাতুন্নবী অর্থাৎ নবীর শহর। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আবূ আইয়ুব আনসারীর গৃহে অবস্থান করতে লাগলেন। সাত মাস পরে স্থান পরিবর্তন করলেন।

হিজরতের প্রথম বছর

এই বছরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা—১. মসজিদে নববীর নির্মাণ এবং রাসূলে পাক (সা)-র বাসগৃহ নির্মাণ। ২. বিখ্যাত ইয়াহূদী আলিম হযরত আবদুল্লাহ্ বিন সালাম (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ। ৩. খৃস্টানদের নেতা আসরমা বিন আবি আনাসের ইসলাম গ্রহণ। ৪. ফরয নামাযের মধ্যে আর দুই রাকআত বৃদ্ধি করণ। মক্কার জীবনে শবে মি'রাজের রাত্রে পাঁচ ওয়াক্তের নামাযের মাত্র দুই রাকআত করে ফরয ছিল। মদীনায় হিজরতের প্রথম বছরে যুহর, আসর এবং ইশায় আর দুই রাকআত করে বৃদ্ধির হুকুম অবতীর্ণ হয় এবং আল্লাহ্ তা'আলা মাগরিবে এক রাকআত বৃদ্ধি করেন। সফরের অবস্থায় চার রাকআতের স্থলে দুই রাকআতের হুকুম রয়েছে। মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন। ৫. অমুসলিম অধিবাসীদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেন। ৬. হিজরতের প্রথম বছরেই আযান শুরু হয়। ৭. বছরের শেষের দিকে হযরত সালমান ফারসী (রা) যিনি প্রথম জীবনে অগ্নি উপাসক ছিলেন পরে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন, তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাব পাঠ করে আখিরী নবীর আগমনের বিষয় জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতীক্ষা করছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনায় হিজরত করেন, তখন তিনিও পারস্য হতে হিজরত করে মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। ৮. হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা)-র বিবাহ মক্কায় থাকতেই হয়েছিল, এই বছর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর পিত্রালয় হতে নিজের গৃহে আনয়ন করেন। ৯. এই বছর হযরত আবদুল্লাহ্ বিন যুবায়ের (রা) ভূমিষ্ঠ হন।

দ্বিতীয় হিজরীর ঘটনাসমূহ

হিজরতের দ্বিতীয় বছর রবিউল আউয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীদের সঙ্গে নিয়ে কুরাইশদেরকে আক্রমণ করতে মদীনা হতে বহির্গত হন। কিন্তু তাদের সন্ধান না পেয়ে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

www.nagorikpathagar.org

এই বছর হযরত ফাতিমা (রা)-র সহিত হযরত আলী (রা)-র বিবাহকার্য সম্পাদিত হয়। তখন হযরত আলী (রা)-র বয়স ২৮ বছর ৫ মাস, হযরত ফাতিমা (রা)-র বয়স ১৬ বছর মতান্তরে ১৮ বছর হয়েছিল।

এই বছর হিজরতের ১৭ মাস পরে বায়তুল মুকাদ্দাস অভিমুখে নামায পড়বার প্রথা রদ করে কা'বা গৃহের দিকে মুখ করে নামায পড়ার হুকুম হয়।

এই বছর রমযানের রোযা ফরয হয়। পূর্বে মুহররমের রোযা ফরয ছিল। তখন হতে মুহররমের রোযা নফল হয়। এই বছর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হয়। এই বছর সর্বপ্রথম মদীনায় ঈদুল ফিতরের নামায পঠিত হয়। এই বছর মুসলমানদের যুদ্ধ করার হুকুম দেয়া হয়। ১৭ই রমযান বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আবূ জেহেলসহ সত্তরজন কাফির নিহত হয় এবং সত্তরজন বন্দী হয়। আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব, আকিল বিন আবূ তালিবও বন্দী হন। পাপিষ্ঠ আবূ লাহাব বদর যুদ্ধের সাতদিন পরে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।

মুসলিম সৈন্যের মধ্যে ১৩ জন শহীদ হন। ৭ জন আনসার ও ৬ জন মুহাজির। এই যুদ্ধে মুসলিম সৈন্য সংখ্যা ছিল ৩১৩ জন মাত্র। তন্মধ্যে ৭৭ জন মুহাজির বাকি ২৩৬ জন ছিলেন আনসার। মুসলমানদের যুদ্ধের সরঞ্জামের মধ্যে মাত্র ৭০টি উট, ২টি অশ্ব, ৮ খানা তরবারি। কাফির সৈন্য ছিল এক হাজার, ২ শত অশ্বারোহী, ৮০খানা তরবারি, ৭ শত উষ্ট্র, অবশিষ্ট ছিল পদাতিক। এই যুদ্ধে আল্লাহ্ তা'আলা ৫ হাজার ফেরেশতা অবতীর্ণ করে তাঁর রাসূলকে সাহায্য করেন।

এই বছরে রাসূলে আকরাম (সা)-র প্রিয় কন্যা রুকাইয়া (রা) ইন্তিকাল করেন। হযরত রুকাইয়ার বিবাহ হযরত উসমান (রা)-এর সঙ্গে হয়েছিল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বদর হতে প্রত্যাবর্তনের এক সপ্তাহ্ পর বনী সালেম গোত্রের লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য বের হন। বদর প্রান্তরে পৌঁছে তিন দিন অবস্থানের পর মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। এই বছরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নির্যাতনকারিণী আসমা বিনতে মারওয়ানের মৃত্যু হয়।

এই বছর শাওয়াল মাসের মাঝামাঝি সময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনী কায়নুকা গোত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য বের হন। তাদের পাঁচদিন পর্যন্ত অবরুদ্ধ করে রাখার পর আবদুল্লাহ্ বিন উবাইর অনুরোধে তারা মুক্তি পায় কিন্তু তাদের ঘর অগ্নিতে দগ্ধীভূত করা হয়। এই বছরেই ঈদুল আযহার নামায, কুরবানী ওয়াজিব হয়।

www.nagorikpathagar.org

তৃতীয় হিজরী

হিজরী তৃতীয় সনে সুভিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আবূ সুফিয়ান বদরের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিল, যে পর্যন্ত বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণ না করব সে পর্যন্ত তেল ব্যবহার করব না ও স্ত্রীর সংস্পর্শে যাবো না। আবূ সুফিয়ান সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে দুই শ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে যাত্রা করে এবং মদীনার একজন আনসার সাহাবীকে হত্যা করে এবং কয়েকখানি গৃহ লুণ্ঠন করে ঐ সকল গৃহ অগ্নিদগ্ধ করে পালিয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই সংবাদ পেয়ে দুই শ যোদ্ধা সঙ্গে নিয়ে আবূ সুফিয়ানের নিকট হতে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বের হন। আবূ সুফিয়ান এ খবর জানতে পেরে সমস্ত মালসামান ফেলে পালিয়ে যায়। এই অভিযানকে সুভিক অভিযান বলা হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তথায় পাঁচদিন অবস্থানের পর মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

এই বছর ইসলাম এবং মুসলমানদের চরম দুশমন ইয়াহূদী নেতা কায়াব বিন আশরাফ মুসলমানদের হাতে নিহত হয়। এই বছর হযরত উসমান (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র তৃতীয় কন্যা হযরত উম্মে কুলসুম (রা)-কে বিবাহ করেন। এই বছর রাসূলে আকরাম (সা) হযরত ওমর (রা)-এর বিধবা কন্যা হযরত হাফসাকে বিবাহ করেন। এই বছরের রমযান মাসে রাসূলে আকরাম (সা) জয়নাব বিনতে খুজায়মা (রা)-কে নিকাহ করেন। হযরত জয়নাব অতিশয় দরিদ্রা রমণী ছিলেন, এই দরিদ্রতার কারণে লোকে তাঁকে উম্মুল মাসাকীনা (অর্থাৎ দরিদ্রতার মাতা) বলে সম্বোধন করত। এই কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বিবাহ করে বিশ্ব মুসলিমের জননীর পদমর্যাদায় সমাসীন করেন। কিন্তু এই ভাগ্যবতী জয়নাব (রা) বিবাহের মাত্র আট দিন মতান্তরে দুই মাস পরে ইন্তিকাল করেন। এই বছর ফাতিমা (রা)-র নয়নমণি হযরত আলী (রা)-র কলিজার টুকরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রাণপ্রিয় দৌহিত্র ইসলামের দীপ্ত ভাস্বর সাইয়িদেনা হযরত ইমাম হাসান (রা) জন্মগ্রহণ করেন।

তৃতীয় হিজরীর শওয়াল মাসের ১৪ তারিখে উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই ভীষণ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র দান্দান মুবারক শহীদ হয়। কাফিরের অস্ত্র এবং প্রস্তরের আঘাতে সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয়। সাইয়েদুশ্ শুহাদা হযরত হামজা (রা) শহীদ হন। এই বছরেই উহুদের যুদ্ধের পরে হামরাউল আসাদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

www.nagorikpathagar.org

চতুর্থ হিজরীর ঘটনাসমূহ

এই বছর রবিউল আউয়াল মাসে ইয়াহূদী বনী নাজির সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তারা ছয়দিন পর্যন্ত অবরুদ্ধ থাকার পর আত্মসমর্পণ করে। তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে আবেদন করে ঃ আমাদের ক্ষমা করলে আমরা মদীনা ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাব। তাদের পরিত্যক্ত মাল-সামান মুসলমানরা গণিমত স্বরূপ লাভ করেন।

ইয়াহূদী বনী নাজিরদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির মধ্যে ছিল তিন শ চল্লিশ খানা তরবারি, পঞ্চাশটি বর্ম, পঞ্চাশটি পতাকা। এ ছাড়াও তাদের ঘরবাড়ি, জায়গা-জমি মুসলমানদের হস্তগত হল। অতপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সমস্ত মুহাজির ও আনসার সাহাবীর একটি বৈঠকে একত্র করে আনসারগণকে বললেন ঃ দেখ আনসারগণ! তোমরা ইচ্ছা করলে ইয়াহূদীদের পরিত্যক্ত গৃহাদি ও মালামাল তোমাদের ও মুহাজিরদের সকলের মধ্যে বন্টন করে দিতে পারি। আর যদি বল মুহাজিররা এখনও তোমাদের গলার বোঝা স্বরূপ তোমাদের গৃহে অবস্থান করছে এটা তাদের জন্য ঠিক নয়। সুতরাং ইয়াহূদীদের পরিত্যক্ত মালামাল দ্বারা মুহাজিরদের জন্য বাড়িঘর নির্মাণ করে দেয়া হোক।

তোমরা যা বলবে আমি তাই করবো। নিঃসঙ্কোচে তোমরা তোমাদের অভিমত প্রকাশ কর। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রস্তাব শুনে আনসার নেতা সা'য়াদ বিন মায়াজ (রা) ও সা'য়াদ বিন ওবাদা (রা) প্রমুখ সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের ইচ্ছা এই যে, ইয়াহূদীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি মুহাজির ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হোক। এর পরে তাঁরা যেভাবে আমাদের গৃহে অবস্থান করছেন সেভাবেই অবস্থান করতে থাকুক। কারণ তাঁরা সামান্য মালামাল দ্বারা সচ্ছল হতে পারবেন না। দ্বিতীয়ত, তাঁদের অবস্থিতিতে আমাদের গৃহ পবিত্র ও বরকতে পূর্ণ হয়েছে। তাঁরা চলে গেলে আমরা এই দু'টি নিয়ামত হতে বঞ্চিত হব।

আনসারদের এই উক্তিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন। তিনি তাদের জন্য প্রাণ খুলে আল্লাহ্র দরবারে দুয়া করলেন। অতপর ইয়াহূদীদের পরিত্যক্ত মাল মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। আনসারদের মধ্যে দুইজন অতিশয় গরীব ছিলেন, তাদেরও এর অংশ প্রদান করলেন। মুহাজিরগণ হিজরতের পর এই প্রথম তাঁদের বাসগৃহ নির্মাণের সুযোগ পেলেন।

এ বছর ইমাম হুসাইন (রা) জন্মগ্রহণ করেন এবং এ বছরই মুসলমানদের জন্য মদ্যপান হারাম ঘোষিত হয়। এ বছরই যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) যিনি

www.nagorikpathagar.org

ওহীর লেখক ছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে ইবরানী ভাষা শিক্ষা করতে হুকুম দেন। তাহলে মুসলমানরা ইয়াহূদীদের ভুল ব্যাখ্যা থেকে নিরাপদে থাকবে। আসল ব্যাপার ছিল, অধিকাংশ ইয়াহূদী আলিম তাওরাত কিতাবের ভুল ব্যাখ্যা করে মুসলমানদের ভুল বুঝাতে চেষ্টা করত।

বদরে সোগরা যুদ্ধও এই বছরে সংঘটিত হয় কিন্তু কোন যুদ্ধ হয়নি, কারণ কাফিররা মুসলমানদের যুদ্ধ প্রস্তুতির খবর জানতে পেরে ভীত হয়ে পালিয়ে যায়।

এ বছর বীরে মুয়ানার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা) উপস্থিত ছিলেন না। যুদ্ধ ক্ষেত্রে সত্তরজন আনসার সাহাবী শহীদ হন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) চৌদ্দ দিন পর্যন্ত এই কাফিরকুলের জন্য অভিসম্পাত প্রদান করেছিলেন।

এ বছরে সংঘটিত এক বেদনাদায়ক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় যাকে রজিই নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। একদল কাফির রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণপূর্বক রাসূলে পাক (সা)-কে জানায়, তাদের দেশে ইসলাম প্রচারের জন্য কিছু লোক প্রেরণ করতে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের দুরভিসন্ধি জানতে না পেরে কয়েকজন সাহাবাকে তাদের সঙ্গে প্রেরণ করেন। তারা রজীই নামক স্থানে উপনীত হলে বনীহাজিন গোত্রের লোকদের সঙ্গে মিলিত হয় এবং সেই সাহাবীগণের কয়েকজনকে সেই স্থানেই হত্যা করে। আর কয়েকজনকে বন্দী করে বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণার্থে মক্কায় কুরাইশদের নিকট সমর্পণ করে। যাদের মধ্যে আসিম বিন সাবিত (রা) ও খুবায়েব (রা) ছিলেন।

পঞ্চম হিজরী

পঞ্চম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) দুমাতুল জন্দলের যুদ্ধে বের হন। কিন্তু যুদ্ধ ও রক্তপাতে বিরত থাকেন।

মুহররম মাসে জাতুর রেকায়া নামক যুদ্ধক্ষেত্রে সালাতুল খওফ নামক নামায আদায় করতে আদেশ প্রাপ্ত হন। কেউ কেউ বলেন, এই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নগ্নপদে চলেছিলেন বলে উক্ত নামকরণ করা হয়েছে। কেউ বলেন, উক্ত স্থানের মাটি লাল-সাদা বলে উক্ত নাম রাখা হয়েছে। আবার কেউ বলেন, জাতুর রেকায়া একটা বৃক্ষের নাম।

শাবানের দ্বিতীয় তারিখে বনী মুস্তালিকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে হারিসের কন্যা জুওয়ায়রিয়া বন্দিনী হন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে মুক্তি দান করত নিকাহ্ করে বিশ্বমুসলিমের মাতার মর্যাদায় সমাসীন করেন।

www.nagorikpathagar.org

এ বছর মুনাফিক আবদুল্লাহ্ বিন উবাই উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা)-র উপর জিনার অপবাদ দেয়। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন অবতীর্ণ করে উম্মুল মু'মিনীনের অপবাদ খণ্ডন করে দেন। এই বছরই রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত জয়নাব বিনতে যাহাস (রা)-কে বিবাহ করেন।

এ বছর আল্লাহ্ তা'আলা তায়াম্মুমের হুকুম অবতীর্ণ করেন। এ বছরই পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হয়। এ বছরই রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালাতুল খসুফ (চন্দ্র গ্রহণের নামায) পড়বার আদেশ প্রাপ্ত হন। এ বছরই অর্থাৎ পঞ্চম হিজরীতেই বনী কুরাইজার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তারা দুই সপ্তাহকাল অবরুদ্ধ থাকার পর আত্মসমর্পণ করে। হযরত সায়াদ বিন মায়াজ (রা)-এর বিচার অনুসারে তাদের মধ্যে অস্ত্রধারণ করার যোগ্য সমস্ত লোককে হত্যা করা হয়।

ষষ্ঠ হিজরী

ষষ্ঠ হিজরীতে মক্কার উপকণ্ঠ হুদায়বিয়া নামক স্থানে মক্কার কুরাইশ এবং মুসলমানদের মধ্যে সন্ধি চুক্তি হয়। ইতিহাসে এই সন্ধি হুদায়বিয়ার সন্ধি নামে প্রসিদ্ধ। এই বছরেই বনিল হায়ান যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) দুই শ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে বীরে মওয়ানার অন্যায় হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণপূর্বক কাফিরদের বিধ্বস্ত করে প্রত্যাবর্তন করেন। এই যুদ্ধক্ষেত্র হতেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) আপন মাতা আমিনার কবর পার্শ্বে উপস্থিত হয়ে মাতৃস্নেহ স্মরণ করে অশ্রু বর্ষণ করেন, সঙ্গে সঙ্গে সাহাবীগণও শোক প্রকাশ করেন।

এই বছর সালাতুল ইস্তিসকা বা বৃষ্টি প্রার্থনার নামায পড়ার আদেশ হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রার্থনায় এই বছর সপ্তাহকাল ধরে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। সেই বছর রাসূলুল্লাহ্ (সা) চিঠিপত্রে সীলমোহর করার জন্য একটি রৌপ্য অঙ্গুরী তৈরি করেন। যার উপরে লেখা ছিল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)।

এ বছর সূর্যগ্রহণে কুসুফ নামায পড়ার আদেশ হয়। এ বছরই হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা)-র মাতা হযরত উম্মে রুমান (রা) পরলোকগমন করেন। এই বছর আবূ হুরায়রা (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন।

সপ্তম হিজরী

এ বছর কাযা উমরা পূর্ণ করেন। এ সফরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র সঙ্গে দুই হাজার সাহাবী ছিলেন। সন্ধির শর্ত পূর্ণভাবে পালন করে উমরা আদায় পূর্বক মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

www.nagorikpathagar.org

এ বছর খায়বরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে এগারজন মুসলমান শহীদ হন। উনসত্তরজন ইয়াহূদী নিহত হয়। এই যুদ্ধেই হযরত আলী (রা)-র আসরের নামাযের সময় উত্তীর্ণ হয়ে সূর্য অস্ত গেলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র দুয়ায় পুনরায় সূর্য উদয় হয়। এই যুদ্ধেই হযরত হারুন (আ)-এর বংশোদ্ভবা রমণী হযরত সুফিয়া (রা) বন্দিনী হন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে মুক্ত করে নিকাহ্ করেন।

এ বছর গর্দভের মাংস, হিংস্র জন্তুর মাংস, যুদ্ধলব্ধ মাল বণ্টনের পূর্বে গ্রহণ করা, ক্রীতদাসীর সাথে সহবাস করা হারাম ঘোষিত হয়। এই বছরেই মুতায়া বিবাহ (অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট সময় বা কালের জন্য বিবাহ) নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

আবূ সুফিয়ানের কন্যা উম্মে হাবিবা (রা) তাঁর স্বামীসহ হাবশায় হিজরত করেছিলেন। তথায় তার স্বামীর মৃত্যু হলে বাদশা নাজ্জাশী তাঁকে মদীনায় প্রেরণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করেন। এই বছর হারিসের দুহিতা হযরত মায়মুনা (রা)-কে নিকাহ্ করেন। এই বছর খালিদ বিন ওয়ালীদ ও আমর ইবনে আস মদীনায় আগমন পূর্বক ইসলাম গ্রহণ করেন। এই বছর বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপতিদের কাছে পত্রের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত প্রেরণ করেন।

অষ্টম হিজরী

এ বছর মসজিদে নববীতে মিম্বার সংস্থাপন করা হয়। এ বছর মুতার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই বছর মক্কা বিজয় হয়। হুনায়েন যুদ্ধ ও তায়েফ যুদ্ধ এই বছরেই হয়। এ বছর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র পুত্র সাইয়েদেনা হযরত ইবরাহীম (রা) জন্মগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র কন্যা হযরত জয়নাব (রা) ইন্তিকাল করেন।

নবম হিজরী

নবম হিজরীর রজব মাসে তবুকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ বছর বাদশা নাজ্জাশী পরলোকগমন করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় থেকে গায়েবানা জানাযা পড়েন। এ বছরই আদি ইবনে হাতিম ইসলাম গ্রহণ করেন। তবুকে অবস্থান কালে এক জাননিসার সাহাবী আবদুল্লাহ্ বিন যুল বাযাদিন (রা) ইন্তিকাল করেন। এ বছরই মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ্ বিন উবাই ইবনে সুলুম দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণ করে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার কাফনের জন্য নিজের পরিধানের বস্ত্র দান করেছিলেন। এ কারণে উক্ত সম্প্রদায়ের এক হাজার লোক ইসলামে দিক্ষিত হয়। এ বছরই

www.nagorikpathagar.org

হজ্জ ফরয হয়। এ বছরই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র কন্যা হযরত উম্মে কুলসুম (রা) ইন্তিকাল করেন।

এ বছরই হামির প্রদেশের বাদশাহ ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অবগত করাবার জন্য পত্রসহ দূত প্রেরণ করেন। এ বছরই রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আলী (রা)-কে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে তবুকের যুদ্ধে গমন করেন। এ বছর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তবুক অবস্থানকালে হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা)-কে এস্কেন্দারিয়ায় খৃস্টান বাদশা দুমাতুল জন্দলের নিকট প্রেরণ করেন। হযরত খালিদ (রা) বাদশা দুমাতুল জন্দলকে বন্দী করে হুযূর পাক (সা)-র খিদমত মুবারকে উপস্থিত করেন। বাদশাহ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট আত্মসমর্পণ করে যিজিয়া দেয়ার প্রতিশ্রুতিতে মুক্তি পায়।

দশম হিজরী

এ বছর রবিউল আউয়াল মাসে বনী হারিস গোত্রের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। তারা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে। সৈন্যগণ অবিলম্বে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে। এ বছর হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ্ (রা) ও নিজ গোত্রের সমুদয় লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। এ বছর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আলী (রা)-কে ইসলাম প্রচারের জন্য ইয়ামনে প্রেরণ করেন।

এ বছরই রাসূলুল্লাহ্ (সা) জীবনের আখেরী হজ্জ সম্পন্ন করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জীবনে একবারই মাত্র হজ্জ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই হজ্জে আরাফাতের ময়দানে যে ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন তা কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মুসলমানের জন্য অমূল্য নসীহত। উক্ত ভাষণ প্রত্যেক মুসলমানের অবগত হওয়া এবং তা পালন করা অবশ্য কর্তব্য। উক্ত ভাষণ বিদায় হজ্জের অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

একাদশ হিজরী

একাদশ হিজরীর মুহররম মাসের এগার তারিখ থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) শারীরিক অসুস্থতা অনুভব করতে থাকেন। কয়েকদিন পরে আবার সুস্থতা লাভ করেন। কিন্তু এই সুস্থতা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। সফর মাসে পুনরায় অসুস্থ হলেন, জ্বর এবং মাথার যন্ত্রণা বৃদ্ধি পেল। তের-চৌদ্দ দিন অসুস্থ থাকার পর আবার সুস্থতা অনুভব করতে লাগলেন।

কিন্তু এদিকে আল্লাহ্র মর্জি আসন্ন হয়ে এসেছিল। তিনি আবার অসুস্থ হয়ে গেলেন, পীড়া ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগল। মসজিদে গমনও বন্ধ হয়ে গেল। সতের

www.nagorikpathagar.org

ওয়াক্ত নামায মসজিদে আদায় করতে পারেন নি। এই ওয়াক্তসমূহে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র হুকুমে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ইমামতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

এদিকে দিন যতই যেতে লাগল পীড়াও তত বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং জীবন প্রদীপ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসল। রবিউল আউয়াল মাসের বার তারিখ সোমবার সূর্য পশ্চিম গগনে ঢলে পড়েছে, ঠিক এই মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ্ (সা) একবার উর্ধ্বপানে তাকালেন। তারপর মৃদু স্বরে বলতে লাগলেন, হে আমার পরম বন্ধু! তোমারই সকাশে গমন করছি।

পর মুহূর্তে সবই শেষ হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র পবিত্র রূহ্ নশ্বর দুনিয়া পরিত্যাগ করত অবিনশ্বর জান্নাতে গমন করলেন।

ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র পরিত্যক্ত সম্পদ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) দুনিয়ায় কি সম্পদের মালিক ছিলেন যা মৃত্যুর পরে রেখে যেতে পারেন। যা কিছু ছিল তাও তিনি জীবদ্দশাতেই খরচের নির্দেশ দিয়েছিলেন। নবীর কোন ওয়ারিশ থাকে না, "আমি যা কিছু ত্যাগ করে যাব তা সকল মুসলমানের প্রাপ্য।"

ইন্তিকালের পূর্ব মুহূর্তে কয়েকটি দিনার (আরবের মুদ্রা) যা আয়িশা সিদ্দীকা (রা)-র নিকট রক্ষিত ছিল তা আনয়ন করিয়ে মুবারক হাতে দান করে দিলেন।

আয়িশা সিদ্দীকা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) না টাকা-পয়সা, না স্বর্ণ-রৌপ্য, না উট-বকরী ত্যাগ করে গিয়েছেন। অবশ্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির মধ্যে ছিল কিছু যমীন, বাহনের জন্য বাহনোপযোগী জন্তু, যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার উপযোগী যুদ্ধাস্ত্র।

মদীনায় একটা বাগিচা ছিল যা এক ইয়াহূদী হেবা করেছিল। তা রাসূলুল্লাহ্ (সা) জীবিত থাকতেই বন্টন করে দিয়েছিলেন। ফদক এবং খায়বরে আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে কিছু সম্পত্তি দান করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র চাচা হযরত আব্বাস (রা), হযরত ফাতিমা (রা) এবং পবিত্র বিবিগণ দাবি করেছিলেন যে, এই সম্পত্তি আমাদের মধ্যে বন্টন করে দিয়ে যান। কিন্তু হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত উমর (রা) আরও অনেক সাহাবী বললেন ঃ এই সমস্ত মুসলমানদের প্রাপ্য। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জীবদ্দশাতে এগুলি যেভাবে ব্যয় করে থাকেন, ইন্তিকালের পরেও ঠিক সেভাবেই ব্যয়িত হবে।

www.nagorikpathagar.org

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর জীবনে মদীনার সম্পত্তি হতে যা আয় হত তা দ্বারা নিজের পারিবারিক ব্যয় নির্বাহ করতেন। ফদকের আয় মুসাফিরদের জন্য ব্যয় করতেন। খায়বর থেকে যা কিছু পেতেন তা তিন ভাগ করে দুই ভাগ সাধারণ গরীব মুসলমানদের জন্য খরচ করতেন, বাকি এক ভাগ পবিত্র বিবিগণের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের খিলাফত কাল পর্যন্ত উক্ত সম্পত্তির আয় খলীফাগণের নিয়ন্ত্রণে ছিল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র বাহন ও যুদ্ধাস্ত্র

একটা ঘোড়া, একটা গাধা, একটা উষ্ট্রী হুযূর (সা) বাহনরূপে ব্যবহার করতেন। একটা খচ্চরও ছিল যা মিসরের বাদশা নজরানা স্বরূপ প্রেরণ করেছিলেন। তরবারি ছিল নয়খানা, যার মধ্যে একখানার নাম ছিল জুলফাক্কার। ঐ তরবারি খানা রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আলী (রা)-কে দান করেছিলেন। সাতটা ছিল ভেড়া, ছয়টা কামান, একটা ছিল তরকশ (তীর রাখার পাত্র), একটা কোমর বন্দ, একটা ঢাল, পাঁচটা বর্শা, একটা লোহার টুপী, তিনটা যুব্বা। এসব রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুদ্ধের ময়দানে ব্যবহার করতেন। যে কাপড় পরিহিত অবস্থায় ইন্তিকাল করেছিলেন, তা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট থাকতো। একটা রৌপ্য অঙ্গুরী, একটা আশা যা খিলাফতের বুনিয়াদে খলীফাগণের নিকটই থাকতো। প্রথমে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট তৎপরে হযরত উমর (রা)-এর নিকট থাকে। কিন্তু হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতের সময় একটা কূপ খননকালে উক্ত কূপের মধ্যে পতিত হয়, সেই কারণে এই কূপকে বলা হয় বী'রে খাতেমা। এবং আশা যাহ্ যাহ্ গেফারীর হাতে ভেঙ্গে যায়।

রাসূলে আকরাম (সা)-র নেক বিবিগণের গৃহ

রাসূলে পাক (সা)-র বিবিগণের থাকার জন্য মসজিদে নববীর সন্নিকটে খানকাহ নির্মাণ করা হয়েছিল। এই গৃহসমূহে তিনি পর্যায়ক্রমে অবস্থান করতেন। এ ছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র পৃথক কোন আবাস গৃহ ছিল না। ইন্তিকালের পরে এই সমস্ত গৃহ তাঁদের অধীনেই ছিল। উম্মুল মু'মিনীনগণের ইন্তিকালের পরে উমর ইবনে আবদুল আযীযের খিলাফত কালে হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা)-র খানকাহ যার মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দাফন করা হয়েছিল। এছাড়া সমস্ত খানকাহ ভেঙ্গে মসজিদে নববীর সঙ্গে মিলিয়ে দেয়া হয়।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নেক বিবিগণ হযরত খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ মক্কার এক ধনাঢ্য ব্যবসায়ী খুওয়াইলিদ ও তার স্ত্রী ভদ্র গোত্রীয় কন্যা ফাতিমা বিনতে

www.nagorikpathagar.org

যায়েদ বহু দিন পর্যন্ত নিঃসন্তান অবস্থায় দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করেন। একদিন তারা হাত তুলে আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করেন একটি উত্তম সন্তানের জন্য। হঠাৎ এক রাতে ফাতিমা স্বপ্নে দেখেন, শ্বেত পোশাক পরিহিত এক বৃদ্ধ তাকে বললেন, "তুমি শীঘ্রই এক কন্যা সন্তান প্রসব করবে যিনি হবেন রমণীকুলের গৌরব এবং পরিণত বয়সে তিনি স্বামীরূপে লাভ করবেন এমন এক ব্যক্তিকে যিনি হবেন মানবকুল মহামণি নবীকুল শিরমণি। ৫৫৫ খৃস্টাব্দে খুওয়াইলিদ দম্পতির ঘরে এলেন খাদীজা (রা)। পিতৃগৃহে খাদীজা শিক্ষা-দীক্ষায় পারদর্শী হলেন।

তাঁর প্রথম বিবাহ হয় মক্কার এক সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান আবূ হাওলা নাব্বাস ইবনে যিয়ারা তামামার সাথে। বিবাহের কয়েক বছর পরেই তিনি বিধবা হন। এই ঘরে খাদীজার দু'টি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। খাদীজা পিতৃগৃহে ফিরে আসেন। অল্পকাল পরেই আরবের অন্যতম সম্ভ্রান্ত পাত্র আতীক ইবনে আবিদ মাখযুমীর সাথে দ্বিতীয় বিবাহ হয়। এই ঘরে একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে তিনি পুনরায় বিধবা হন। তিনি আবার পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।

কিছুদিন পর চাচাতো ভাই সাহফী ইবনে উমাইয়ার সাথে তৃতীয় বিবাহ হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই পুনরায় বিধবা হয়ে পিতৃগৃহে ফিরে আসেন। প্রতিটি বিয়েতে তিনি স্বামীর পরিত্যক্ত বিপুল সম্পদের অধিকারিণী হলেন। তদুপরি বৃদ্ধ পিতাও বার্ধক্য জনিত অক্ষমতার জন্য তদীয় ব্যবসায় ও ধন-সম্পত্তির দেখাশুনার ভার দিলেন একমাত্র কন্যা খাদীজার উপর। খাদীজা এখন আরবের সবচেয়ে ধনবতী মহিলা। ধন-সম্পদে প্রভাব-প্রতিপত্তিতে তিনি এখন আরবের মুকুটবিহীন সম্রাজ্ঞী। পিতার মৃত্যুর পরে তৎপরিত্যক্ত বহু বিস্তৃত ব্যবসায়ের চিন্তার ভারে এবং অগাধ সম্পদের ভারে ভারাক্রান্ত খাদীজা তাঁর ব্যবসায়ের দেখাশুনা করার জন্য একজন উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক খুঁজতে লাগলেন। সমগ্র মক্কাবাসীর প্রশংসা মুখরিত সেই আল আমীনের সুনাম সুখ্যাতি ধনবতী খাদীজার কর্ণেও পৌছেছে। তিনি তাঁকে ডেকে পাঠালেন এবং কথাবার্তার মধ্যস্থতায় পিতৃব্য আবূ তালিবের সমর্থন ক্রমে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিবি খাদীজার ব্যবসায়ের জন্য সিরিয়া গমন করলেন এবং বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন। বিবাহের পরে শুধু ধনসম্পদ ও ব্যবসা বাণিজ্যই নয় নিজের সমগ্র দেহমন স্বামীর চরণতলে উৎসর্গ করে উম্মুল মু'মিনীন সম্পূর্ণরূপে ভারমুক্ত হলেন এবং তাঁকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছাবার জন্য তিনি যে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন দুনিয়ার ইতিহাসে তার নযীর মেলা ভার।

www.nagorikpathagar.org

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে বিবাহের পর তাদের মধুময় দাম্পত্য জীবন দিনের পর দিন আরো মধুর হয়ে উঠতে লাগলো। জীবনের বিভিন্ন দিক দিয়ে মানবিক, নৈতিক, পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্বভারে বিশেষ করে ইসলামী বুনিয়াদের ভিত্তি স্থাপনের প্রাথমিক পর্যায়ে দুটি জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেম-প্রীতি, সহানুভূতি ও সহযোগিতা পারস্পরিক ভিত্তিতে সুদৃঢ় ইস্পাতসম প্রগাঢ় প্রণয় ডোরে একীভূত হয়ে গেল। পিতৃদর্শন বঞ্চিত, মাতৃস্নেহ অজ্ঞাত, ভগিনীর প্রীতি ও স্নেহ বঞ্চিত মুহাম্মদ (সা)-র জীবনে মায়া-মমতার স্নেহ-দরদের যে অতৃপ্ত সাধ-বাসনা এতদিন অনাস্বাদিত ছিল, বয়োজ্যেষ্ঠ খাদীজার সাথে পবিত্র পরিণয়ের পর আজ তা জীবনের সর্বস্তরে পূর্ণতার চরম আস্বাদনে ঝর্ণা ধারার মত সমগ্র দেহমনে উৎসারিত হতে লাগলো। উম্মুল মু'মিনীন শুধু তাঁর দেহমনই নয় তাঁর অগাধ বিষয় বৈভব, আল্লাহ্র রাসূলের সন্তুষ্টি ও তাঁর জীবনের মহান ব্রতকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। নিজের জীবনের আরামকে হারাম করে দিয়েছিলেন স্বামীর সেবাযত্নে ও সন্তুষ্টি বিধানের জন্য। এক কথায় তাঁর সমগ্র সত্তাকেই তিনি পূর্ণ মাত্রায় বিলিয়ে দিয়েছিলেন স্বামীর ব্যক্তিত্বের গভীরে, যেখানে ছিল না কোন কৃত্রিমতা, কোন লৌকিকতা বা শূন্যতার কোন অবকাশ। আদর্শ স্বামীর সেবাযত্নে তিনি ছিলেন আদর্শ রমণী, আদর্শ সংগ্রামী কর্মীর কর্ম প্রেরণা যোগাতে তিনি ছিলেন আদর্শ সহধর্মিণী। মহানবীর ধর্ম-কর্মে তিনি ছিলেন আদর্শ সহযোগী ও সহধর্মিণী। দুঃখ বিপদে, ঝড়-ঝঞ্ঝায় প্রতিকূল অবস্থার মুকাবিলায়, ভগ্নমন হতাশায় দুর্গম পথযাত্রীর তিনি ছিলেন ভীতি বিনাশিনী, উৎসাহদায়িনী, সহচরী সহগামিনী। দুনিয়ার দাম্পত্য জীবনের ইতিহাসে আদি মানব আদম (আ) ও মা হাওয়া (আ) থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যত মানব-মানবীর দাম্পত্য মিলন ঘটেছে তার মধ্যে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও হযরত খাদীজা (রা)-র মিলনের মত এমনি সুদৃঢ় প্রণয় ভিত্তিক দাম্পত্য মিলন আর কোথাও ঘটেনি।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা)-কে কথা প্রসঙ্গে একদিন বললেন, "যখন দুনিয়ার সকল মানুষ আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল আমার সেই ভীষণ বিপদের দিনে একমাত্র খাদীজাই আমার পার্শ্বে ছিলেন এবং খাদীজাই আমাকে সর্বপ্রথম নবী বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, "রাব্বুল আলামীন এখনো আমাকে খাদীজার চাইতে উত্তম স্ত্রী দান করেননি।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, "খাদীজার তুলনা শুধু খাদীজাতেই সম্ভব অর্থাৎ খাদীজার কোন তুলনাই নেই।"

www.nagorikpathagar.org

হযরত খাদীজা (রা)-র মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য

হযরত খাদীজা (রা) এমন এক সময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র জীবন সঙ্গিনী ছিলেন যখন তিনি দারিদ্রের তাড়নায় জর্জরিত, বিপদগ্রস্ত, চিন্তাক্লিষ্ট, শত্রুকূল পরিবেষ্টিত এবং আশা-নৈরাশ্যের চরম সন্ধিক্ষণে মহাসাধনার পথে যাত্রার প্রস্তুতি নিতে ব্যস্ত এবং ভীত-সন্ত্রস্ত আর অন্য বিবিগণ যখন তাঁর ঘরে এলেন তখন তাঁর যাত্রাপথ কমবেশি একরূপ নিষ্কণ্টক এবং কুসুমাস্তীর্ণ—চারদিকেই যখন বিজয়ের দুন্দুভি— অগ্রগতির জয়-জয়কার।

কুল মাখলুকাতের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি খায়রুল বাশার মহানবী (সা)-র প্রথম পত্নীর পদপ্রাপ্তির গৌরবে গৌরবান্বিতা এবং পরম ভাগ্যবতী, তাছাড়া সর্বপ্রথম মুসলমান হওয়ার সৌভাগ্যের অধিকারিণী। তাঁর জীবদ্দশাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আর বিবাহ করেন নি।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা (রা)

পিতার নাম যামরা ইবনে কায়েস ইবনে আবদুশ শামস্। মাতার নাম সামুসা বিনতে কায়েস। ইনি আরবের বিখ্যাত সম্ভ্রান্ত কুরাইশ গোত্রের কন্যা। হযরত সাওদার প্রথম বিয়ে হয় চাচাতো ভাই সাকরান ইবনে আমর ইবনে আবদুশ শামসের সঙ্গে। আত্মীয়-স্বজনদের ঘোরতর বিরোধিতা সত্ত্বেও স্বামী-স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু আত্মীয়-স্বজনদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নির্দেশক্রমে হাবশায় হিজরত করেন। সেখানে তাঁদের একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। অল্পদিন পরই সাকরান ইন্তিকাল করেন, মতান্তরে তারা মক্কায় ফিরে আসেন এবং সাকরান মক্কাতেই ইন্তিকাল করেন। মুসলমান হওয়ার কারণে হযরত সাওদা আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক পরিত্যক্তা হন। এ কারণে হযরত সাওদা দুঃখের ডালি মাথায় নিয়ে য়াতিম শিশুপুত্রসহ অত্যন্ত করুণ এবং অসহায় অবস্থায় দিন কাটাতে থাকেন। এদিকে হযরত খাদীজা (রা)-র ইন্তিকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র সংসারের অবস্থাও অত্যন্ত করুণ দুরবস্থায় পতিত হয়। মাতৃহারা দু'টি কিশোরী কন্যা—হযরত উম্মে কুলসুম ও হযরত ফাতিমা (রা)-র লালন-পালন ও সাংসারিক কাজকর্মে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজেকে অত্যন্ত অসহায় ও বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। এ ছাড়াও রিসালাতের কঠোর দায়িত্ব পালন তো করতেই হচ্ছে। খাওলা নাম্নী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র দূর সম্পর্কীয়া এক খালার গৃহের কাছেই ছিল হযরত সাওদা (রা)-র বাসগৃহ। সাওদার দুঃখকষ্টে বিগলিত নারীপ্রাণ খাওলা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং সাওদা (রা) উভয়ের দুরবস্থার কথা চিন্তা করে একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে প্রস্তাব দিলেন সাওদাকে বিয়ে করে ঘরে

www.nagorikpathagar.org

আনার জন্য। রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাযী হলেন এবং সাওদার পিতা অমুসলমান হলেও কন্যার দুরবস্থার কথা চিন্তা করে এ বিয়েতে খুশি মনে রায় দিলেন। নবুওতের দশম সালের রমযান মাসে মতান্তরে শাওয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে হযরত সাওদা (রা)-র শাদী মুবারক সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের সময় সাওদার বয়স হয়েছিল ৫৮ মতান্তরে ৬০ বছর। বিয়ের পরই ভাগ্যবতী উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র গৃহে এলেন এবং সংসারের যাবতীয় কাজকর্মের ভার নিজের হাতে তুলে নিলেন। তিনি শুধু পরিশ্রমেই অভ্যস্ত ছিলেন না—সাংসারিক কাজেও অতিশয় সুনিপুণা ছিলেন। নিরলস শ্রমসাধ্যে ও কর্মপটুতায় অল্প দিনের মধ্যেই তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র গৃহে পারিপাট্য ফিরিয়ে আনলেন। নিজের আরাম-আয়েশের দিকে বিন্দুমাত্র লক্ষ্য না করে মহান স্বামীর সংসার পরিচালনায় তথা কিশোরী কন্যাদ্বয়ের প্রতি মাতৃবৎ স্নেহ-আদর-যত্নে কর্মবীর স্বামীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের নিশ্চয়তা বিধানে হযরত সাওদা (রা) অল্প দিনের মধ্যেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র আস্থা অর্জন করলেন। পবিত্র ইসলামের মুক্তির পয়গাম মানুষের দ্বারে পৌঁছে দেয়ার গুরু দায়িত্ব আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে অর্পণ করা হয়েছে বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র উপর। অপরদিকে ইসলামের দুশমন দুর্ধর্ষ কাফির মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র, প্রকাশ্য শক্তি প্রয়োগ, অল্প সংখ্যক মুসলমানের উপর অমানুষিক যুলুম-অত্যাচারের মুকাবিলার দায়িত্বও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র উপর অর্পিত। এমতাবস্থায় তাঁর নিজের সংসার, সন্তানদের প্রতিপালন ও তত্ত্বাবধানের জন্য মনোযোগ দেয়ার সময় কোথায় ? তাই রাব্বুল আলামীন এ শাদীর দ্বারা তার প্রিয় রাসূলকে সাংসারিক ঝামেলা মুক্ত করলেন এবং নিশ্চিন্ত মনে দীনের কাজ করবার সুযোগ করে দিলেন। দুঃখ-বেদনা, অভাব-অনটন, উপেক্ষা ও অনাদরে গড়া ছিল হযরত সাওদার মমতাময়ী জীবন। একারণে গরীব-দুঃখী ও অভাবগ্রস্তদের জন্য তাঁর হৃদয় ভাণ্ডার ছিল সর্বদা উন্মুক্ত। তাঁর অতিথিপরায়ণতা ও গরীব-মিসকিনকে দান-খয়রাত অভাবীর অভাব মোচনের মত বিশেষ গুণ বিশেষ করে হযরত খাদীজা (রা)-র কন্যাদ্বয়ের প্রতি অন্তরঝরা মাতৃস্নেহ দর্শনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র মন আনন্দে ভরে উঠত এবং খাদীজার সাজানো এবং আরব্ধ সংসারে শৃঙখলা এবং পারিপাট্য ফিরিয়ে আনতে পারার জন্য আল্লাহ্ পাকের দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করতেন। আল্লাহ্ প্রেমের গভীরতা ও চিন্তার প্রখরতায় এই মহীয়সী মহিলা ছিলেন অত্যন্ত উদার এবং সরল প্রকৃতির। আল্লাহ্র রাসূলের সাহচর্য এবং সন্তুষ্টি কামনাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও আয়িশা সিদ্দীকা (রা) তাঁকে নিয়ে মাঝে মাঝে আনন্দ উপভোগ করতেন। তাঁর অন্তকরণ ছিল সম্পূর্ণরূপে হিংসা, বিদ্বেষ ও ঈর্ষা মুক্ত। হযরত আয়িশা

www.nagorikpathagar.org

সিদ্দীকা (রা) বলেছেন, আমি কোন নারীকেই তাঁর মত সম্পূর্ণ হিংসা-বিদ্বেষ মুক্ত দেখি নাই। তাঁর সম্বন্ধে আমার অন্তরের কামনা, যদি আমার আত্মা তাঁর ভিতরে স্থান পেত!

শুধু যৌন কামনা চরিতার্থ করণই দাম্পত্য জীবনের সবকিছু নয়। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দাম্পত্য সম্পর্কের সংযোগে শারীরিক ও মানসিক উন্নতি সাধিত হয়, বিকশিত জীবনের গন্ধ মাধুর্যে দেহ-মন পুলকিত হয়, নির্মল নিষ্পাপ ভালবাসায় পারস্পরিক প্রীতির বন্ধনে স্বর্গীয় সুষমা-সমৃদ্ধিতে মাটির মানুষের মন ভরে ওঠে, পূত-পবিত্র বন্যা ধারায়। হযরত সাওদা (রা)-র যৌন কামনার তাকিদ না থাকলেও মানবকুল শিরমণি মহানবী (সা)-র সোহবতে ও সাহচর্যে নৈতিক-আধ্যাত্মিক জীবনের বহুবিধ শিক্ষা প্রশিক্ষণ হতে তিনি স্বেচ্ছায় বঞ্চিত হয়ে রইলেন ধীশক্তিসম্পন্ন কিশোরী স্বপত্নী হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা)-কে অধিকতর জ্ঞান আহরণের সুযোগ দানের জন্য। হযরত সাওদা (রা)-র এ ত্যাগ শুধু আয়িশারই কল্যাণ হয় নাই। বিশ্ব মুসলমান তথা সমগ্র মানব জাতি বিশেষ করে বিশ্বের নারী সমাজ সমধিক কল্যাণ প্রাপ্ত হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ প্রাপ্ত হতে থাকবে, হযরত সাওদা (রা)-র এই অভূতপূর্ব নজীরবিহীন ত্যাগ সাধনার মাধ্যমে।

বার্ধক্য জনিত অবস্থায় পুরুষের প্রয়োজন হয়ত তাঁর ছিল না, কিন্তু আল্লাহ্র রাসূলের নেক সোহবতের ফায়েজে আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রয়োজন অবশ্যই ছিল। তা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র সন্তুষ্টি ও কনিষ্ঠা ভগ্নীসম-স্বপত্নী আয়িশা (রা)-র স্নেহ ও প্রীতির খাতিরে দাম্পত্য জীবনের স্বীয় 'পালা'সমূহ তিনি হাসিমুখে স্বেচ্ছায় হযরত আয়িশা (রা)-র অনুকূলে উপহার দিলেন। দুনিয়ার ইতিহাসে এ ধরনের ত্যাগ ও উদার চিত্ততার প্রমাণ আরো আছে কিনা, তা জানা যায় না। জ্যেষ্ঠা ভগ্নীসম-স্বপত্নী হযরত সাওদা (রা) এবং কনিষ্ঠা তন্বীসম স্বপত্নী হযরত আয়িশা (রা) অনেক সময় আদর করে একে অন্যের মুখে খাবার তুলে দিতেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) এদৃশ্য দেখে আনন্দ অনুভব করতেন। একাধিক পত্নী যুক্ত দাম্পত্য জীবনে এমনি ভাবের দৃশ্য সত্যই উপভোগের এবং আনন্দের বিষয়। বিশ্ব মানবের জন্য একটি আদর্শ শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত।

বহু প্রামাণ্য গ্রন্থে পাওয়া যায় স্বামীর প্রতি চরম আনুগত্য ও তাঁর আদেশ-নিষেধ পালনে যে কঠোরতা ও ক্ষিপ্রতার পরিচয় তিনি দিয়েছেন অন্য যেকোন উম্মুল মু'মিনীনের পক্ষে তা অনুকরণযোগ্য ছিল। পর্দার আদেশ প্রাপ্তির পর এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র ইন্তিকালের পর হযরত সাওদা (রা) হজ্জব্রতও পালন করেন নি। জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলতেন যে, তার হজ্জ ও ওমরা বহু পূর্বেই আদায়

www.nagorikpathagar.org

করা হয়ে গেছে। এখন নফল হজ্জ পালন করার জন্য তিনি তাঁর মহান স্বামীর আদেশ লঙ্ঘন করতে পারেন না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র ইন্তিকালের ২৩ বছর পরে হযরত সাওদা (রা) ৮১ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র সঙ্গে বিয়ের সময় হযরত সাওদা (রা)-র বয়স ছিল ৫৮ বছর মতান্তরে ৬০ বছর আর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র বয়স হয়েছিল ৫০ বছর।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা)

পিতা মক্কার সুপ্রসিদ্ধ কুরাইশ বংশের তাইমিয়া খান্দানের বিশিষ্ট নেতা ধনাঢ্য ব্যবসায়ী আবূ বকর ইবনে আবূ কুহাফা (রা)। মাতা কেনানীয়া বংশের আদর্শ রমণী উম্মে রুমান বিনতে আমের ইবনে উমাইমা। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুওতের পঞ্চম সালের শেষার্ধে এবং হিজরতের নয় বছর পূর্বে শাওয়াল মাসে মুতাবিক ৬১৪ খৃস্টাব্দের জুলাই মাসে হযরত আয়িশা (রা)-র জন্ম। জন্মের ছয় বছর পরে নবুওতের দশম সালে, হিজরতের প্রায় তিন বছর পূর্বে ২৫ শে শাওয়াল মুতাবিক ৬২০ খৃস্টাব্দের মে মাসে পিতার ঐকান্তিক আগ্রহে এবং আত্মীয়-স্বজনদের অনুরোধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে হযরত আয়িশা (রা)-র শুভ শাদী মুবারক সুসম্পন্ন হয়। হিজরী প্রথম সালে শাওয়াল মাসে নয় বছর বয়সে স্বামী গৃহে পদার্পণ করেন এবং হিজরী ১১ সালের রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র ইন্তিকালে মাত্র আঠার বছর বয়সে বৈধব্য জীবনে উপনীতা হন। হিজরী ৫৮ সালে ১৭ রমযান মুতাবিক ৬৭৮ খৃস্টাব্দের ১৩ই জুন বেতের নামাযের পরে তিনি ইন্তিকাল করেন।

আরবের কতিপয় দীর্ঘস্থায়ী কুসংস্কার এ বিয়ের ফলে রহিত হয়ে যায়। যথা মুখবোলা ভ্রাতার মেয়ে বিবাহ করার প্রথা চালু হয়। [হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র মুখবোলা ভ্রাতা] তৎকালীন আরবদেশে শাওয়াল মাসকে অশুভ মাস বলে গণ্য করা হত এবং এ বিয়েতে সে কুসংস্কারের মূল উৎপাটিত হয়। হযরত আয়িশা (রা) নিজেই অনেক সময় বলতেন, "আমার বিবাহ এবং স্বামীগৃহে যাত্রা শাওয়াল মাসেই হয়েছে এবং আমার চেয়ে সৌভাগ্যশালিনী নারী জাতির মধ্যে আর কয়জন আছে ?" হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তখনকার কুরাইশদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিদ্বান ব্যক্তি এবং একজন খ্যাতনামা কবিও ছিলেন। বিদ্যা শিক্ষা এং কবিতা রচনায় পারদর্শিতা বংশগত অধিকার হিসাবে এই অসামান্যা ধীশক্তি সম্পন্না বিদুষী কন্যা হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা) লাভ করেছিলেন তাঁর পিতার কাছ থেকেই। তদুপরি এই বালিকা

www.nagorikpathagar.org

স্ত্রীকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর নিজের আদর্শে ইসলামী আখলাকে মনের মত গড়ে তোলার সম্পূর্ণ সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁদের বিবাহিত জীবনের শুরু থেকেই এবং এ কারণেই কোমল মতি হযতর আয়িশা (রা)-র মনের মধ্যে অন্য কোন বাতিল মতাদর্শ প্রবেশ করবার পূর্বেই ইসলামী আদর্শের সুদৃঢ় বুনিয়াদ স্থাপিত হয়েছিল যার সুফল আজ সমগ্র মুসলিম মিল্লাত উপভোগ করছে এক অনায়াস লব্ধ ওয়ারেসী সম্পত্তির মত। হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে কোন বিতর্কের সমাধানে হযরত আয়িশা (রা)-র হাদীসসমূহ নির্ভেজাল এ কথা সর্বজন স্বীকৃত। উম্মুল মুমিনীন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট শুধু আশ্রয়হীনের ভরসা বা দাম্পত্য সম্পর্কই প্রাপ্ত হন নি, তাঁরা ছিলেন প্রত্যেকেই মহানবী (সা)-র আদর্শে অনুপ্রাণিতা, আধ্যাত্মিক ফায়েজ প্রাপ্তা মহিলা শিষ্য এবং এই মহিলা মহাবিদ্যালয়ের সব চাইতে কৃতী ছাত্রী ছিলেন সবচেয়ে বয়োকনিষ্ঠা হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা)। ইবনে জাওযীর তানকীহ কিতাবের বরাতে 'নবী সহধর্মিণী' গ্রন্থে পাওয়া যায় যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নয়জন স্ত্রীর নিকট থেকে হাদীস সংকলন করা হয়েছে এবং তাঁদের বর্ণিত হাদীসের মোট সংখ্যা ২৮২৩। (আবার কোথাও ২৮৩২-এর উল্লেখও পাওয়া যায়)। 'উম্মাহাতুল মুমিনীন' গ্রন্থে পাওয়া যায়, হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা)-র বর্ণিত হাদীসের সংখ্যাই ২২১০। ইসলামী জীবন বিধানের বাস্তবায়নে হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ একান্ত অপরিহার্য। এই একান্ত অপরিহার্য অমূল্য সম্পদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ আমরা পাচ্ছি হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা)-র নিকট থেকে। হযরত আয়িশা (রা)-র বর্ণিত হাদীসসমূহ বাদে অন্য আটজন উম্মুল মু'মিনীনের বর্ণিত হাদীসের সমষ্টিগত সংখ্যা হল মাত্র ৬১৩ মতান্তরে ৬২২। 'উম্মাহাতুল মু'মিনীন' গ্রন্থ থেকে এখানে কিছুটা প্রাসঙ্গিক রেফারেন্স পেশ করা হল। হাদীস শাস্ত্রে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা)-র শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মর্যাদা শুধু অধিক হাদীস রিওয়ায়েতের জন্য নয়। বস্তুত অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে সুচারুরূপে ও বিজ্ঞজনোচিতভাবে হাদীসের প্রকৃত উদ্দেশ্য বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে তাঁর অপূর্ব ক্ষমতা, দক্ষতা ও অনন্য সাধারণ প্রতিভা ছিল। অধিক সংখ্যক হাদীস রিওয়ায়েতকারী সাহাবীর মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) ও হযরত আয়িশা (রা) ব্যতীত অন্য সকলে রিওয়ায়েতই করেছেন, হাদীসের ব্যাখ্যা করেন নি। কোন্ হাদীসের কি তাৎপর্য, কোন্ হাদীসটি বাস্তব জীবনে কিভাবে প্রযোজ্য, কোন্ হাদীস বা কুরআনের কোন্ আয়াত দ্বারা কি কি মাসয়ালা উদ্ভাবন করা যেতে পারে তারা কেউ এসব বিষয়ের রহস্য ভেদ করেন নি। কিন্তু উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা)-র এসব বিষয়েও পূর্ণ

www.nagorikpathagar.org

দখল ছিল। এই দু'জনই ইলমে ফিকাহ (ব্যবহার শাস্ত্র), ইলমে উসুল (নীতি শাস্ত্র) ও ইলমে কালাম (তর্কশাস্ত্র)-এর পথপ্রদর্শক। অতি সহজে হাদীস শরীফ বোঝার ব্যাপারে হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা) সকলের অগ্রণী ছিলেন। মোট কথা প্রাঞ্জলভাবে হাদীসের কার্যকারণ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই হযরত আয়িশা (রা)-র রিওয়ায়েতের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই তিনি বিশ্ববিখ্যাত হয়ে আছেন। এতদ্ব্যতীত হযরত আয়িশা (রা)-র রিওয়ায়েতের ভাষা অন্যান্য সাহাবীর তুলনায় অত্যন্ত সহজ এবং সরল।

এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, শুধু আল্লাহ্‌র রাসূলের সহধর্মিণী নয় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাহাবী, সহকারী, ছাত্রী ও কর্মী হিসেবে ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে হযরত আয়িশা (রা)-র অবদান কতখানি সৃষ্টিশীল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে তাঁর শুভ পরিণয়ে মুসলিম জাতি তথা সমগ্র মানব জাতি বিশেষ করে নারী সমাজ কতখানি উপকৃত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র স্ত্রীগণের মধ্যে একমাত্র হযরত আয়িশা (রা) ব্যতীত সবাই ছিলেন বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া, বিগত যৌবনা, বিধবা অথবা তালাকপ্রাপ্তা মহিলা। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র মহব্বত বা সাহচর্য লাভ করার সৌভাগ্য হয়েছে তাদের এমনি সময় যখন তাদের হৃদয় রাজ্যে বিপদসঙ্কুল পৃথিবীর নির্মম ঝড়ঝঞ্ঝা, ক্ষুব্ধ-বিক্ষুব্ধ, পরিবেশের সৃষ্টি করেছে—তাদের অন্তরের কোমলতা যখন বাহ্যিক কাঠিন্যের আবরণে ঢাকা পড়েছে—কোন সৃষ্টিশীল অবদান অথবা নৈতিক বা আধ্যাত্মিক উন্নয়নের ব্যাপারে ধ্যান গবেষণা কিংবা চিন্তা-ভাবনা করার অবকাশ তাঁদের ছিল না। কিন্তু হযরত আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র গৃহে এলেন চৈতালী সন্ধ্যায় পাতা-ঝরানোর মর্মরিত গুঞ্জনের বহু আগে। ফাল্গুনের প্রথম প্রভাতের আগমনী অঙ্কুরোদগমেরও প্রাক্কালে আবাল্য সঙ্গিণী, শিক্ষার্থিণী, সহধর্মিণী ও সহকর্মিণীরূপে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র ভার্যাদিগের মধ্যে শুধু শিক্ষা-দীক্ষা বা হাদীসের রাবী হওয়াটাই হযরত আয়িশা (রা)-র শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক নয়। তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞাও ছিল অসাধারণ। আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর (রা) এমনকি ইসলামের শত্রুরা পর্যন্ত মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন। হযরত উমর (রা) শাসন কার্যে হযরত আয়িশা (রা)-র পরামর্শ গ্রহণ করতেন। হযরত উসমান (রা), হযরত আলী (রা) এবং কোন কোন গভর্নরও তার পরামর্শ গ্রহণ করে শাসন কার্য পরিচালনায় কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের দমন করার ব্যাপারে হযরত আয়িশা (রা)-র পরামর্শ গ্রহণ না করার ফলেই হযরত উসমান (রা)-কে ঐ সকল বিদ্রোহীর হাতে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হতে হয়।

www.nagorikpathagar.org

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র ইন্তিকালের পরে এই আয়িশা সিদ্দীকা (রা)-ই তার পিতা হযরত আবূ বকর (রা)-কে এই মর্মে এক পরামর্শ দেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র পবিত্র দেহ মুবারক সমাহিত করার পূর্বেই যেন কোন যোগ্য ব্যক্তিকে খলীফা নির্বাচিত করা হয় এবং সেই সঙ্গে একথাও যেন গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয় যে, কুরাইশ বংশের বাইরে যদি কাউকে খলীফা নির্বাচন করা হয় তবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র দাফনের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের দাফন সম্পন্ন হবে। এই উক্তির উপরেই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) সমবেত শোকাকুল জনতার মধ্য হতে নেতৃস্থানীয় সাহাবীদের নিয়ে সকিফায়ে বনি সায়েদায় একত্রিত হন এবং অনেক বাক-বিতণ্ডা ও তর্ক-বিতর্কের পরে নির্বাচন পর্ব শেষ হয়; হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) খলীফা নিযুক্ত হন। খলীফা মনোনয়নের পর মুবারক দেহ সমাহিত করা হয়। হযরত আয়িশা (রা)-র রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা সম্পর্কে একটু চিন্তা করলে সহজেই বুঝতে পারা যায় তিনি কত বড় রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অধিকারিণী ছিলেন।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা)

উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা) তাঁর পিতার সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র অন্যতম সাহাবী হযরত খুনাইস (রা)-এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিবাহের কয়েক বছর পরে বদর যুদ্ধে হযরত খুনাইস (রা) শাহাদাত বরণ করেন। হযরত হাফসা (রা) দ্বিতীয় হিজরীর ১৭ই রমযান পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। দেশের প্রচলিত কৌলীন্য প্রথা অনুসারে হযরত উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র অন্যতম প্রিয় সাহাবী হযরত উসমান (রা)-কে অনুরোধ করেন। হযরত হাফসা (রা)-র রুক্ষ মেজাজের জন্য হযরত উসমান (রা) প্রকারান্তরে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। অতপর অন্যতম প্রধান এবং প্রিয়তম সাহাবী হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-র কাছে এবম্বিধ প্রস্তাব পেশ করলেন। তিনিও একই কারণে প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেন। এব্যাপারে হযরত উমর (রা) নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত মনে করলেন।

ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক পর্যায় হযরত উমর (রা)-এর অবস্থিতি ছিল মুসলিম জাহানের সুরক্ষিত দুর্গসম। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন একরোখা, স্পষ্টভাষী, ব্যক্তিত্ব ও ন্যায়নীতি সম্পন্ন একজন ক্রোধপরায়ণ ব্যক্তি। নিজের ক্রোধ দমন করতে না পেরে তিনি সাতিশয় দুঃখ ক্ষুব্ধান্তকরণে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র সমীপে মনোবেদনা প্রকাশ করে উদ্ভূত সমস্যার একটা সমাধান কামনা করেন। অনেক চিন্তা-ভাবনা করলেন। নিজের একান্ত অনুগত ভক্ত বিশ্বাসী

www.nagorikpathagar.org

সাহাবী ইসলামের প্রচারকার্যে প্রতিকূল পরিস্থিতি মুকাবিলায় সক্ষম সুদৃঢ় দুর্গসম একনিষ্ঠ এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু উমর (রা)-এর এই মুখরা কন্যা বিধবা হাফসা (রা)-কে তৃতীয় হিজরীর প্রথম দিকে নিজের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। এ বিবাহে দূরদর্শী আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) একদিকে যেমন একজন শহীদ সাহাবীর বিধবা স্ত্রীর বৈধব্য মোচন করলেন অন্যদিকে হযরত উমর (রা)-এর মত একজন দুর্ধর্ষ দুর্বার, অমিত তেজ বীর সাহাবীকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করলেন, যার ফলে ইসলামের প্রচার কার্য অব্যাহত অগ্রগতি আগের চাইতে আরো অগ্রগতি নিশ্চিত হল। কোন কোন গ্রন্থকারের মতে তিনি যদি হাফসা (রা)-কে বিবাহ না করতেন তা হলে অচিরেই তাঁর মুষ্টিমেয় সাহাবীর মধ্যে মহাঅনর্থের সূত্রপাত হয়ে যেত। হযরত উমর (রা) এ ব্যাপারে যেরূপ অপমানিত হয়েছিলেন তাতে তিনি এর প্রতিশোধ না নিয়ে কোনক্রমেই ক্ষান্ত হতেন না। যার ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রধান সাহাবীগণের মধ্যে ভীষণ মনোমালিন্য ও আত্মকলহের সৃষ্টি হয়ে যেত। যার কারণে শিশু ইসলামের প্রচারাভিযান বিঘ্নিত হত। দূরদর্শী মহামানব রাসূলুল্লাহ্ (সা) একথা ভাল করেই বুঝেছিলেন বলে প্রিয় সাহাবী হযরত উমর (রা)-এর উগ্র স্বভাবা কন্যা হাফসা (রা)-কে নিজ জাওযিয়াতে গ্রহণ করে মহান উদারতা, অসীম ধৈর্যশীলতা ও অপরিসীম সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন।

উগ্র স্বভাবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হযরত হাফসা (রা) মাঝে মাঝে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথেও কথা কাটাকাটি করতেন। এতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাময়িকভাবে অসন্তুষ্ট হলেও হাফসা (রা)-কে তিনি অত্যন্ত বিশ্বাস করতেন এবং গভীরভাবে ভালবাসতেন। একদা একটি অত্যন্ত গোপনীয় বিষয় তিনি হাফসা (রা)-র নিকট ব্যক্ত করেন এবং অন্য কারো নিকট কথাটা প্রকাশ করতে নিষেধ করেন। কিন্তু নারীসুলভ চপলতাবশত হযরত আয়িশা (রা)-র কাছে কথাটা প্রকাশ করায় স্বামী- স্ত্রীর মধ্যে কিছুটা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) হলেন অসন্তুষ্ট। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে সূরা তাহরীমে ঐ সকল উম্মুল মু'মিনীনের জন্য নসিহত নাযিল হয়। পরে তওবা করে সবাই ত্রুটিমুক্ত হন।

কোন এক ব্যাপারে হযরত হাফসা (রা) তদীয় পিতার উপস্থিতি কালেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে তর্ক-বিতর্ক করায় হযরত উমর (রা) তদীয় কন্যাকে প্রহার করতে উদ্যত হলে দয়ার নবী তৎক্ষণাৎ পিতা-পুত্রীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে যান। এতে হযরত উমর (রা) লজ্জিত হয়ে নিরস্ত্র হলেন বটে কিন্তু কন্যার প্রতি তাঁর ক্রোধের পূর্ণ প্রশমন হল না। তিনি কঠোর ভাষায় কন্যাকে হুঁশিয়ার করে দিলেন, "সাবধান, এহেন অন্যায় কাজ আর কখনো করো না। আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের গযব থেকে তোমাকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, এজন্য সাবধান হয়ে যাও।

www.nagorikpathagar.org

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর পারিবারিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার জন্য হযরত উমর (রা)-কে উপদেশ দিলেন। এ ব্যাপারের পর থেকে হযরত হাফসা (রা)-র উগ্রতার মাত্রা হ্রাস পেয়েছিল।

হযরত হাফসা (রা) তাঁর পিতার নিকট থেকে বিদ্যা শিক্ষা করেন। পরে আদর্শ শিক্ষক রাসূলে পাক (সা)-র নিকট থেকেও ছাত্রী হিসাবে তিনি পবিত্র কুরআন, হাদীস, উসূল, ফিকহ্ শরীয়তের যাবতীয় বিষয় বিশেষ করে নারী জীবনের অত্যাবশ্যকীয় বিষয় সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানার্জন করেছিলেন। হযরত আয়িশা (রা)-র মত তিনিও পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও তৎসম্পর্কে গভীর জ্ঞানার্জনে জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অন্যান্য সাহাবীর ন্যায় ইনিও ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা দান করতেন। অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা), হযরত হামজা ইবনে আবদুল্লাহ্, হযরত হারিস ইবনে ওয়াহাব, আবদুর রহমান ইবনে হারিস, সুফিয়া বিনতে ওবায়দা এবং উম্মে মুবাশশির আনসারী প্রমুখ ছাত্র-ছাত্রী হযরত হাফসার কাছ থেকে কুরআন, হাদীস ও ফিক্হ্ শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানার্জন করেন যা পরবর্তীকালে মুসলিম মিল্লাতের অশেষ কল্যাণ সাধন করে।

প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) পবিত্র কুরআন সংকলন করে সংকলিত পাণ্ডুলিপি উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা)-র নিকটেই আমানত রেখেছিলেন।

হযরত মুয়াবিয়ার শাসনামলে ৪৫ হিজরীতে শাবান মাসে ৬৩ বছর বয়সে হযরত হাফসা (রা) ইন্তিকাল করেন। শেষ নিশ্বাস ত্যাগের আগেই তিনি তাঁর ভ্রাতার নিকট ওসীয়ত করে যান যে, তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর যা কিছু আছে তা যেন আল্লাহ্র রাস্তায় দান করা হয়। ফরয, ওয়াজিব ছাড়াও নফল ইবাদতে তিনি ছিলেন সকলের চেয়ে অগ্রগামী। এমনকি মৃত্যুর দিনেও তিনি রোযা রেখেছিলেন এবং রোযা রাখা অবস্থায়ই ইন্তিকাল করেন। মদীনার গভর্নর মারওয়ান জানাযার নামায পড়েন। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নাব বিনতে খুযায়মা (রা)

ইনি আরবের অন্যতম সম্ভ্রান্ত গোত্র হেলাল বংশোদ্ভূত হারিসের পুত্র খুযায়মার কন্যা। মাতার নাম মানদাব বিনতে আউফ। তার প্রথম বিয়ে হয়েছিল আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশের সাথে। ইসলাম গ্রহণের পূর্ব থেকেই হযরত যয়নাব (রা) গরীব-মিসকীনদের আপন সন্তান-সন্ততির মত ভালবাসতেন এবং আদর-

www.nagorikpathagar.org

যত্ন করতেন। এই জন্যই তিনি 'উম্মুল মাসাকিনা' (দরিদ্র জননী) হিসাবে আখ্যায়িত হন। স্বামী-স্ত্রী এক সঙ্গেই ইসলাম গ্রহণ করেন। কিছু দিন পর উহুদ যুদ্ধে স্বামী আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ শহীদ হওয়ার ফলে দরিদ্র মাতা হযরত যয়নাব বিধবা হন এবং অসহায় অবস্থায় আশ্রয় খুঁজতে লাগলেন। মুসলমান হওয়ার কারণে আত্মীয়-স্বজনদের নিকটেও একটু আশ্রয় পেলেন না। মুসলমান পুরুষদের সংখ্যা তখন অমুসলিমদের তুলনায় খুবই কম। এ কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুসলিম বিধবাদের বিয়ে করবার জন্য সাহাবাদের উৎসাহ প্রদান করতেন এবং নিজেও একাধিক বিধবাকে বিয়ে করে আদর্শ স্থাপন করেছিলেন।

কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তদীয় গুণ-মাহাত্ম্যে মুগ্ধ যয়নাব নিজেকে বিনা মোহরানায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র যাওজিয়াতে সোপর্দ করার প্রস্তাব দেওয়ায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্মত হন এবং হযরত যয়নাবকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। আবার কারো কারো মতে যথারীতি মোহরানা দিয়েই রাসূলুল্লাহ্ (সা) যয়নাবকে বিয়ে করেছিলেন। এখানে মোহরানার প্রশ্নটাই কথা নয়, বড় কথা এই যে, দয়ার নবী দয়া করে একজন অনাথা মুসলিম বিধবাকে আশ্রয় দিলেন।

হিজরী তৃতীয় সালে পবিত্র রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে হযরত যয়নাব (রা)-এর শুভ শাদী সম্পন্ন হয়। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র বয়স ৫৬ এবং হযরত যয়নাবের বয়স ৩০ বছর। বিয়ের কয়েক মাস পরেই হযরত যয়নাব (রা) ইন্তিকাল করেন। দান-খয়রাত সাখাওতিতে ইনি উম্মুল মু'মিনীনদের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। খাদীজাতুল কুবরা ছাড়া অন্যান্য উম্মুল মু'মিনীনের মধ্যে ইনিই একাধিক দিকে সবচেয়ে ভাগ্যবতী। যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র জীবিতাবস্থায়ই ইনি ইন্তিকাল করেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজেই তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং নিজের মুবারক হস্তে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করেন।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা)

আসল নাম হিন্দ্। পিতা আরবের বিখ্যাত কুরাইশ খান্দানের মাখযুমী গোত্রের অন্যতম নেতা এবং ধনাঢ্য ব্যবসায়ী আবু উমাইয়া ইবনে মুগিরা ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আমের বিন মাখযুম। মাতা আতিকাহ্ বিনতে আমির ইবনে রবিয়া ইবনে মালিক কালানী। কালানী গোত্রও আরবের একটি সম্ভ্রান্ত গোত্র। পিতৃকুল এবং মাতৃকুলের দিক দিয়ে হিন্দ্ একজন অতীব সম্ভ্রান্ত মহিলা।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র দুধভাই এবং হিন্দের চাচাত ভাই আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল আসাদের সঙ্গে প্রথম বিবাহ হয়। স্বামী-স্ত্রী দু'জনই ইসলাম গ্রহণ করেন

www.nagorikpathagar.org

এবং কাফিরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র উপদেশে মুসলমানদের সঙ্গে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। আবিসিনিয়ায় তাদের একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এই পুত্রের নাম রাখেন সালমা এবং তৎকালীন প্রচলিত প্রথা অনুসারে স্বামী-স্ত্রী যথাক্রমে আবূ সালমা ও উম্মে সালমা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আবিসিনিয়ার আবহাওয়া তাদের স্বাস্থ্যের অনুকূল না হওয়ায় কিছুদিন পরে তাঁরা আবার মক্কায় ফিরে আসেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নির্দেশক্রমে তাঁরাও অন্যান্য মুসলমানের মত মদীনার পথে যাত্রা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কাফিরদের আক্রমণে স্বামী-স্ত্রী-পুত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। আবূ সালমা মদীনায় পৌছলেন, উম্মে সালমা তাঁর মাতৃকুলের হাতে পড়লেন, সালমা পিতৃকুলের হাতে পড়লো।

অনেক দুঃখ-কষ্ট ও নাটকীয় বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এক বছর পরে মদীনায় তাদের পুনর্মিলন ঘটল। কিন্তু এ মিলন বেশিদিন স্থায়ী হল না। কারণ, যুদ্ধাহত অবস্থায় অনেকদিন চিকিৎসার পর হিজরী চতুর্থ সালে জমাদিউস সানী মাসের নয় তারিখ আবূ সালমা ইন্তিকাল করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বয়ং নয় তাকবীরের সঙ্গে তাঁর জানাযা নামায পড়েন। সাহাবীদের প্রশ্নের উত্তরে হুযূর আকরাম (সা) বলেছিলেন, আবূ সালমা হাজার তাকবীরের উপযুক্ত ছিলেন।

চারটি শিশু সন্তানসহ হযরত উম্মে সালমা (রা) দুঃখের সাগরে ভাসতে লাগলেন। নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দানের উদ্দেশ্যে অনাথ য়াতিম পুত্র-কন্যাসহ হযরত উম্মে সালমা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) পরবর্তী শাওয়াল মাসের শেষের দিকে জাওয়িয়াতে গ্রহণ করে নিজ অন্তঃপুরে আশ্রয় দান করেন। বিয়ের সময় উম্মে সালমার বসয় ২৭ এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র বয়স ৫৭ বছর হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র এ বিয়ের কারণ সম্পর্কে মরহুম শেখ আবদুর রহীম 'মাদারেজুন্নবুওত' গ্রন্থের (২য় খণ্ড-২০৭ পৃষ্ঠায়) বর্ণনা করেন, যে সময়ে হযরত উম্মে সালমা অপোগণ্ড সন্তান সন্ততিগুলি নিয়ে দুঃখ সাগরে ভাসছিলেন তাঁর চারটি শিশু সন্তানের ভয়ে ইচ্ছা সত্ত্বেও যখন কেউই তাঁর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন নাই সেই সময় করুণার প্রতিমূর্তি হযরত মুহাম্মদ (সা) দয়াপরবশ হয়ে তাঁকে পত্নীরূপে বরণ করেন। পিতৃহীন শিশু সন্তানগুলির ভরণ-পোষণের ভার স্বহস্তে বহন করে উম্মে সালমাকে সান্ত্বনা প্রদান করাই তাঁর এই বিবাহের একমাত্র উদ্দেশ্য।

হযরত উম্মে সালমা যেমন রূপসী ছিলেন তেমনি গুণবতীও ছিলেন। তাঁর রূপ-মাধুর্য ও গুণ-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ইবনে হাজার আসকালানী লিখিত 'আল ইসাবা' গ্রন্থের ক্ষুদ্র একটি কবিতার অনুবাদেই প্রকাশ পায়, উম্মে সালমা চমকদার সৌন্দর্যে, পরিপক্ক বুদ্ধিতে এবং অভ্রান্ত বিচার-শক্তিতে গুণান্বিতা ছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে তিনি ছিলেন অতুলনীয়া। ষষ্ঠ হিজরীতে মক্কার কুরাইশদের সাথে হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তিতে যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবীদের মধ্যে নৈরাশ্য ও অসন্তোষ বিরাজ করছিল, তাদের মধ্যে যখন নেতার আদেশ পালনে ঔদাসীন্য লক্ষ্য করা গেল এবং নিরুপায় হয়ে চলে গিয়ে যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মনক্ষুণ্ন অবস্থায় সময় কাটাতে লাগলেন ঠিক সেই সময় হযরত উম্মে সালমার সময়োচিত নির্ভুল সিদ্ধান্ত ও পরামর্শ ভগ্ন মনোরথ সাহাবীগণের মধ্যে মনোবল ফিরে এল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অনুসরণ করত তাঁর নির্দেশ মুতাবিক বাহ্যত অবমাননাকর সন্ধির শর্তাবলীর প্রতি যথাযোগ্য আনুগত্য ও সম্মান প্রদর্শন করলেন। বলাবাহুল্য, এই হুদাইবিয়ার সন্ধিই ছিল মুসলমানদের জন্য প্রকাশ্য বিজয়। পরবর্তী সময়ে পবিত্র কুরআনেও এর যৌক্তিকতা ও সমর্থনসূচক আয়াত নাযিল হয়।

হযরত আয়িশা (রা) ও হযরত হাফসা (রা)-র মত ইনিও ফিক্হ শাস্ত্রে যথেষ্ট জ্ঞানার্জন করেছিলেন যা তিনি পরবর্তীতে বহু ছাত্র-ছাত্রীর মাধ্যমে অনাগত মানুষের কল্যাণের জন্য অমূল্য সঞ্চয় হিসেবে রেখে গেছেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র গৃহে তাঁর কোন সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করে নাই তবে পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত চারটি সন্তান-সন্ততি নিয়ে নবীগৃহে তিনি অপত্য স্নেহের নীড় রচনা করেছিলেন। হযরত ইমাম হুসাইন (রা)-এর শাহাদাতের পরে হিজরী ৬৩ সালে ৮৪ বছর বয়সে তিনি মদীনায় ইন্তিকাল করেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) তাঁর জানাযার নামায পড়ান। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নাব বিনতে জাহাশ (রা)

পিতা আরবের সুপ্রসিদ্ধ কুরাইশ বংশের আসাদিয়া গোত্রের এক বিশিষ্ট নেতা জাহ্শ। মাতা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র আপন ফুফু উমাইয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিব। ইসলামের প্রাথমিক পরিবারের অন্যান্য লোকের সাথে হযরত যয়নাবও ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নির্দেশে প্রথমে তারা আবিসিনিয়ায় এবং পরে মদীনায় হিজরত করেন। যয়নাব বিনতে জাহাশের বিবাহের ব্যাপারে এমন কতগুলি কারণ রয়েছে যেখানে কোন মানুষের কোন ইখতিয়ার ছিল না; স্বয়ং আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকেই এ সকল কারণের সমন্বয় সাধিত হয়েছিল। তৎকালীন আবরদেশে প্রচলিত কতিপয় বদ্ধমূল কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ করার জন্যই এ সকল পারস্পরিক কারণ সংযোগের প্রয়োজনও ছিল অপরিহার্য।

প্রথম কারণ ঃ 'আরবের অভিজাত কুরাইশ বংশের বংশ মর্যাদার কৌলীন্য অহমিকার মূলোৎপাটনের জন্য তৎকালীন সেরা সুন্দরী এবং কুলীন খান্দানের

www.nagorikpathagar.org

মেয়েকে কুৎসিত চেহারার সামান্যতম একজন মুক্ত ক্রীতদাস যায়েদের সাথে বিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ইসলামের সাম্য নীতির বুনিয়াদ স্থাপন করা হল। এখানে হযরত যয়নাব ও তাঁর ভ্রাতা আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহ্শ প্রথমত এ বিয়েতে নারাজ ছিলেন। কিন্তু পরক্ষণে তারা রাযী হলেন। যখন আল্লাহ্ পাক কালামে পাকের আয়াত অবতীর্ণ করলেন ঃ

مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّ لاَ مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ اَمْـرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْـرِهِمْ وَ مَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِيْنًا -

যখন আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল কোন বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা করে দেন তখন কোন মু'মিন মু'মিনার পক্ষে এ মীমাংসার বিরুদ্ধে এর বিপরীত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকার থাকে না এবং যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হয়, সে নিশ্চয়ই প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে লিপ্ত।

দ্বিতীয় কারণ ঃ হযরত যয়নাব (রা)-এর সাথে হযরত যায়েদ (রা)-এর বিভিন্ন কারণে বনিবনা না হওয়ায় বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারে ইসলামে স্ত্রীর স্বাধীন মতামতের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে এবং এর ফলে অত্যাবশ্যকীয় এবং অপরিহার্য ক্ষেত্রে স্ত্রীকে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে স্বামী বর্জন করার অধিকার দিয়ে নারী স্বাধীনতার ইতিহাসে ইসলাম নজীরবিহীন আদর্শ স্থাপন করেছে।

তৃতীয় কারণ ঃ এ বিয়েতে দুনিয়ার মানুষের বিশেষ করে মুসলিম মিল্লাতের কাছে অন্য একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয় পরিষ্কার হয়েছে যে, মানুষের যাবতীয় ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে বিলীন করে দিয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নিকট আত্মসমর্পণ করাই ইসলামের দাবি, আপাত দৃষ্টিতে তা যতই ক্ষতিকর হোক। আর এরই মধ্যে মানব জাতির ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি নিহিত রয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ইচ্ছার কাছে আনুগত্য প্রদর্শন করার ফলে হযরত যয়নব (রা) ক্রীতদাসের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী হিসাবে নিকৃষ্টতম অবস্থা থেকে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের সহধর্মিণী তথা উম্মুল মু'মিনীনের মর্যাদা লাভ করলেন।

চতুর্থ কারণ ঃ জনসাধারণের মধ্যে এমনি একটা জল্পনা-কল্পনা চলতে লাগলো, ক্রীতদাসের তালাক দেয়া স্ত্রীকে কে বিবাহ করে থাকে। হযরত যয়নবের ব্যাপারটা লোকচক্ষে অনেকটা অবজ্ঞা, ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যপূর্ণ আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ালো। তাই দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মানুষ মহানবী (সা) তাঁকে বিয়ে করে উঁচু-নীচুর বৈষম্য দূর করে দিলেন।

পঞ্চম কারণ ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত যায়েদকে পোষ্য পুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং তৎকালীন আরবদেশের বহুল প্রচলিত প্রথা অনুসারে তারা

www.nagorikpathagar.org

পোষ্য পুত্রকে নিজের পুত্ররূপ মনে করত এবং পোষ্য পুত্রের স্ত্রী বিধবা অথবা তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করা অবৈধ মনে করত। পোষ্য পুত্র যে পুত্র নয় এ বিয়েতে আরব সমাজে এ সত্যই প্রতিষ্ঠিত হল।

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ -

মুহাম্মদ (সা) তোমাদের মধ্যে কারো (কোন পুরুষের) পিতা নন।

ষষ্ঠ কারণ ঃ এ বিয়ের প্রস্তাবের পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুনাফিকদের ভয়ে স্বীয় অন্তরে কতকটা দ্বিধা-সঙ্কোচ অনুভব করছিলেন। আল্লাহ্ পাক তাঁকে দৃঢ়চিত্ত হবার জন্য তাকীদ দিলেন এবং অভয় দিলেন, "হে নবী! আপনি আপনার অন্তরে এমনি অবস্থা গোপন করে রাখতে চান যা আল্লাহ্ চান প্রকাশ করতে। আর আপনি ভয় পাচ্ছেন মানুষের অথচ আপনার উচিত একমাত্র আল্লাহ্কে ভয় করা।" এখানে সত্য ন্যায়ের খাতিরে মানুষের সর্বপ্রকার সমালোচনা ও নিন্দাবাদকে উপেক্ষা করে কর্তব্য কর্মে অবিচল থাকার নির্দেশ পাওয়া যায়।

সপ্তম কারণ ঃ মুখবোলা পুত্রদের বিধবা অথবা তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীদের বিয়ে করার ব্যাপারে মু'মিনদের যাতে আর কোন বাধা না থাকে সেজন্য আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআন মজীদে সূরা আহ্যাবে ৩৭ আয়াতে পরিষ্কার ফয়সালা দেন। (সূরা আহ্যাব আয়াত ৩৭)

فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْ اَزْوَاجِ اَدْعِيَائِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا -

অতপর যায়েদ যখন তাঁর স্ত্রীর তালাকের ব্যাপার সমাপ্ত করে ফেলল (এবং ইদ্দত পার হয়ে গেল) তখন আমরা আপনার সঙ্গে তাঁর বিবাহের ব্যবস্থা করে দিলাম এই জন্য যে, মুখডাকা পুত্রদের স্ত্রীদের বিয়ে করার ব্যাপারে মু'মিনদের আর কোন অন্তরায় না থাকে—সে অবস্থায় যখন তাদের স্বামীরা তালাক দান কার্য সমাপ্ত করে ফেলে। এবং আল্লাহ্র আদেশ নিশ্চয়ই সুসম্পন্ন হবে।"

যায়েদ (রা)-এর সাথে যয়নবের বিয়ে হয় ৪র্থ হিজরীতে। তাদের বিয়ের স্থিতিকাল মাত্র এক বছর। বিভিন্ন প্রকারের অসুবিধার জন্য বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটার কয়েক মাস পরেই পঞ্চম হিজরীর শেষের দিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়। কি অবস্থায় কোন্ পরিস্থিতিতে এবং কোন্ কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত যয়নাব (রা)-কে বিয়ে করলেন আশা করি তা পাঠক-পাঠিকাগণ সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছেন। স্বয়ং আল্লাহ্ পাকের নির্দেশেই যে এই বিবাহ

www.nagorikpathagar.org

সম্পন্ন হয়েছে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। যেহেতু কালামে পাকের মাধ্যমেই তিনি এ ঘটনাকে সত্যায়িত করেছেন।

হযরত যয়নাব (রা)-এর চরিত্রে যে দৃঢ়তার প্রমাণ পাওয়া যায় তা উম্মুল মু'মিনীনদের অনেকের চরিত্রেই ছিল না। তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী এবং তাঁর আত্মপ্রত্যয় ছিল অত্যন্ত দৃঢ়। শুধু সৌন্দর্যে নয় চরিত্র মাধুর্যেও তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র হেরেমের মধ্যে একজন আদর্শ স্থানীয় মহিলা যার সম্পর্কে হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা) বলেন ঃ "ধর্মের দিক থেকে তাঁর চাইতে উত্তম নারী আমি আর দেখিনি।" তিনি আরো বলেন, "ধর্মীয় মুয়ামেলায়, তাকওয়ায়, সত্যবাদিতায়, দানশীলতায়, আত্মীয়তার বন্ধন দৃঢ় রাখায় এবং আত্মত্যাগের প্রেরণায় তাঁর চাইতে শ্রেষ্ঠতর কোন নারী ছিল না।"

হযরত উম্মে সালমা (রা) তাঁর সম্পর্কে বলেন, "তিনি ছিলেন অতীব নেককার, অধিক রোযাদার এবং বহু ইবাদত গোযার।" সকল উম্মুল মু'মিনীনের সামনে (তাঁরই শানে) রাসূলুল্লাহ্ (সা) ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন, তোমাদের মধ্যে যার হস্ত দীর্ঘ সেই সর্বাগ্রে আমার সঙ্গে জান্নাতে মিলিত হবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র দীর্ঘ হস্ত হওয়ার কথার তাৎপর্য ছিল দান-খয়রাতে মুক্ত-হস্ত হওয়া। উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নাব (রা) ছিলেন দান-খয়রাতে সকল উম্মুল মু'মিনীনের চেয়ে মুক্তহস্ত। তিনি এক কপর্দক জমা রাখা পছন্দ করতেন না। তাই তিনি হুযূর (সা)-র ইন্তিকালের পরে সকল উম্মুল মু'মিনীনের আগেই ৫০ বছর বয়সে ২০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন এবং সর্বপ্রথম রসূলে পাক (সা)-র সাথে মিলিত হন। মৃত্যুকালে তাঁর একটা পয়সাও জমা ছিল না। নিজের অর্থ দিয়েই তিনি তাঁর কাফনের কাপড় জীবিতাবস্থায় কিনে রেখেছিলেন। তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় ইন্তিকাল করেন। খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর (রা) নামাযে জানাযা পড়ান। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়।

উম্মুল মু'মিনীন জুওয়ায়রিয়া (রা)

দুর্ধর্ষ যোদ্ধা গোত্র বনু মুস্তালিক সম্প্রদায়ের দলপতি হারিসের কন্যা—নাম বাররাহ। বনু মুস্তালিক গোত্র শুরু থেকেই ইসলাম, মুসলমান তথা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র জানী দুশমন এবং উহুদের যুদ্ধে কুরাইশদের মিত্র শক্তি হিসাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিল। পঞ্চম হিজরীর ২রা শাবান সোমবার মদীনা থেকে নয় মানজিল দূরে মুরায়সী নামক কূপের নিকটে মুসলমানদের সাথে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে বনু মুস্তালিক সম্প্রদায় পরাজিত হলে দলপতি হারিস পালিয়ে আত্মরক্ষা করে এবং (বাররাহের) স্বামী যোশ শোকরানসহ বহু লোক

www.nagorikpathagar.org

নিহত হয়। বাররাহসহ ছয় শ লোক যুদ্ধে বন্দী হয়ে মুসলমানদের অধীনে আসে এবং এই সঙ্গে আসে শত-সহস্র উট-ভেড়াসহ বিপুল সংখ্যক গনীমতের মাল। গনীমতের বণ্টন ব্যবস্থা অনুসারে যুদ্ধ বন্দিনী বাররাহ পড়লেন সাহাবী সাবিত ইবনে কায়েসের ভাগে।

কিন্তু অভিজাত গোত্রের সর্দারের কন্যা বাররাহ এ দাসী জীবন সহ্য করতে পারলেন না। অবশেষে সাবিত ইবনে কায়েসের কাছে তিনি মুক্তির জন্য প্রার্থনা করলেন। মালিক মোটা অংকের মুক্তিপণ দাবি করায় দাবিকৃত অর্থ সংগ্রহ করতে না পেরে বাররাহ একদিন দয়ার নবী মানুষের দাসত্ব মোচনকারী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র শরণাপন্ন হলেন এবং আবেদনের ভাষায় আরয করলেন, "আমি জুওয়ায়রিয়া (ছোট্ট বালিকা), আমি বিপন্না, আমি বিপদগ্রস্তা, আমি অসহায়া, দয়া করে দয়ার নবী আমাকে সাহায্য করুন।" বাররাহর এই 'জুওয়ায়রিয়া' উচ্চারণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র দয়ার্দ্র চিত্তে দাগ কাটলো এবং তার আরজি ও তার প্রকাশ ভঙ্গী তাঁর খুব পসন্দ হল। বাররাহর মুক্তিপণের সমস্ত অর্থই তাকে দিয়ে দিলেন। অর্থের বিনিময়ে বাররাহ তার মালিক সাবিতের নিকট থেকে মুক্তি পেলেন। কিন্তু মুসলমানদের উদার আচরণে মুগ্ধ হয়ে তাদের সংশ্রব ত্যাগ করতে রাযী হলেন না।

আল্লাহ্র রাসূলের পবিত্র চরিত্র মাধুর্যে ও সুমহান ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ-বিমোহিত জুওয়ায়রিয়া শেষ পর্যন্ত পবিত্র ইসলাম গ্রহণ করত তাঁর খিদমতে নিজেকে উৎসর্গ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করত তার সেই প্রথম উচ্চারিত ভাললাগা 'জুওয়ায়রিয়া' নামে তাঁকে নিজের যাওজিয়াতে গ্রহণ করলেন। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাষ্ট্রনায়ক মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই বাররাহ ওরফে জুওয়ায়রিয়াকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে শুধু একটি নও-মুসলিম মহিলাকেই নয় বরং এক দুর্ধর্ষ যোদ্ধা গোত্র গোটা বনু মুস্তালিক সম্প্রদায়কেই বিনা রক্তপাতে একটা অস্ত্রবিহীন যুদ্ধে আপন করে নিলেন। বিয়ের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাররাহকে যে জুওয়ায়রিয়া নামে অভিহিত করলেন সেই হতেই বাররাহ মুসলিম জাহানের উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুওয়ায়রিয়া নামে প্রসিদ্ধি লাভ করলেন। হিজরী পঞ্চম সালে শাবান মাসের শেষদিকে শাদী মুবারক অনুষ্ঠিত হয়। বিয়ের সময় জুওয়ায়রিয়া (রা)-র বয়স ছিল বিশ বছর এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র বয়স ৫৯ বছর।

এ বিবাহের পরেই অন্যান্য সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র সম্মানার্থে শ্বশুর গোত্রের ছয় শ যুদ্ধবন্দীর প্রত্যেককেই মুক্তি দিলেন। ইতিমধ্যে জুওয়ায়রিয়ার পিতা হারিস খোদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র দরবারে এসে ইসলাম কবূল করলেন।

www.nagorikpathagar.org

যার ফলে দুর্ধর্ষ বনু মুস্তালিক সম্প্রদায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র বশ্যতা স্বীকার করলেন। অতীতের শত্রুতা ভুলে গিয়ে সর্বক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ইসলামের শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে লাগলেন। রাজনৈতিক কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র এ বিবাহ সম্পাদিত হয়েছিল। এ বিয়েকে একটি অস্ত্রবিহীন যুদ্ধ, যুদ্ধবিহীন বিজয় বলা যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র এই পুণ্যময় পরিণয় ক্রিয়া একটি দুর্ধর্ষ সম্প্রদায়ের অন্তকরণে যেরূপ প্রভাব বিস্তার করেছিল, দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ানের নিষ্কোষিত তলোয়ার কোন জাতির অন্তকরণে সেরূপ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয় নাই।"

হযরত জুওয়ায়রিয়া সম্পর্কে ভগ্নীসম স্বপত্নী হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, "হযরত জুওয়ায়রিয়া শুধু দেখতেই সুন্দরী ছিলেন না, বাহির যেমন সুন্দর আচরণেও তেমনি সুন্দর এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত ছিলেন। যেকোন লোক তাঁর সংস্পর্শে আসলে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট এবং মুগ্ধ না হয়ে পারতো না। তাঁর বিবাহের পরিণতি সম্পর্কে উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, বনি মুস্তালিকের জন্য জুওয়ায়রিয়াহ্ অপেক্ষা মহত্তর আশীর্বাদ আর কিছুই ছিল না। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র পক্ষেও এই বিবাহ্ অপেক্ষা বৃহত্তর আর কোন যুদ্ধহীন বিজয়ও ছিল না।

নিঃসন্তান অবস্থায় পঞ্চাশ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে তিনি ৬৫ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়। মদীনার গভর্নর মারওয়ান ইবনে হাকাম তাঁর নামাযে জানাযা পড়ান।

উম্মুল মু'মিনীন উম্মে হাবিবাহ্ বিনতে আবূ সুফিয়ান (রা)

পিতা কুরাইশ বংশের বনু উমাইয়া গোত্রের সর্ব প্রধান নেতা আবূ সুফিয়ান ইবনে হরব ইবনে উমাইয়া। ইতিহাস প্রসিদ্ধ উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন আবূ সুফিয়ানের দাদা এই উমাইয়া।

মাতা হযরত উসমান (রা)-এর আপন ফুফু সুফিয়া বিনতে আবুল আস। উম্মে হাবিবার আসল নাম রামলাহ্। নবুওতের সতর বছর পূর্বে তাঁর জন্ম হয়। পিতা-মাতা উভয় দিক দিয়ে তিনি বনী উমাইয়া বংশের আভিজাত্যের অংশীদার। পরিণত বয়সে আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহ্শের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয় এবং এ ঘরেই কন্যা হাবিবার জন্ম হয় এবং এ কারণেই তিনি 'উম্মে হাবিবাহ' নামে পরিচিতি লাভ করেন।

ইসলামের প্রাথমিক যুগেই স্বামী-স্ত্রী (উম্মে হাবিবাহ ও আবদুল্লাহ্) পবিত্র ইসলাম গ্রহণ করেন। শত্রুদের অমানুষিক অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে স্বামী-স্ত্রী

www.nagorikpathagar.org

উভয়ই আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত সেখানে পৌছেও শান্তি লাভ করতে পারেন নি। তাঁর স্বামী অত্যন্ত পানাসক্ত ও উদ্ধত ছিল। তখনও মদ্যপান বিষয়ে হারামের আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। তিনি আবিসিনিয়ায় পৌছে তথাকার খৃস্টান জাতির ব্যভিচার ও প্রবল পানাসক্তি অবলোকন করে তিনিও তাদের সঙ্গে অত্যধিক পরিমাণে মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে উঠেন। সহধর্মিণীর ঐকান্তিক অনুরোধ ও উপদেশ বাক্য অবহেলা করে অচিরেই তিনি খৃস্ট ধর্মে আত্মসমর্পণ করেন। এবং স্বেচ্ছাচারিতামূলক ধর্মের কল্যাণে একদা অত্যধিক মদ্যপানে উন্মত্ত হয়ে অতি শোচনীয় অবস্থায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

স্বামী আবদুল্লাহ্র মৃত্যুর পর হযরত উম্মে হাবিবার দুঃখ-দুর্দশা চরমে পৌছা সত্ত্বেও খৃস্টানদের আপাত মধুর প্রলোভন উপেক্ষা করেও তিনি ইসলামের প্রতি পূর্ববৎ আনুগত্য বজায় রাখেন। উম্মে হাবিবার শোচনীয় দুরবস্থার কথা দয়ার নবী রাসূলুল্লাহ্ (সা) জানতে পেরে তাঁর উপায় খুঁজতে থাকেন। আল্লাহ্ পাকের অশেষ অনুগ্রহে বাদশা নাজ্জাশী ইতিমধ্যে সদলবলে ইসলাম গ্রহণ করেন। উম্মে হাবিবার দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের ব্যবস্থা স্বয়ং আল্লাহ্ পাকই করে দিলেন। উম্মে হাবিবার অবস্থার কথা শ্রবণ করে উম্মুল মু'মিনীন হিসাবে তাঁকে তাঁর হেরেমে আশ্রয় দানের ইচ্ছা করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাদশাহ নাজ্জাশীর নিকট এক পত্র দেন এবং তাকে স্বপক্ষে উকিল নিযুক্ত করেন। নাজ্জাশীর মধ্যস্থতায় যথাসময়ে বিবাহ কার্য সুসম্পন্ন হয় এবং সসম্মানে জাহাজযোগে উম্মে হাবিবা (রা)-কে মদীনায় প্রেরণ করেন।

কোন কোন গ্রন্থকারের মতে, স্বামী আবদুল্লাহ্ খৃস্টান হওয়ার পরে আশ্রয়হীন উম্মে হাবিবা নিরুপায় হয়ে বাদশা নাজ্জাশীর নিকট উপস্থিত হয়ে তার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেন। বাদশা তাঁর প্রার্থনায় রাজকীয় সম্মানে তাঁকে মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট প্রেরণ করেন এবং পত্রযোগে এই মর্মে অনুরোধ করেন যাতে তিনি অগ্নি পরীক্ষিত ঈমানের এবং ইসলাম-প্রীতির পুরস্কার স্বরূপ উম্মুল মু'মিনীনরূপে নিজ হেরেমে আশ্রয় দান করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাজনৈতিক এবং মানবিক কারণে তাঁকে গ্রহণ করে নওমুসলিম নরপতি নাজ্জাশীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। এ বিয়ে সংঘটিত হয় সপ্তম হিজরীর রমযান মাসের প্রথম দিকে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন খায়বর অভিযানের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। বিয়ের সময় হাবিবার বয়স হয়েছিল ৩৮ বছর এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র বয়স ৬০ বছর। তিনি কমপক্ষে তিন বছর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র সঙ্গে দাম্পত্য জীবন যাপনের সুযোগ পান। হিজরী ৪৪ সালে ৭৮ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

www.nagorikpathagar.org

এ বিবাহের ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র এককালীন সর্ব প্রধান শত্রু এবং আরবের প্রধান সর্দার আবূ সুফিয়ান ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ইসলাম তথা মুসলমানদের খিদমতে জীবন অতিবাহিত করেন। মানবিক এবং রাজনৈতিক উভয় কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র এ বিবাহ গুরুত্বপূর্ণ।

হযরত উম্মে হাবিবা (রা)-র অগ্নি পরীক্ষিত ঈমান তথা ইসলাম-প্রীতি সর্বোপরি আল্লাহ্র রাসূলের প্রতি তাঁর গভীর ভক্তি ও প্রীতিকে তিনি দুনিয়ার সবকিছুর উর্ধ্বে স্থান দিতেন। ছোট্ট একটি ঘটনার উল্লেখ করছি—একদিন তাঁর পিতা কুরাইশ দলপতি আবূ সুফিয়ান হুদায়বিয়ার সন্ধিকৃত সময়সীমা সম্প্রসারণের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট যান। কিন্তু সরাসরি এ প্রস্তাব দিতে না পেরে তদীয় কন্যা এই উম্মে হাবিবার শরণাপন্ন হলেন এবং কন্যাকে অনুরোধ করলেন যেন তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র দরবারে এ প্রস্তাবটি পেশ করেন। নিজ কন্যার ঘরে গিয়ে তার চৌপায়ার উপরে বসতে উদ্যত হতেই কন্যা নিজ পিতাকে উঠিয়ে দিলেন এবং বললেন, এ চাদরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) উপবেশন করেন, কাফির-মুশরিকের অঙ্গ স্পর্শে এ পবিত্র চাদরের অবমাননা হোক এটা আমি চাই না। আবূ সুফিয়ান চৌপায়া ছেড়ে নিচে বসলেন এবং কন্যার কাছে সন্ধির মেয়াদ বৃদ্ধির আরজি পেশ করলেন। কন্যার নিকট থেকে দৃপ্ত কণ্ঠে উত্তর এল, "আপনারা মক্কার কাফিররাই সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করেছেন সুতরাং এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র দরবারে আপনাদের পক্ষে সুপারিশ করার মনোবৃত্তি আমার নেই। তবে পারি যদি আপনি মক্কাবাসীদের নিয়ে ইসলাম কবূল করেন।" কন্যার এবম্বিধ আচরণে এবং উপদেশে পিতা আবূ সুফিয়ানের অন্তরে ভাবান্তর উপস্থিত হয় এবং মক্কা বিজয়ের দিনে সদল বলে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে ধন্য হন।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সুফিয়া বিনতে হাই (রা)

ঐতিহাসিক খায়বরের ইয়াহূদী দলপতি হাই বিন আখতাবের কন্যা। হাই বিন আখতাব ছিল ইয়াহূদী জাতির বনু নাজ্জার গোত্রের সর্বজন স্বীকৃত নেতা। এবং মাতা বাররাহ্ ছিল ইয়াহূদী জাতির বনু কুরায়জা গোত্রের প্রধান সেনাপতি সামওয়ানের কন্যা। খান্দানী ও শারাফাতের দিক দিয়ে বনু নাজ্জার ও বনু কুরাইজা গোত্র ছিল সমগ্র ইয়াহূদী জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী। সুতরাং মাতৃকুল এবং পিতৃকুল উভয় দিক দিয়েই হযরত সুফিয়া ছিলেন জাত কুলীন। পিতৃকুলের দিক দিয়ে তিনি হযরত হারুন (আ)-এর বংশধর।

www.nagorikpathagar.org

প্রথম স্বামী সালাম বিন মুশকামের সাথে বনিবনা না হওয়ায় সেখান থেকে তালাক প্রাপ্তা হন। পরে সুফিয়া ইতিহাস প্রসিদ্ধ খায়বরের দুর্গ রক্ষক কিনানা ইবনে আবিল হাকিমের সঙ্গে দ্বিতীয় বার পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। খায়বর যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে কামুস দুর্গের পতন হয়। সুফিয়ার পিতা ও স্বামীসহ বহু লোক নিহত হয় এবং অন্যান্য যুদ্ধবন্দীর সাথে সুফিয়াকেও শিবিরে আনা হয়। ইসলামের সংস্পর্শে এসে সুফিয়া মুসলমান হয়ে গেলেন। এ সুসংবাদে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সুফিয়াকে মুক্তি দিয়ে তাঁকে যদৃচ্ছা গমনের অধিকার প্রদান করেন, কিন্তু সুফিয়া কোথাও যেতে রাযী না হয়ে করজোড়ে বললেন, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এই যুদ্ধে আমার পিতা ও স্বামী নিহত হয়েছেন এবং আমিও ইয়াহূদী ধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি। এখন আমার ইয়াহূদী আত্মীয়-স্বজন আমাকে গ্রহণ করবে না, আশ্রয়ও দিবে না, অনাদরে আমাকে তাড়িয়ে দেবে। অতএব আমি কোথাও যেতে রাযী নই বরং আপনার পদ সেবিকা দাসী হিসাবে আপনার অন্তঃপুরে আশ্রয় দান করুন!" যে বিপ্লবী নেতা মানুষের মুক্তির জন্য দুনিয়াতে এলেন তিনি আবার কি দাসী গ্রহণ করতে পারেন? অবৈধভাবেই বা তিনি কি করে অন্তঃপুরে আশ্রয় দিবেন? অনেক চিন্তা করে কোনরূপ আত্মীয়তার মাধ্যমে রাজনৈতিক সৌহার্দ স্থাপনে ইয়াহূদী জাতিকে পরাভূত করার মানসে তিনি সুফিয়ার প্রার্থনা কবূল করেন এবং মদীনা প্রত্যাবর্তনের পথে খায়বরের নিকট সহব নামক স্থানে সপ্তম হিজরীর মুহররম মাসের শেষের দিকে তাঁকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করেন। বিবাহকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র বয়স ছিল ৬০ বছর এবং সুফিয়ার ১৭। তিনি একজন বিদুষী মহিলা ছিলেন। তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজনের কাছে প্রায়ই চিঠিপত্র লিখতেন এবং তাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র গুণ মাহাত্ম্যের বর্ণনা এবং ইসলামের সার্বজনীন আদর্শের কথা উল্লেখ করতেন, যার ফলে তাঁর আত্মীয়-স্বজনগণও পরবর্তীকালে ইসলাম কবূল করেন। হিজরী ৫০ সালে ৬০ বছর বয়সে হযরত মুয়াবিয়ার খিলাফতকালে ইন্তিকাল করেন। তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মুনা বিনতে হারিস (রা)

পিতা কুরাইশ বংশের হাওয়াজিন গোত্রের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হারিস ইবনে হাযন। মাতার নাম খাওলা। উভয়ই কুরাইশ বংশোদ্ভূত। পিতা-মাতা নাম রাখেন বাররাহ। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে বিবাহের পরে নাম রাখা হয় মায়মুনাহ্।

www.nagorikpathagar.org

মাসুদ ইবনে আমর ইবনে উমায়েরের সাথে প্রথম বিয়ে হয় কিন্তু স্বামী-স্ত্রীতে বনিবনা না হওয়ায় সেখান থেকে তালাকপ্রাপ্তা হয়ে আবূ রাহাম ইবনে উযযার সাথে দ্বিতীয়বার বিবাহিতা হন। সপ্তম হিজরীর প্রথম ভাগে তাঁর দ্বিতীয় স্বামী মারা যায়।

হুদায়বিয়ার সন্ধি অনুসারে ৭ম হিজরী সালের যিলকদ মাসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কাযা উমরা আদায়ের জন্য মক্কায় গমন করেন এবং সেখানেই চাচা আব্বাস (রা)-এর পরামর্শে ও মধ্যস্থতায় ৫১ বছর বর্ষীয়া বৃদ্ধা মায়মুনা (রা)-কে বিয়ে করেন। এ বিবাহের অন্তর্নিহিত গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল মক্কার কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তি ও দলের সঙ্গে আত্মীয়তা সম্পর্ক স্থাপন করে সুকৌশলে দুর্ধর্ষ কুরাইশদের শক্তি ও গর্ব খর্ব করা। এই মায়মুনাই হলেন হুযূর পাক (সা)-র চাচা আব্বাস (রা)-এর শ্যালিকা এবং বিশ্ব বিখ্যাত সৈনাপত্যের কিংবদন্তী মহাবীর খালিদ বিন ওয়ালীদের আপন খালা। আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ হবার অত্যাল্পকাল পরেই মহাবীর খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা) এবং হযরত আব্বাস (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। এ সকল বীর যোদ্ধার অভাবে কুরাইশদের শৌর্যবীর্য প্রভাব অচিরেই নিষ্প্রভ হয়ে গেল। এদের প্রভাবে মুসলমানদের অমিত বিক্রম সহস্রগুণে বর্ধিত ও বিস্তৃত হয়ে ইসলামের জয়-জয়কার দিকে দিকে অনুরণিত হল।

এমনি করেই পর বছর রমযান মাসে ইসলামের সুদৃঢ় শক্রঘাঁটি মক্কা নগরী বিনা রক্তপাতেই বলা যায় মুসলমানদের করতলে এল। ঐতিহাসিকদের মতে, মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে কোনরূপ যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি; কুরাইশগণ মুসলমানদের আগমন সংবাদে নিজ নিজ ঘরবাড়ি ছেড়ে কা'বার হেরেমে, পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করে। শুধু খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা)-এর হাতে বিশজন মক্কাবাসী নিহত হয়। নিঃসন্দেহে সবকিছুই আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছায় সম্পাদিত হয়। কিন্তু বাহ্য দৃষ্টিতে আমরা বলতে পারি যে, মুসলমানদের হাতে মক্কা বিজয়ের কারণ পরম্পরায় সংযোগ সাধন করেছেন আল্লাহ্ পাক এই বিবাহের মাধ্যমেই। এই বিবাহের সুফলেই বিদ্রোহের কেন্দ্রভূমি মক্কা নগরী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র পদানত হয়। কা'বার শীর্ষে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র হাতেই ইসলামের বিজয় পতাকা উত্তোলিত হয়। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মক্কার অধিবাসিগণ অত্যাল্পকাল মধ্যেই কালকের রাখাল বালক এবং আজকের রাষ্ট্রপতির নিকটে দলে দলে এসে আত্মসমর্পণ করতে লাগল। বিজয়ের গৌরবে উৎফুল্ল এবং আল্লাহ্র নিকট কৃতজ্ঞতার বোঝায় ভারাক্রান্ত মহামানব এদের সবাইকে ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে

www.nagorikpathagar.org

অভয় দান করলেন এবং আল্লাহ্র শুকরানা আদায় করার জন্য নামাযে শুকরিয়া আদায় করলেন। আলহামদু লিল্লাহ্!

উম্মুল মু'মিনীন হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রা)

বংশ পরিচয় সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় নি। তবে যতদূর জানা যায়, সপ্তম হিজরীতে মিসর সম্রাট মাকুকাস সৌহার্দ্য ও শুভেচ্ছার নিদর্শনস্বরূপ তৎকালীন প্রথা অনুসারে মারিয়া কিবতিয়াকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় মুসলিম জাহানের একচ্ছত্র সম্রাট মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট উপঢৌকনস্বরূপ প্রেরণ করেন। এক স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে অন্য এক স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রপতির নিকট রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রেরিত উপঢৌকন। আন্তর্জাতিক রীতিনীতির খাতিরে তিনি তার এ উপঢৌকন ফেরত দিতে পারেন নি। ইসলামের দাওয়াত দিলেন। মারিয়া সানন্দে সাগ্রহে ইসলাম গ্রহণ করলেন। অতপর ইসলামী অনুষ্ঠান মতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে নিজ জাওযিয়াতে গ্রহণ করে বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্রপতি মাকুকাসের প্রদত্ত রাজনৈতিক উপঢৌকনের প্রতি যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদর্শন করলেন।

এ বিবাহ সংঘটিত হয় সপ্তম হিজরীর শেষের দিকে। হযরত মারিয়ার গর্ভে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তিনিও শিশু বয়সে ইন্তিকাল করেন।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত রিহানা বিনতে শামাউন (রা)

রিহানা বিনতে শামাউন সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রা)-কে যেমন মিসরের বাদশা উপঢৌকনস্বরূপ প্রেরণ করেছিলেন, তদ্রূপ হযরত রিহানাকেও কোন একজন নৃপতি উপঢৌকন দিয়েছিলেন। হযরত মারিয়াকে যে কারণে বিবাহ করেছিলেন রিহানাকেও উক্ত কারণে নিজের জাওযিয়াতে গ্রহণ করেন। হযরত রিহানার পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) অন্য কোন রমণীকে বিবাহ করেননি।

এখন আমরা বলতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র তেরটি বিবাহের মধ্যে মানবীয় স্বাভাবিক কারণে একটি বিবাহ অর্থাৎ হযরত খাদীজা (রা)-র সাথে বিবাহের ফলে ইসলামের প্রথম পদক্ষেপে বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার মুকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি ও সম্পদের সরবরাহ করা হয়েছে। মানবীয় নৈতিক কারণে তিনটি বিবাহ অর্থাৎ হযরত সাওদা (রা), যয়নাব বিনতে খুজায়মা ইবনে উম্মে সালমার সাথে বিবাহে তিনটি বিধবা দুস্থা অনাথাকে আশ্রয় দান করা হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

দু'টি বিবাহে অর্থাৎ হযরত আয়িশা ও হাফসার সাথে বিবাহে মানবীয় সামাজিক কারণে দুই প্রিয়তম সাহাবীর ঐকান্তিক অনুরোধ পালন করে শিশু ইসলামের ভিত্তি সুদৃঢ় করা হয়েছে; কতিপয় দীর্ঘস্থায়ী কুসংস্কার দূরীকরণোদ্দেশ্যে আল্লাহ্ পাকের প্রত্যক্ষ আদেশে অন্য একটি বিবাহ্ অর্থাৎ যয়নাব বিনতে যাহাশের সাথে বিবাহ্ সম্পাদিত হয়েছে। রাজনৈতিক তথা কূটনৈতিক কারণে বাকি ছয়টি বিবাহ্ অর্থাৎ জুওয়ায়রিয়াহ, উম্মে হাবিবাহ, মায়মুনা, সুফিয়া, মারিয়া এবং রিহানার সাথে বিবাহে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তথা ইসলামের কট্টর দুশমন ও কতিপয় দুর্ধর্ষ যোদ্ধা গোত্র রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র বশ্যতা স্বীকার করে। ইসলামের শক্তি বর্ধনে জানমাল দিয়ে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে এবং কতিপয় বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে বৈদেশিক, কূটনৈতিক এবং রাজনৈতিক সুসম্পর্ক স্থাপন তথা বহির্বিশ্বে ইসলামের সার্বজনীনতা ও জনপ্রিয়তা অর্জন করা অধিকতর সহজসাধ্য হয়েছে।

উপরিউল্লিখিত কারণসমূহ ছাড়াও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র বহু বিবাহের পিছনে আরো কতকগুলি আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক কারণও ছিল। এ সম্পর্কেও সংক্ষেপে কিছু আলোকপাত করা প্রয়োজন। রাসূলে পাক (সা)-র সমগ্র জীবন হল পবিত্র কুরআনের সঠিক, বাস্তব এবং পূর্ণাঙ্গ রূপ। সকল মহা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্ধ্বে এক বিশ্ববিদ্যালয়। নরনারী নির্বিশেষে সমগ্র মানব তথা সমগ্র জীবের প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণের জন্য একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ জ্ঞান কেন্দ্র। আল্লাহ্র রাসূল (সা) যে একজন মহাবিজ্ঞানী এবং তাঁরই জীবনই যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রস্থল এ কথা স্বয়ং আল্লাহ্ পাকই মহাগ্রন্থ কুরআনে ঘোষণা করেছেন। "এটা সেই গ্রন্থ যার আয়াতগুলোকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করা হয়েছে, অতপর বর্ণনা করা হয়েছে একজন মহা বিজ্ঞানীর পক্ষ থেকে।"

জ্ঞান-বিজ্ঞানের এ কেন্দ্র থেকে শুধু পুরুষ শিষ্যরাই জ্ঞান আহরণ করুক আর তাদের আহরিত জ্ঞানের দ্বারা শুধু পুরুষ সমাজই উপকৃত হোক এটাও মহান রাব্বুল আলামীনের উদ্দেশ্য ছিল না। তাই মানব জাতির অর্ধাঙ্গস্বরূপ নারী জাতির প্রয়োজনে ও উপকারার্থে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র অমৃত বাণী, আদর্শ ও অনুসৃত কার্যাবলীর প্রয়োগ বিধি সম্পর্কে বিশেষ করে নারী জাতির দেহ ও মনের সাথে একান্ত সম্পৃক্ত জটিল সমস্যা পূর্ণ অমূল্য তথ্যাবলী সংরক্ষণ করত দুনিয়ার নারী সমাজকে উপহার দেয়ার জন্য তাঁর হেরেমে নারী শিষ্যেরও প্রয়োজন ছিল। যেহেতু নবীর অন্তঃপুরে বাইরের পুরুষদের গমনাগমনের কোন সুযোগ ছিল না, যেখানে বাইরের পুরুষদের প্রবেশাধিকার নেই সেখানে নারী শিষ্য ব্যতীত এবম্বিধ আদর্শ উপদেশ তথা জ্ঞান বিকিরণ কি করে সম্ভব? অন্যদিকে পর্দার খাতিরে বেগানা মেয়েলোকও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র অন্তঃপুরে সার্বক্ষণিক শিষ্যা হিসাবে

www.nagorikpathagar.org

থাকতে পারে না। সুতরাং মানব জাতির অর্ধেক নারী সমাজের বৃহত্তর কল্যাণেই বিভিন্ন গোত্রের বিভিন্ন বয়সের মহিলাকে নারী শিষ্য হিসাবে সুসঙ্গত জ্ঞানে পত্নীত্বে গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র হেরেমে আশ্রয় দানের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। তদুপরি একথাও সর্বজন স্বীকৃত যে, সাংসারিক এবং বাহ্যিক ঝামেলায় বিব্রত পুরুষের চাইতে স্মৃতিপটে কোন কিছু ধরে রাখার ক্ষমতা নারীদের অনেক বেশি। এছাড়াও সাধারণভাবে নারী সমাজে নারীজাতি তাদের পিতা, তাদের ভ্রাতা, শিক্ষক বা অন্য আত্মীয়দের চেয়ে তাদের স্বামীদের কথা ও কার্যাবলীর প্রতি অধিকতর মনোযোগী এবং তা বাস্তবায়নে অপেক্ষাকৃত আগ্রহী বলেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র উল্লিখিত নারী শিষ্যদেরকে অন্তঃপুরে আনয়ন করেছিলেন।

তদুপরি রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজগৃহে বসে প্রসঙ্গক্রমে যে সকল হাদীস বয়ান করতেন অথবা কালামে পাকের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতেন সে সমুদয় জ্ঞান বাণী স্মরণ রাখার জন্য পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ রয়েছে।

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ

আল্লাহ্ পাকের এই মহান নির্দেশ পালনের জন্য অহিযোগে প্রাপ্ত কালামে পাক তথা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র মুখনিঃসৃত বাণী রেকর্ড করার নিমিত্ত নবী হেরেমে নারী শিষ্যের প্রয়োজন ছিল অপরিহার্য এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র সহধর্মিণিগণই আল্লাহ্ পাকের আদেশে ও অনুমোদনে নিয়োজিত ছিলেন এ সম্পর্কিত বিধিবদ্ধ মুহাফিজ খানার ক্ষমতাপ্রাপ্ত রেকর্ড কিপার হিসাবে।

এত বড় দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত রেকর্ড কিপারদের জীবন যাত্রার মানোন্নয়নের জন্য তাঁদের প্রার্থনা সত্ত্বেও সীমিত বরাদ্দের অতিরিক্ত কোন ভাতার ব্যবস্থা করা হয়নি। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, খায়বর বিজয়ের আগে মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয় কিন্তু খায়বর বিজয়ের পর কামুস দুর্গের পতনের ফলে অগণিত 'গনীমাত'—মাল সম্পদ 'বায়তুল মালে' জমা হল এবং এর অংশ লাভ করায় যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের আর্থিক অবস্থারও বিরাট পরিবর্তন সাধিত হল। দেশ-বিদেশ থেকে হাদিয়া তোহফা আসতে শুরু করল। সমগ্র হিজাজ তথা আরবের রাজকর, খেজুর ও গমে মদীনার ধনাগার পরিপূর্ণ হয়ে গেল। এতদ্দর্শনে নবী সহধর্মিণিগণ নবম হিজরীতে ভাতা বৃদ্ধির আবেদন করলেন। কিন্তু সর্বকালের দুনিয়ার আদর্শ মহামানব ভোগ-বিলাসে অনাসক্ত আদর্শ রাষ্ট্রপতি তাদের এ দাবি নাকচ করে দিলেন এই কারণে যাতে তাঁরা

www.nagorikpathagar.org

দুনিয়ার আরাম-আয়েশ ভোগ-বিলাসের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পড়ে। এ কারণে উম্মুল মু'মিনীনদের অন্তরে অসন্তোষের সৃষ্টি হল।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও হযরত উমর (রা)-এর হস্তক্ষেপের ফলে হযরত আয়িশা (রা) ও হযরত হাফসা (রা) নিজ নিজ দাবি ত্যাগ করলেন। কিন্তু অন্য বিবিগণ তাঁদের মতে তাঁদের ন্যায়সঙ্গত দাবি পরিত্যাগ করতে রাযী হলেন না। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও তাঁর নীতিতে অটল থেকে ইলা বা অভিমান ব্রত পালন করলেন। ফলে বিবিগণ দমে গেলেন, দাবি প্রত্যাহার করলেন এবং আল্লাহ্র রাসূল (সা)-র নিকট নতি স্বীকার করলেন। এর পরেই আল্লাহ্ পাক কালামে পাকের আয়াত অবতীর্ণ করলেন;

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَ اُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلاً وَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا -

হে নবী, আপনার বিবিগণকে বলে দিন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন এবং এর সুখ-সৌন্দর্য কামনা কর তবে এসো আমি তোমাদের উত্তম রূপে এর সুফল প্রদান করত বিদায় করে দিই আর তোমরা এর ফল ভোগ কর; আর যদি তোমরা আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূল এবং আখিরাতকে চাও তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মধ্যে সতী সাধ্বীগণের জন্য অতীব মহান প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন।

এ আয়াতদ্বয়ে উম্মুল মু'মিনীনগণকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে থাকবার বা তাঁকে ত্যাগ করবার অধিকার প্রদান করা হয়েছিল। এ আয়াতদ্বয় নাজিল হবার ফলেই উম্মুল মু'মিনীনগণ সবাই অত্যন্ত লজ্জিত এবং অনুতপ্ত হলেন এবং আল্লাহ্র রাসূল (সা)-র সঙ্গে জীবন যাপনের স্থির সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করলেন। বলাবাহুল্য, এর পরে তাঁরা ব্যক্তিগত অভাব-অভিযোগ, দুঃখ-কষ্ট নিবারণের জন্য কোনদিন কোন কথাই বলেন নি।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা) বলেছেন, দুই মাস পর্যন্ত আমাদের দু'টি কালো জিনিস ব্যতীত অন্য কোন খাবার মিলতো না। একটা কালো পানি আর একটা কালো খেজুর। তেলের অভাবে ঘরে বাতি জ্বলতো না, কোন সুখের আশায় কোন জিনিসের মোহে তাঁরা উন্মত্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র সান্নিধ্যে ও সাহচর্যে মোতায়েন থাকতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র পূত ও পবিত্র সোহবতের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করে অনন্ত কালের জীবন প্রবাহ

www.nagorikpathagar.org

আখিরাতের পথ সহজ ও সুগম করার আশায়ই তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন, অন্য কোন আশায় নয়।

ঐতিহাসিক ও তাফসীরকারগণ বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে সকল বিবাহ করেছিলেন তা সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক ও অপরিহার্য রাজনৈতিক ভিত্তির উপর সুসম্পন্ন হয়েছিল। এর সাথে ভোগ বা ইন্দ্রিয়পরতার কোন সংশ্রব ছিল না। বিশেষত ঐ সকল পুণ্যবতী মহিলাও কোনরূপ পার্থিব সুখ-সম্ভোগের আশায় আল্লাহ্র রাসূলকে আত্মদান করেন নি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জগতের শেষ নবী এবং তাঁরই দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় মনোনীত ধর্ম ইসলামের পূর্ণতা সাধন করেছেন। সুতরাং জগতের পুরুষ জাতির ন্যায় তিনি সমগ্র নারী জাতিরও শিক্ষক ও ধর্মগুরু ছিলেন। কিন্তু পুরুষ জাতির মধ্যে নানা শ্রেণীর বহু লোক যেরূপভাবে তাঁর পবিত্র সংশ্রবে শিষ্যত্ব গ্রহণের সুযোগ লাভ করে ধন্য হয়েছিলেন, নারী জাতির মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র পবিত্র সহধর্মিণিগণ ব্যতীত অন্য কারো সেরূপ কোন সুযোগ সুবিধা ছিল না। কারণ ইসলামে পর নারীর সংশ্রব সম্পূর্ণ অবৈধ। পক্ষান্তরে পুরুষ জাতির ন্যায় বিভিন্ন রকমের নারী জাতির শারীরিক, মানসিক, বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ অবস্থা অবগত হয়ে তদনুযায়ী বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর পক্ষে একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। অথচ পর নারীর দেখা-সাক্ষাত করে তাদের শিক্ষাদীক্ষা দান করা সম্ভবপর ছিল না। কাজেই এই মহান উদ্দেশ্যেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত হয়ে বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন বয়স ও বিভিন্ন প্রকৃতির একাধিক মহিলাকে জাওযিয়াতে গ্রহণ করতে আদিষ্ট হয়েছিলেন এবং ঐ শুভ উদ্দেশ্য প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে এ সকল বিবাহ করেছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। ফলত ঐ সকল পবিত্রা, পুণ্যবতী মহিলা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র পত্নী হলেও আধ্যাত্মিক সম্পর্কে প্রকৃতপক্ষে তাঁরা সকলেই তাঁর একান্ত অন্তরঙ্গ ও অনুগত শিষ্যা ছিলেন এবং উত্তরকালে তাদের দ্বারাই স্বর্গীয় ইসলামে নারী জাতি বিষয়ক বিধি ব্যবস্থাসমূহ নিয়ন্ত্রিত হয়ে ইসলামী শরীয়তের পূর্ণতা সাধিত হয়েছিল।

আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক কারণে এবং নও-মুসলিমদের সামাজিক ও পারিবারিক শান্তি-শৃঙখলা রক্ষার জন্য নেহায়েত মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সুসঙ্গত বিবেচনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন এতগুলি বিয়ে করলেন তখন সাহাবীদের জন্যও একাধিক বিবাহ দূষণীয় ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে এবং তদীয় মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত মহানুভব সাহাবায়ে কিরাম (রা) তাঁদের শহীদী ভাইদের বিধবা স্ত্রীদের বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ করে য়াতিম সন্তানসহ আশ্রয়হীনা

www.nagorikpathagar.org

বিধবাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে তখনকার মুসলমান সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা, সামাজিক ও পারিবারিক ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখা কিছুতেই সম্ভব হত না। যে কোন দেশের যুদ্ধকালীন বা যুদ্ধোত্তর অবস্থায় দেশে জরুরী পরিস্থিতি দেখা দেয় এবং দারিদ্র, অভাব-অনটন ও জীবন ধারণ উপযোগী দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায় যার ফলে দারিদ্র নিপীড়িত সমাজে নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপ ঘটতে থাকে। এমনকি অনাথ অসহায় মেয়েরা সতীত্বের বিনিময়ে জীবিকা নির্বাহের পথ খুঁজে নেয়। আধুনিক জগতের তথাকথিত সুসভ্য জাতিসমূহের যুদ্ধকালীন জারজ শিশুদের সংরক্ষণ ও ভরণ-পোষণের ব্যবস্থার কথা চিন্তা করলেই উপরিউক্ত বিষয়টি আমাদের নিকট আরো পরিষ্কার হবে বলে আশা করি। পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এবং সুসঙ্গত কারণে একাধিক বিবাহ প্রথা বা প্রবণতা ইসলামের মত যদি অন্যান্য জাতির মধ্যেও প্রচলিত থাকত, তাহলে যুদ্ধে নিহত সৈনিকদের অসহায় স্ত্রীগণ বা তৎপ্রতি নির্ভরশীল মেয়েদের নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপের অনুসরণ করতে হত না। ইসলামের কল্যাণকর একাধিক বিবাহ প্রথার ফলেই মুসলিম জাহানে কস্মিনকালেও কেউ 'যুদ্ধকালীন জারজ সন্তানের' আবিষ্কার করতে পারেনি আর পারবেও না।

রাসূলে পাকের হুলিয়া

আল্লাহ্‌র প্রিয় রাসূল (সা) অতীব সুন্দর, সুশ্রী ও সুদর্শন ছিলেন। তাঁর দেহের গঠন ছিল মধ্যম আকৃতির। দেহের রং লাল-সাদা মিশ্রিত গৌরবর্ণ উজ্জ্বল ও সুশ্রী ছিল। বক্ষ মুবারক প্রশস্ত ও পীনোন্নত। সুপ্রশস্ত ললাট ও উন্নত নাসিকা দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। মুক্তা পংক্তি সদৃশ উজ্জ্বল ও শুভ্র দন্তরাজি, আকর্ণ বিস্তৃত নয়ন যুগল, শারদীয় চন্দ্রতুল্য উজ্জ্বল মুখমণ্ডল, দীর্ঘ ও কুঞ্চিত কেশদাম দর্শন করলেই মানুষের মন ভক্তিতে গলে যেত। আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব অতিশয় স্থূলও ছিলেন না আবার অতি ক্ষীণকায়ও ছিলেন না। মুবারক জবানের বাক্যে সুধা বর্ষণ হত, যেই শুনত সেই মোহিত ও বিমুগ্ধ হয়ে যেত।

তাঁর গম্ভীর চেহারা দর্শন মাত্রই হৃদয়ে ভয় মিশ্রিত ভক্তিভাবের উদয় হত। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র মুবারক চেহারাই সৌভাগ্যের সাক্ষ্য বহন করত। এ মহামানবের যাবতীয় লক্ষণ তাঁর মুবারক দেহে পূর্ণ মাত্রায় বিরাজ করত। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যস্থলে একটা মাংসের পিণ্ড ছিল যা কবুতরের ডিম্বাকৃতি দেখা যেত, এটাই ছিল মোহরে নবুওত।

www.nagorikpathagar.org

হযরত আবদুল্লাহ বিন সালাম (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখেই বলে উঠেছিলেন, আল্লাহ্র কসম! এরূপ চেহারা আল্লাহ্র রাসূল ব্যতীত অন্য কারো হতে পারে না।

যাবির বিন সামুরাহ (রা) বলেন, আমি এক রাতে আকাশের পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকিয়েছিলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র মুখ চন্দ্রিমার দিকে তাকিয়েছিলাম, আমি চন্দ্রের থেকেও তাঁর মুবারক চেহারা অধিক সৌন্দর্যশালী দেখতে পেলাম। মুবারক দেহের ঘর্ম মেস্ক আম্বর হতেও অধিক সুগন্ধ যুক্ত ছিল। মুবারক চেহারার উপরে ঘর্মবিন্দু মতির ন্যায় দৃষ্ট হত। মুবারক দেহের চর্ম অত্যধিক কোমল ও মোলায়েম ছিল।

হযরত আনাস বিন মালিক (রা) বলেন, আমি এমন কোন রেশম ও মখমল স্পর্শ করিনি যা মুবারক হাতের চেয়ে কোমল হতে পারে। এমন কোন মেস্ক আম্বরের ঘ্রাণ আমি পাইনি যা মুবারক দেহের ঘর্ম হতে অধিক সুগন্ধ হতে পারে।

মাথার চুল অধিকাংশ সময় কাঁধ পর্যন্ত ঝুলে থাকত। চুলে সর্বদা তেল মাখাতেন এবং চিরুণী দ্বারা আঁচড়াতেন। মুবারক দাড়ি কিছু কিছু সাদা হয়ে গিয়েছিল। রাস্তায় চলবার সময় এমন শক্তির সঙ্গে চলতেন যে, শুনলে মনে হত যেন কোন কিছু উপর হতে নিম্নে পতিত হচ্ছে।

কথা বলার সময় থেমে থেমে এক একটি শব্দ পৃথক পৃথক করে বলতেন। যাতে শ্রবণকারী পরিষ্কার বুঝতে পারে এবং স্মরণ করে রাখতে পারে। অধিকাংশ সময় একেকটি কথা তিন তিন বার করে বলতেন। যে কথাটা অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ হত তা বারবার বলে তার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়ে দিতেন। কথা বলার সময় প্রায়ই দৃষ্টি উপরের দিকে থাকত। কণ্ঠস্বর উচ্চ ছিল। বিনা প্রয়োজনে কখনো কথা বলতেন না। হাসতেন অনেক কম যদিও বা কখনো হাসতেন তবে নিঃশব্দে হাসির আভা মুখে প্রকাশ পেত মাত্র।

পোশাক-পরিচ্ছদ

পোশাক অধিকাংশ সময়ে চাদর, গায়ের জামা ও লুঙ্গি হত। পাজামা ব্যবহার করেছেন এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, তবে এক বর্ণনায় পাওয়া যায় মিনার বাজারে পাজামা খরিদ করেছিলেন।

মুজা সব সময় ব্যবহার করতেন না। তবে বাদশা নাজ্জাশী যে মুজা হাদিয়া প্রেরণ করেছিলেন তাই তিনি অধিক সময় ব্যবহার করতেন। অধিকাংশ সময় কালো পাগড়ি ব্যবহার করতেন। পাগড়ির নিচে টুপি অবশ্যই থাকতো। আর

www.nagorikpathagar.org

বলতেন আমাদের মধ্যে আর মুশরিকদের মধ্যে এই ব্যবধান—তারা পাগড়ির নিচে টুপি ব্যবহার করে না। উঁচু টুপি কখনো ব্যবহার করতেন না, এমন টুপি ব্যবহার করতেন যা গোলাকার এবং মাথার সঙ্গে লেগে থাকত। কম্বল ব্যবহার করতেন, সাদা কাপড় অধিক পছন্দ করতেন। লাল রংয়ের কাপড় কখনো ব্যবহার করতেন না। রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করতে পুরুষকে নিষেধ করেছেন। সুগন্ধি অত্যন্ত ভাল বাসতেন এবং পুরুষের সুগন্ধি রংবিহীন হবে, মেয়েদের সুগন্ধিতে রং থাকবে কিন্তু সুগন্ধ থাকবে না। হুযূর (সা)-র বিছানা খেজুরের পাতাপূর্ণ একটা তোষক ছিল; তার উপরে শয়ন করতেন; মুবারক দেহে দাগ পড়ে যেত।

রসূলে পাক (সা)-এর আহার

রাসূলুল্লাহ্ (সা) অধিক স্বাদযুক্ত খানা গ্রহণ করতেন না। সিরকা, মধু, হালুয়া, যয়তুনের তেল, লাউ তিনি অধিক পসন্দ করতেন।

গোশ্‌তের মধ্যে মুরগী, কবুতর, দুম্বা, বকরী, মেষ, উট, খরখোশ এবং মাছ। বকরীর সম্মুখের দুই রানের গোশত অধিক পসন্দ করতেন। শুধু দুগ্ধ কখনো পান করতেন, কখনো পানি মিশ্রিত করে নিতেন। খানা দস্তরখানের উপরে খেতেন। কখনো খানার নিন্দা করতেন না। সামনে যে খানা উপস্থিত করা হত পসন্দ হলে গ্রহণ করতেন, না হয় বাদ দিতেন। খানার নিন্দা করতেন না।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

রাসূলুল্লাহ্ (সা) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অত্যধিক ভালবাসতেন। সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতেন এবং অন্যকেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার জন্য উপদেশ দিতেন। এক ব্যক্তিকে ময়লা কাপড় পরিধান করতে দেখে বললেন, তুমি কি কাপড় পরিষ্কার করতে পার না ? তোমার পরিধানের বস্ত্র পরিষ্কার করে নিও। একজন ধনী লোকের পরিধানে অল্প মূল্যের পোশাক দেখে বললেন, তোমার কি এমন সামর্থ্য নেই যদ্দ্বারা মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরি করে ব্যবহার করতে পার ? আল্লাহ্ যখন নিয়ামত দান করেছেন, তখন তোমার কর্তব্য আল্লাহ্‌র্ নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

অন্ধকার যুগে আরবের লোকেরা নোংরা প্রকৃতির ছিল। তারা মসজিদের দেওয়ালে থুথু নিক্ষেপ করত। আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) নিজের মুবারক হস্ত দ্বারা তা পরিষ্কার করতেন এবং এরূপ করতে নিষেধ করতেন।

একদিন শুক্রবারে এক ঘটনা ঘটে গেল। লোকেরা সাংসারিক কাজকর্মে লিপ্ত ছিলেন। সেই অবস্থায়ই ঘর্মাক্ত দেহে এবং পোশাকে নামাযের জন্য

www.nagorikpathagar.org

মসজিদে আগমন করলেন, একারণে সমগ্র মসজিদ দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। সেই দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের হুকুম করলেন শুক্রবারে গোসল না করে কেউ মসজিদে আগমন করো না।

অন্ধকার যুগে আরবের লোকদের দস্তুর ছিল তারা রাস্তার উপরেই পেশাব-পায়খানা করতো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই কাজ খুব অপসন্দ করতেন। একারণে তাদের এরূপ করতে নিষেধ করতেন। দুর্গন্ধযুক্ত দ্রব্য যেমন কাঁচা পিঁয়াজ, রসুন ভক্ষণ করে মসজিদে গমন করতে নিষেধ করেছেন।

সাওয়ারী শওক

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘোড়ায় আরোহণ করতে খুব পসন্দ করতেন। গাধা, খচ্চর, এবং উষ্ট্রীর পৃষ্ঠেও আরোহণ করতেন। মদীনা শহরের বাইরে একটা প্রকাণ্ড ময়দান ছিল যার পরিধি ছিল ছয় মাইল। সেখানে ঘোড় দৌড়ের প্রতিযোগিতা হত। একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোকদের সঙ্গে ঘোড় দৌড়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র ঘোড়াই সকলের ঘোড়ার অগ্রে গমন করেছিল। তাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বহু আনন্দিত হয়েছিলেন। উষ্ট্রের দৌড় প্রতিযোগিতাও হত। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র উষ্ট্র আল কাছওয়া যাকে আযবাও বলা হত যা প্রতিযোগিতায় সকলের অগ্রগামী থাকত।

সময়ের মূল্যবোধ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাত এবং দিনকে তিন ভাগ করে নিয়েছিলেন। এক ভাগ আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন, দ্বিতীয় অংশ আল্লাহ্র মাখলুকের খিদমতের জন্য, তৃতীয় ভাগ নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করবার জন্য ব্যয় করতেন। ফজরের নামাযের বাদে জায়নামাযের উপরেই উপবেশন করতেন এবং সূর্যোদয়ের পরই নবুওতি দরবার বসতো। লোকেরা এসে মুবারক খিদমতে উপস্থিত হতেন আর তিনি তাদের সদুপদেশ দান করতেন।

কেউ কোন স্বপ্ন দেখে থাকলে তিনি তার ব্যাখ্যা করতেন কখনো বা নিজের স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে শুনাতেন। এরপর বিবিধ বিষয়ের আলোচনা চলতে থাকতো। যখন সূর্য কিরণ প্রখর হয়ে উঠত তখন চাশতের নামায কখনো চার রাকআত আবার কখনো আট রাকআত আদায় করতেন। এর পরে গৃহে প্রত্যাবর্তন করতেন। নিজের পরিধানের বস্ত্র নিজে পরিষ্কার করে নিতেন। নিজের কাপড়, জুতা নিজের মুবারক হাতে সেলাই করে নিতেন।

আসরের নামাযের বাদে পবিত্র বিবিগণের গৃহে গমন করতেন এবং প্রত্যেকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত এবং আলাপ-আলোচনা শেষ করে আবার

www.nagorikpathagar.org

মসজিদে গমন করতেন। ইশার নামাযের পরে শয়ন করতেন, ইশার নামাযের পরে আর কারো সঙ্গে কোন কথাবার্তা বলতেন না। শয্যা গ্রহণের পূর্বে কুরআন পাকের কিছু অংশ পাঠ করতেন। এবং এই দোয়া পাঠ করে শয্যা গ্রহণ করতেন—আল্লাহুম্মা বি ইসমিকা আমুতু ওয়া আহ্ইয়া অর্থাৎ হে আল্লাহ্ তোমার নামে মরছি আবার তোমার নামে জীবিত হব।

ঘুম হতে জাগ্রত হয়ে পাঠ করতেন—আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আহ্ইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন্নুশূর। সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র যিনি মৃত্যুর পরে জীবিত করেছেন এবং তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

সর্বদাই ডানদিকে কাত হয়ে ডান হাত চোয়ালের নিচে রেখে শয়ন করতেন। বিছানার কোন বন্দোবস্ত ছিল না, কখনো বিছানার উপরে, কখনো শুষ্ক চর্মের উপরে আবার কখনো শুধু মাদুরের উপরে শয়ন করতেন।

কখনো অর্ধরাত্রে, কখনো শেষ রাত্রে শয্যা ত্যাগ করতেন। মিসওয়াক শিয়রেই থাকত। শয্যা ত্যাগ করে প্রথমেই মিসওয়াক করতেন। পরে ওযূ করতেন এবং আল্লাহ্র ইবাদতে মশগুল হতেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা) বলেছেন, যখন সূরা মুজাম্মিলের প্রথম অংশ অবতীর্ণ হয় তখন এত দীর্ঘ সময় নামাযে দণ্ডায়মান থাকতেন যে, মুবারক কদম ফুলে যেত। এক বছর পরে যখন বাকি অংশ অবতীর্ণ হয় তখন রাত্রি জাগরণ কিছু কম করতেন।

ফজরের আযান হবার সঙ্গে সঙ্গে মসজিদে গমন করতেন এবং সুন্নাত নামায ছোট কিরাতের দ্বারা পাঠ করতেন এবং ফরয নামাযের দুই রাকআতে কিরাত লম্বা করতেন।

দরবারে নববী

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র মজলিসে লোকেরা পূর্ণ আদবের সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ করে নামাযের অবস্থায় উপবেশন করতেন। সর্বপ্রথম তিনি লোকদের প্রয়োজনের কথা জিজ্ঞাসা করতেন, যদি কেউ কোন প্রকার প্রয়োজনের কথা প্রকাশ করত তবে তার প্রয়োজন পূর্ণ করে দিতেন। অন্য সকল লোক অবনত মস্তকে আদবের সঙ্গে বসে থাকতেন। এবং কেউ কথাবার্তা বলতে থাকলে তার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্য কেউ কথাবার্তা বলতেন না, অন্য সবাই চুপ করে শুনতে থাকতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজেও কখনো কারো কথায় বাধা দিয়ে কথা বলতেন না। অন্য কেউ এরূপ করলে তাকে নিষেধ করতেন। কেউ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে তিনি তা গ্রহণ করতেন।

www.nagorikpathagar.org

রাসূলুলাহ্ (সা)-র দরবারে হাসি-তামাসাও চলত, কিন্তু তা আদবের সঙ্গে। কোন গোত্রের সম্মানিত লোক আগমন করলে তিনি তাঁর সম্মান করতেন এবং বলতেন প্রত্যেক সম্মানিত লোকের সম্মান করো। কাউকেও অভিবাদন জানাবার জন্য দাঁড়াতে নিষেধ করতেন, অবশ্য অত্যধিক মহব্বতের জন্য নিজে কখনো কখনো দাঁড়িয়ে যেতেন। হযরত হালিমা (রা)-র সম্মানের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) দাঁড়িয়েছিলেন এবং বসবার জন্য নিজের মুবারক চাদর বিছিয়ে দিয়েছিলেন।

সাহাবীদের নিষেধ করতেন যে, কারো কোন দুর্নাম এবং দোষ আমার নিকট প্রকাশ করো না। আমি চাই দুনিয়া থেকে বিদায়ের সময় প্রত্যেকের সম্বন্ধে সুধারণা নিয়ে বিদায় হই।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র শারাফাত

আরবের লোকেরা সমগ্র দুনিয়ার মধ্যে নিজেদেরকে শরীফ বলে মনে করে। তারা দুনিয়ার মধ্যে অন্য কাউকে নিজেদের সমকক্ষ বলে মনে করে না। সমগ্র আরবের মধ্যে দু'টি গোত্রই সমধিক সম্মানিত ছিল। এক. কুরাইশ গোত্র যে গোত্রে রাসূলুলাহ্ (সা) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দুই. হাওয়াজিন যার এক শাখা বনী সায়াদ নামে পরিচিত যেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রতিপালিত হয়েছিলেন। এ কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) দুনিয়ার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শরীফ ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র ভাষণ

রাসূলুলাহ্ (সা) সাদাসিধাভাবে লোকদের সম্মুখে ভাষণ দান করতেন। কখনো মুবারক হাতে একখানা লাঠি থাকত, কখনো বা কামানের উপর টেক লাগিয়ে ভাষণ দান করতেন। প্রয়োজন মত কখনো ভাষণ দীর্ঘ করতেন, অধিকাংশ সময়ে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রদান করতেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বক্তৃতায় কখনো কঠিন শব্দ ব্যবহার করতেন না, যাতে লোকদের বুঝতে সহজ হয়। বক্তৃতা হামেশা প্রশ্নের আকারে শুরু করতেন, বক্তৃতার মধ্যে কণ্ঠস্বর উচ্চ এবং চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করত। অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করতেন, দেখলে মনে হত যেন যুদ্ধ ক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা করছেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র চরিত্র

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যা বলতেন নিজে তার পূর্ণাঙ্গ নমুনা হতেন। সাধারণ মাহফিলে যা বলতেন অন্যান্য সময়ও ঠিক তাই দেখতে পাওয়া যেত। তিনি

www.nagorikpathagar.org

স্বভাব-চরিত্র, কাজকর্ম এবং কথাবার্তা সম্পর্কে লোকদের যা শিখাতেন, প্রথমে নিজেই তার পূর্ণাঙ্গ আমলি নমুনা বনে যেতেন। লোকেরা উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা)-র নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, হুযূর (সা)-র চরিত্র কেমন ছিল? হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা) বললেন, তুমি কি কুরআন পড় নি? যা কিছু কুরাআনে আছে, তাই তাঁর মুবারক চরিত্র। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র জীবনটাই কুরআন অনুযায়ী গঠন করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র চরিত্রই যেন বাস্তব কুরআন। কুরআনই এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করেছে, হে রাসূল (সা) নিশ্চয় আপনি সুন্দর চরিত্র ও মর্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত।

হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা) নবুওত লাভের পূর্বে ও পরে পঁচিশ বছর পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র মুবারক সোহবতে কালাতিপাত করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। নবুওতের প্রথমে এই কথা বলে সান্ত্বনা প্রদান করতেন—আল্লাহ্র কসম তিনি আপনাকে হালাক করবেন না। কারণ আপনি আত্মীয়ের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে থাকেন, আত্মীয়-স্বজনদের হক আদায় করে থাকেন, অভাবগ্রস্তের অভাব মোচন করে থাকেন, ঋণগ্রস্তের ঋণের বোঝা হালকা করে থাকেন, আশ্রয়হীনকে আশ্রয় দিয়ে থাকেন, গরীবের সাহায্য করে থাকেন, বিপদের সময় মানুষের বিপদ উদ্ধার করে থাকেন।

হযরত আলী (রা) নবুওতের পূর্ব থেকে শেষ পর্যন্ত মুবারক খিদমতে অতিবাহিত করেন। তিনি কড়া মেজাজী ও কঠোর ভাষী ছিলেন না, তিনি কারও সঙ্গে কঠোর ব্যবহার করেন নি। নিজের অন্তর থেকে তিনটি জিনিস একেবারেই দূরীভূত করে দিয়েছিলেন। তর্কবিতর্ক, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলা, নিষিদ্ধ কাজ এবং কথার পিছনে পড়া।

রাসূলে আকরাম (সা) কোন মানুষকে খারাপ বলতেন না, কারও ভুলত্রুটি ও দোষ-গুণ অনুসন্ধান করতেন না। এরূপ কাজ এবং কথার থেকে দূরে থাকতেন যার দ্বারা কেউ উপকৃত হতে না পারে। কারো মুখে নিজের প্রশংসা শুনতে পছন্দ করতেন না।

বদান্যতা বা দানশীলতা

যতদূর সম্ভব কেউ কিছু প্রার্থনা করলে ফিরিয়ে দিতেন না। নিজে অনাহারে থেকে মেহমানকে খানা খাওয়াতেন। ধন-সম্পদ পুঞ্জীভূত করে রাখতেন না। একদিন রাত্রে ঘরে একটা দিনার (রাবির ভুল হতে পারে) অথবা একটা দিরহাম জমা ছিল যার কারণে রাত্রে তাঁর ঘুম হচ্ছিল না, তা তৎক্ষণাৎ দান করে শয্যা গ্রহণ করলেন।

www.nagorikpathagar.org

মেহমানদারি

আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) মেহমানদারিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। মুসলমান অমুসলমান সকলেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র ঘরে মেহমান হতো। হুযূর (সা) সকলকেই পরম সমাদরে গ্রহণ করতেন। কখনো এমন ঘটনাও ঘটে যেত—ঘরে যা কিছু থাকত মেহমানকে খাইয়ে ঘরের সকলকে অনাহারে থাকতে হত। একদিনকার ঘটনা, এক রাতে একজন অমুসলমান মেহমান আসল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। কারণ সকল সাহাবীই তাকে জানতেন। এ কারণে কেউ তাকে গ্রহণ করলেন না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে দুগ্ধ পান করতে দিলেন এবং সে একে একে সাতটি বকরীর দুগ্ধ পান করলো। ঐ রাতে ঘরের সকলকেই অনাহারে রাত যাপন করতে হল। রাতে উঠে মেহমানের দেখাশুনাও করতেন।

নিজের হাতে কাজ করা

রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের সাংসারিক কাজকর্ম নিজের মুবারক হাতের দ্বারা করতেন, যদিও তাঁর অসংখ্য জাননিছার খাদিম সবসময় উপস্থিত থাকতেন। নিজের পরিধানের বস্ত্রে নিজের হাতে তালি লাগাতেন, নিজের জুতা নিজেই সেলাই করতেন, ঘর পরিষ্কার করতেন, উষ্ট্র এবং বকরীর দুগ্ধ দোহন করতেন। উট, ঘোড়া প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তুকে খেতে দিতেন।

লোকদের কাজের হুকুম করতেন না বরং নিজেই করতেন। মসজিদে নববী নির্মাণের সময় নিজে সাহাবীদের সঙ্গে শ্রমিকের ন্যায় কাজ করেছেন। পরিখার যুদ্ধের সময় সাহাবীদের সঙ্গে নিজে মাটি খনন করেছেন, এমনকি মাটি বহন করতে করতে মেরুদণ্ড বাঁকা হয়ে গিয়েছিল।

ন্যায় বিচার

মাখযুম গোত্রের একজন মেয়েলোক চুরির অপরাধে ধরা পড়লে তাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র দরবারে উপস্থিত করা হল। রাসূলুল্লাহ্ তার হাত কাটার নির্দেশ দিলেন। হুযূর (সা) উসামা (রা)-কে খুবই স্নেহ করতেন। লোকেরা ইচ্ছা করলেন হয়ত হযরত উসামার দ্বারা সুপারিশ করালে হাত কাটার হুকুম বন্ধ হতে পারে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমরা আল্লাহ্‌র হুকুম রদ করাবার জন্য সুপারিশ করাতে চাও। তোমাদের পূর্বে বহু জাতি এই অপরাধের জন্য ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তারা কোন ধনবান এবং সম্ভ্রান্ত লোক অপরাধ করলে ছেড়ে দিত। কোন দরিদ্র হীন মর্যাদাসম্পন্ন লোক অপরাধ করলে তাকে শাস্তি দিত।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ্র কসম! যদি মুহাম্মদ-এর কন্যা ফাতিমাও চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত হত তবে তারও হাত কাটা হত।

বদরের যুদ্ধে অন্যান্য লোকের সঙ্গে হুযূর (সা)-র চাচা হযরত আব্বাস (রা) বন্দী হয়েছিলেন। যুদ্ধ বন্দীদের নিকট হতে মুক্তিপণ গ্রহণ করে মুক্তি দেয়া হয়েছিল। কিছু সংখক আনসার সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি হুকুম করুন আপনার চাচাকে বিনাপণে মুক্ত করে দিই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এক দিরহামও কম নেয়া হবে না।

রাসূল (সা) সাহসী ছিলেন

হযরত আনাস (রা) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) সকলের চাইতে নির্ভীক ও দুঃসাহসী ছিলেন। এক সময় মদীনায় গুজব ছড়িয়ে গেল যে, শত্রুসেনা আগমন করেছে। সাহাবীরা যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হতে লাগলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করে শত্রুর সন্ধানে বের হলেন। অশ্বপৃষ্ঠে জিন লাগাবারও অপেক্ষা না করে শত্রুর সন্ধানে বের হয়ে গেলেন। যে সমস্ত পথে দুশমনের আগমনের আশঙ্কা ছিল, সে সমস্ত পথে টহল দিয়ে দুশমনের কোন সন্ধান না পেয়ে অবশেষে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে লোকদের জানিয়ে দিলেন—কোন আশংকা নেই, দুশমন আগমন করে নি।

উহুদের প্রান্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র উপরে বৃষ্টির মত যখন অস্ত্রের বৃষ্টি বর্ষণ হতে থাকে তখনও তিনি নিজের জায়গা ছেড়ে এক কদমও হটে আসেন নি। সমস্ত সাহাবী যখন কাফিরের আক্রমণের বেগ সহ্য করতে না পেরে পলায়ন করছিলেন তখনও রাসূলুল্লাহ্ (সা) হিমাদ্রি অনড় অচল অবস্থায় দাঁড়িয়েছিলেন। তবুও কারো উপরে অস্ত্র নিক্ষেপ করেননি।

উহুদের প্রান্তরে সাংঘাতিক রূপে আঘাতপ্রাপ্ত হলেন, মুবারক দান্দান শহীদ হয়ে গেল, তখনও বলছিলেন, হে আল্লাহ্ এদের মাফ করে দাও এবং তাদের সোজা পথে চালাও, যেহেতু এরা আমাকে চিনেনি।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র উপদেশ

১. যে আল্লাহ্কে রব, ইসলামকে জীবন বিধান, মুহাম্মদকে নেতা মেনে নিয়েছে সে ঈমানদার (মুসলিম)।

২. আল্লাহ্র জন্য ভালবাসা ও আল্লাহ্র জন্য দুশমনি রাখা উত্তম আমল। (মিশকাত)

www.nagorikpathagar.org

৩. মিথ্যাবাদী, ওয়াদা ভঙ্গকারী, আমানতের খেয়ানতকারী পূর্ণ মু'মিন নয়। (মিশকাত)
৪. মুসলমান ঐ ব্যক্তি যার হাত এবং যবান থেকে মুসলমান নিরাপদে থাকে। (মুসলিম)
৫. ঈমানের আলামত ভাল কাজে খুশি হওয়া, মন্দ কাজে দুঃখ অনুভব করা। (মিশকাত)
৬. বড় গোনার কাজ হল আল্লাহ্র সঙ্গে কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে শরীক করা, পিতা-মাতার নাফরমানি করা, অকারণে হত্যা করা, মিথ্যা কসম করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। (বুখারী)
৭. মুনাফিকের চার আলামত—মিথ্যা কথা বলা, আমানতের খিয়ানত করা, ওয়াদা ভঙ্গ করা, লোকের সঙ্গে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করা।
৮. যিনা হারাম (কবিরা গোনাহ) আর যিনা বিভিন্ন প্রকারে হয়ে থাকে। চোখের যিনা, গায়ের মুহাররেম মেয়েলোক দেখা (যে সমস্ত মেয়ে লোক বিয়ে করা জায়েয তাদের গায়ের মুহাররেম বলা হয়)। কামভাবে দর্শন করা, কানের যিনা—বেগানা মেয়ে লোকের কাম কলুষিত বাক্য শ্রবণ করা, মুখের যিনা—কোন মেয়ে লোকের সঙ্গে কামভাবে বাক্যালাপ করা, হাতের যিনা—বেগানা মেয়ে লোককে কামভাবে স্পর্শ করা, পায়ের যিনা—যিনার দিকে হেঁটে চলা। (মুসলিম)
৯. একটা লোকের মিথ্যাবাদী হবার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে শোনা কথা তাহকিক না করে বলে বেড়ায়। (মুসলিম)
১০. পূর্ণ মু'মিন হবার জন্য শর্ত মানুষের কামনা বাসনা এই হুকুম অনুযায়ী হয়ে যাওয়া, যা নিয়ে আমি অবতীর্ণ হয়েছি। (অর্থাৎ কুরআন) (মিশকাত)
১১. হে আমার বেটা আনাস! যদি তুমি পার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এভাবে অতিবাহিত করতে যেন কারও প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ না হয় তবে এরূপই কর। কেননা এ হচ্ছে আমার তরিকা, যে আমার তরিকা পসন্দ করবে সে আমার সঙ্গে জান্নাতে অবস্থান করবে। (তিরমিযী)
১২. যে হালাল খানা ভক্ষণ করল এবং কাউকেও দুঃখ-কষ্ট দিল না সে জান্নাতী। একজন বললেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! এ রকম লোকতো বর্তমানে অনেক আছে। তিনি বললেন, হ্যাঁ আমার পরেও এরূপ লোক থাকবে। (তিরমিযী)
১৩. যে ব্যক্তি ভাল কাজের পথপ্রদর্শন করবে তার জন্যও ভাল কাজকারীর অনুরূপ সওয়াব মিলবে। (মুসলিম)

www.nagorikpathagar.org

১৪. ইল্‌ম শিক্ষার জন্য ঘর থেকে বের হওয়া আল্লাহ্‌র রাস্তায় বের হওয়ার সমান। (তিরমিযী)

১৫. যদি কেউ কারো কাছে কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করে এবং সে জানা সত্ত্বেও না বলে তবে কিয়ামতের দিন তার মুখে অগ্নির লাগাম লাগান হবে। (ইবনে মাযাহ)

১৬. আল্লাহ্‌ ঐ বান্দার উপর খুশি হবেন যে আমার পক্ষ থেকে কোন কথা শোনার পরে সে অন্যের নিকট পৌছে দেয়। (তিরমিযী)

১৭. মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারী যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে অনুসন্ধান করে। (ইবনে মাযাহ)

১৮. যে আলিমের ইল্‌মের দ্বারা উপকৃত হয়নি তার উদাহরণ ঐ ধন ভাণ্ডারের মত যার থেকে আল্লাহ্‌র পথে খরচ করা হয়নি। (মিশকাত)

১৯. আল্লাহ্‌ ঐ ব্যক্তির উপর অভিসম্পাত প্রদান করেন যে লোক চলার পথে, বসার জায়গায় প্রস্রাব ও পায়খানা করে। (মুসলিম)

২০. হে উমর কখনও দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করো না। (ইবনে মাযাহ)

২১. মিসওয়াক দ্বারা মুখ পরিষ্কার হয় এবং আল্লাহ্‌ খুশি হন। (নাসায়ী)

২২. যখন তুমি ওযূ কর এবং পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান কর তখন তোমার দক্ষিণ হাত দ্বারা শুরু কর। (মুসলিম)

২৩. পুকুরে অথবা বদ্ধ পানিতে কখনও প্রস্রাব করো না। (মুসলিম)

২৪. তিন কাজ করতে মোটেই বিলম্ব করো না, যখন নামাযের সময় হয়, মুর্দাকে দাফন করতে, অবিবাহিতা মেয়ের বিবাহ দিতে যখন উপযুক্ত সম্বন্ধ মিলে যাবে। (তিরমিযী)

২৫. যে মেয়েলোক সুগন্ধি ব্যবহার করে লোক সমাজে চলাফেরা করে সে ব্যভিচারিণীর সমান। (তিরমিযী)

২৬. তিনটা কাজ করা জায়েয নেই ঃ ক. সমাজের ইমাম, যে দুয়া করার সময় সমাজকে ভুলে নিজের জন্য দুয়া করে, খ. বিনা হুকুমে কারও গৃহে প্রবেশ করা, গ. পেশাব পায়খানা না সেরে নামায আদায় করা। (মিশকাত)

২৭. তিন ব্যক্তির নামায কবূল হয় না ঃ ঐ ইমাম যার উপরে অধিকাংশ মোক্তাদি অসন্তুষ্ট থাকে, ঐ মেয়ে লোক যার স্বামীকে অসন্তুষ্ট রেখে একটি রাত্র যাপন করে, ঐ দুই ভ্রাতা যারা নিজেদের মধ্যে দুশমনি রাখে। (ইবনে মাযাহ)

www.nagorikpathagar.org

২৮. ইমামের কর্তব্য নামায সংক্ষেপ করা। অর্থাৎ ছোট কিরাত পাঠ করা, কেননা জামাআতে বৃদ্ধ লোক থাকে, ব্যধিগ্রস্ত লোকও থাকতে পারে এবং দুর্বল লোকও থাকে। একাকীর সময়ে তার ইচ্ছা। (মুসলিম)

২৯. আল্লাহ্‌র কাছে ঐ আমল অধিক পসন্দনীয় যা সকল সময়ে করা যায়, যদিও তা সামান্য হয়। এই হুকুম শুধু নফলের সময় ফরযের বেলায় নয়। ফরয আল্লাহ্‌র নির্ধারিত হুকুম, অবশ্যই তা ঠিকমত পালন করতে হবে। (বুখারী)

৩০. কোন মুসলমানের জন্য কর্তব্য নয় যে, জুমআর দিনে জুমআর নামাযে তার ভ্রাতাকে তার জায়গা হতে হটিয়ে সে নিজে সেখানে বসে বরং একটু খানি সরে বসার জন্য অনুরোধ করতে পারে। (মুসলিম)

৩১. রোগীর শুশ্রূষা কর, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান কর, কয়েদীকে কয়েদ মুক্ত কর । (বুখারী)

৩২. যখন তুমি কোন ব্যধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখতে যাও তখন তাকে সান্ত্বনা দান কর, তার পেরেশানী দূর কর। (ইবনে মাযাহ্)

৩৩. যখন কেউ রোগীর শুশ্রূষা করতে যায় তখন সে আল্লাহ্‌র রহমতের মধ্যে ডুবে যায়। (মিশকাত)

৩৪. মৃত্যু কামনা করো না, কেননা তুমি যদি নেককার হও তবে আগামীতে তোমার নেকী আরও বেড়ে যাবে। আর যদি গুনাহগার হও তবে হতে পারে আগামীতে নেককার হয়ে যাবে। (বুখারী)

৩৫. দুনিয়ায় এমনভাবে থাক যেমন মুসাফির থাকে। যখন সকাল হয় সন্ধ্যার আশা করো না, সুস্থতাকে অসুস্থতার পূর্বে, জীবনকে মৃত্যুর পূর্বে মূল্যবান মনে কর। (বুখারী)

৩৬. যখন জানাযা দেখ তখন দাঁড়িয়ে যাও, আর যখন সঙ্গে চলো তখন ঐ সময় পর্যন্ত উপবেশন করো না যত সময় পর্যন্ত জানাযা মাটির উপরে রাখা না হয়। (মুসলিম)

৩৭. মরা মানুষের নিন্দা করো না কারণ সে যদি ভাল হয় তবে তার যাযা পেয়ে গিয়েছে। আর যদি মন্দ হয় তবে তার সাজা ভোগ করছে। (মিশকাত)

৩৮. মৃত লোকের উত্তম কার্যগুলি প্রকাশ কর আর খারাবীকে গোপন করে রাখ। (তিরমিযী)

৩৯. মুসলমানদের মধ্যে দু'টি স্বভাব থাকতে পারে না—কৃপণতা ও অসচ্চরিত্রতা। (তিরমিযী)

www.nagorikpathagar.org

৪০. আল্লাহ্র বন্দেগী কর, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান কর, উচ্চ শব্দে সালাম কর, শান্তির সঙ্গে বেহেশতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযী)

৪১. দরিদ্রের সাহায্যের দ্বারা আল্লাহ্র ক্রোধ ঠাণ্ডা হয়, মৃত্যুর যন্ত্রণা দূর হয়। (তিরমিযী)

৪২. উত্তম দান ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করা, চাই সে মুসলমান হোক আর অমুসলমান হোক। (মিশকাত)

৪৩. যে ব্যক্তি খারাপ মাল বিক্রি করার সময় তার খারাপীটা প্রকাশ না করে গোপন করে রাখে সে হামেশা আল্লাহ্র আযাবের মধ্যে থাকবে। ফেরেশতাগণ তার উপরে অভিসম্পাত প্রদান করতে থাকবে। (ইবনে মাযাহ্)

৪৪. তোমাদের পূর্বে বহু জাতি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, তারা ওজন করে নেয়ার সময় বেশি নিত, দেয়ার সময় কম দিত। সুতরাং তোমরা এরূপ কর না। (তিরমিযী)

৪৫. যে কেউ কর্জদারের নিকট হতে কর্জ আদায়ের সময় তাকে অবকাশ দিবে অথবা মাফ করে দিবে আল্লাহ্ তাকে কিয়ামতের ভয়াবহতা হতে বাঁচিয়ে রাখবেন।

৪৬. উত্তম ঐ ব্যক্তি যে কর্জদারের নিকট হতে কর্জ আদায়ের সময় উত্তম ব্যবহারের দ্বারা আদায় করে । (মিশকাত)

৪৭. যে কর্জ করার সময় তা আদায়ের আশা রাখে আল্লাহ্ তার কর্জ আদায় করিয়ে দেন। (বুখারী)

৪৮. আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে বান্দার সকল গুনাহ্ মাফ করে দিবেন, কিন্তু শির্ক এবং ঋণের গুনাহ্ মাফ করবেন না। (মুসলিম)

৪৯. যে মেয়েলোক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করল, রমযান মাসে রোযা রাখল, বেপর্দা চলাফেরা হতে বেঁচে থাকল, স্বামীর হুকুম মেনে চলল, তার ইচ্ছানুযায়ী বেহেশতের আট দরজার যে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে।

৫০. চারটা জিনিস এমন আছে তা যার জন্য মিলে গেল দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কল্যাণ তার জন্য মিলে গেল। (১) কৃতজ্ঞ হৃদয়, (২) ধার্মিক স্ত্রী, (৩) আল্লাহ্র যিকিরকারী জবান, (৪) বিপদাপদে কষ্ট সহ্যকারী শরীর। (মিশকাত)।

www.nagorikpathagar.org

গ্রন্থপঞ্জি

মিশকাত শরীফ—ইমাম মহিউস সুন্নাহ আবূ মুহাম্মদ হুসাইন ইবনে মাসউদ (র)
মিশকাত মাসাবিহ —শায়েখ ওয়ালিউদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ
উর্দু সি'রাতে মোস্তফা (সা)—অনুবাদ ঃ হযরত মওলানা আবদুল হক জালালাবাদী
মোস্তফা চরিত—মওলানা মুহাম্মদ আকরম খাঁ
আমিরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা)—সাদেক শিবলী জামান
আহকামে হজ্জ—মওলানা আবদুল আজিজ
নারীর মর্যাদায় ইসলাম—খান মুহাম্মদ মোসলেহ উদ্দীন
শবে মি'রাজের তাৎপর্য—খোন্দকার আবুল খয়ের

ইফাবা—৯৬-৯৭—প্র/৬০৪৩(উ)—৩২৫০

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ